মানবেন্দ্র

ডাঃ বঙ্কিম চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

অভিনব সংস্করণ

জন্মাষ্টমী—১৩৪১

করুণাময়ী পাব্লিশিং হাউস
১৫এফ্ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

দুই টাকা

Published by—Purna Chandra Chaudhuri
15F Durga Ch. Mitter Street
CALCUTTA

মা!

'চরণ-আশীষ' শিরে করিয়া ধারণ
রচিয়াছি গ্রন্থখানি জননি আমার;
উৎসর্গ ভক্তিভরে শ্রীচরণে তব
গ্রহণ কর গো মাতঃ 'ভক্তি-উপহার'।

স্নেহের
বঙ্কিম

Printed by—G. B. DE
THE ORIENTAL PRINTING WORKS
18, Brindabun Bysack Street
CALCUTTA

উপহার

....

....

....

....

....

বাঙ্গলা সাহিত্য ও জাতীয়তার একনিষ্ঠ সেবক,

সাহিত্যাচার্য্য, ভারতবর্ষ-সম্পাদক

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়

বলেন :—

"আপনার **'মানবেন্দ্র'** উপন্যাসখানি আগাগোড়া প'ড়ে দেখ্‌লাম। আপনার ভাষা অতি সুন্দর, বেশ ঝরঝরে, কোন অযথা আড়ম্বর নেই, বর্ণনা-কৌশলও ভাল। * * * যা হ'য়ে থাকে, তাই আপনি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।"

স্বাঃ শ্রীজলধর সেন

(১)

একমাস ধরিয়া মাঠ হইতে খড় আনিয়া যে বাঁশের ছোট ঘরখানি করিয়াছিলাম আগামী কাল পৌষ-সংক্রান্তির দিনে তাহা পোড়াইয়া স্নানের পর শীত নিবারণ করিবার কথা। শীতের রাত্রি সন্ধ্যার পর হইতেই নীরব স্তব্ধতা লইয়া পল্লীগ্রামখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে ফেলুদার বাড়ী হইতে তাহাকে ডাকিয়া সমস্ত রাত্রি আমাদের ঘরখানি পাহারা দিবার জন্য লইয়া আসিলাম। হয়তো শূন্যঘর পাইলে ওপাড়ার ছেলেগুলি আসিয়া আমাদের ঘরের সমস্ত খড় চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, অধিকন্তু ঘরখানিতে আগুন জ্বালাইয়া আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিয়া দিবে। এই জন্যই আমাদের বিরুদ্ধদলের হাত হইতে খড়ের গাদা রক্ষা করিবার জন্য উপরে একটা চাটাই পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। ফেলুদা আমার পাশেই বসিলেন, আমি তামাক সাজিয়া টিকে ধরাইবার জন্য লণ্ঠনটার চিমনি তুলিবার চেষ্টা করিলাম। ফেলুদা কহিলেন, দাঁড়া মনু, তামাক সেজে ফেলেছিস ?

হাঁ, এই যে, টিকেটা ধরিয়ে দাও, বলিয়া আমি কলিকাটা ফেলুদার হাতে তুলিয়া দিলাম। ফেলুদা ইহা হাতে লইয়া উপুড় করিয়া সমস্ত তামাক চাটাইয়ের উপরে ঢালিয়া কহিলেন, আজ এ তামাক নয়, একটা মন্ত্রপূতঃ তামাক এনেছি এই যে, বলিয়া

তিনি ঐ মন্ত্রপূতঃ তামাক কলিকাতে সাজিয়া টিকেটা ধরাইয়া দিলেন।

আমি কৌতূহলীভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মন্ত্রপড়া তামাক খেলে কি হয় ফেলুদা! ফেলুদা আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগেই প্রজ্জ্বলিত কলিকাতে এমন জোরেজোরে কয়েক টান মারিল, যে ক্ষুদ্র কলিকার উপরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষু বুঁজিয়া সটান বসিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে ফেলুদা কুণ্ডলীকৃত ধুম ফুৎকারে বাহির করিয়া কহিল, জানিস মনু, আমাদের সাধনার পক্ষে এই তামাকটা খুব উপকারী। সহজেই মন একাগ্র হয়, সকল কথা বিস্মৃত হয়ে এমন একটা নিষ্কাম অবস্থা পাওয়া যায় যখন এই মায়াময় সংসারের পরপারে যে শান্তিময় ধাম আছে যোগশাস্ত্রে বলে, সেই লোকে আমরা বিচরণ করতে পারি।

ফেলুদা কথাটা শেষ করিয়া কলিকাটি ন্যাকড়াসমেত আমার হাতের দিকে বাড়াইয়া কহিল, জানিস মনু, মহাদেবের তিন চোখ আছে। এই তামাক খেলে তাঁর তৃতীয় চোখ খুলে যায়, তখন তিনি এই চরাচর বিশ্বভূমণ্ডলে বায়ুভরে বিচরণ করেন আর সমস্তই দেখতে পান, আমাদেরও তেমনি তিনটে করে চোখ আছে।

আমি কলিকাটি হাতে লইয়া কহিলাম, এ তামাকের গন্ধ এত কড়া কেন ফেলুদা?

আরে আহাম্মুক, কড়া না হ'লে আমাদের যে চোখটা দেখতে পাইনা ওটা খুলবে কেন? তুই দেখনা টান মেরে,—প্রথম একটু আস্তে তারপর বড় একটা দিলেই ব্যস্ তোরও ঐ কপালে যে চোখটা চামড়ার তলে চাপা আছে তার পাতা খুলে যাবে!

তা'হলে আমি বোধ হয় লোকের মনের সব কথা জানতে পারব? বলিয়া আমি একটা টান দিয়াই মুখখানা বিকৃত করিয়া কলিকাটা ফেলুদার দিকে দিয়া কহিলাম, ইস্ যে গন্ধ! রাম রাম!

ফেলুদা তাড়াতাড়ি কলিকাটা হাতে লইয়া কপালে ছোঁয়াইয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়াই পুনরায় কয়েকটা টান দিয়া ঘন ঘন ধুম ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেবতার প্রসাদ তুই অশ্রদ্ধা করলি, তোর কিছু হবে না।"

আর কিছু হোক আর না হোক আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ক্রমাগত একটী বৎসর ফেলুদার সঙ্গে জপতপ আসন প্রাণায়াম করিয়া সিদ্ধির প্রায় আর দেরী নাই, হয়তো আর মাস কয়েকের মধ্যেই এই ইহলোকে বাস করিয়াই নির্লিপ্ত-ভাবে বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভের সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইবে, ফেলুদাও আজ দুইমাস যাবৎ আমার সাধনার সাফল্য সম্ভাবনার আভাস দিতেছে; এমতাবস্থায় সামান্য একটা প্রক্রিয়ার জন্য আমার সমস্ত সাধনা নিষ্ফল হইয়া যাইবে ভাবিয়া আমার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। আমার আত্মাভিমান যেন বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। আমি একটানে ফেলুদার হাত হইতে কলিকাটা লইয়া গোটাকয়েক লম্বা টান দিয়া কলিকাটা ফিরাইবার পূর্ব্বেই স্খলিতভাবে হাত হইতে পড়িয়া গেল। ফেলুদা একটা ধমক দিয়া কহিল, মন স্থির করে ধ্যান কর, বীরাসনে বসে নয়, পদ্মাসন করে। এই যাঃ ফেলে দিলি, যাক্‌গে আর দরকার নাই।

ফেলুদা চুপ করিবার পূর্ব্বেই আমার মাথাটা যেন একটা হাওয়োহাইয়ের মত আকাশে উঠিয়া চড়কের ন্যায় বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল, ধীরে ধীরে আমার চক্ষু নীমিলিত হইয়া আসিল। আমি বুঝিলাম আমার বুকের সমস্ত রক্ত শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মনে হইল, শরীরটা এত হালকা হইয়া গেল, যে একটা পাতলা বাতাসে ভাসিয়া বুঝি আমি বৈকুণ্ঠের পথে যাত্রা করিলাম। ফেলুদা নিঃশব্দে বসিয়া কি করিতেছে তাহা দেখিবার অবসর হইল না। অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই যেন করিতে পারিলাম না। অবশেষে চীৎকার করিয়া ফেলুদাকে ডাকিয়া দেখিলাম সেও নীরব। আরও জোরে গলার স্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া ডাকিলাম, ফেলুদা!

ফেলুদা বোধ হয় এই ডাকটা শুনিল। সে বলিল, চুপ চুপ, ধ্যান ভাঙাসনি, আর দেরী নেই।

দ্বিতীয় কথা আর মুখ দিয়া বাহির হইল না, আমিও আর পুনঃ-প্রশ্ন করিলাম না। এমনিভাবে মনের মধ্যে সহস্র ওলটপালট অনুভব করিয়া তৃষ্ণার্ত্তকণ্ঠে আমি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, ওঃ, বড় তেষ্টা পেয়েছে, ফেলুদা, একটু জল।

ফেলুদা যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে কথা কহিতেছে, তোর বড় তেষ্টা পেয়েছে মনু, এখনও দেহশুদ্ধির আরও ঢের বাকি আছে, সাধনা কি এতই সহজ রে! আমাদের মুনিঋষিরা হাজার হাজার বচ্ছর রোদে জলে থেকে, খালি গায়ে মাঘ মাসের শীতে উপর দিকে হাত তুলে, অনাহারে অনিদ্রায় মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছেন, শরীরের দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেন নাই, এই জন্যেই তাঁরা সিদ্ধিলাভও

করেছেন। আমাদেরও এমনি ধৈর্য্য, এমনি সহিষ্ণুতা, এমনি কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতে হবে, নইলে সিদ্ধি কি ছেলের হাতের মোয়া!

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা বাহিরের শান্ত প্রকৃতির মত আমাদের উভয়ের মাঝখানে প্রাচীর তুলিয়া গেল। আমি ফেলুদাকে দেখি না, সে আমাকে দেখে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে উচ্চৈস্বরে কহিল, দেখ্ছিস মনু, আমার দুই চোখের মাঝখানে ঠিক নাকের গোড়া থেকে কেমন একটা জ্যোতির্ম্ময় আলো বেরিয়ে গেল, ইস্ কি তেজ, ঐ দেখ যেখানে আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল বসে আছেন সেখান দিয়ে আমাকে যেন এক নূতন আনন্দময় ধামে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে। কি সুন্দর, কি মনোরম। চারিদিকে অপ্সরাদের নৃত্য-গীত, হাস্য-উল্লাস, বাগানে বাগানে ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা, ওই কি নন্দনকানন না? এই যে পারিজাত, তাহাতে মধুকর উড়ে বেড়াচ্ছে; মলয় এসে তার সৌরভরাশি রাজসভায় বিতরণ করে যাচ্ছে? চারিদিকে মণিমাণিক্য হীরা জহরতের ছড়াছড়ি, কেবল আনন্দ, আনন্দ, যেন ব্রহ্মলোকে এসেছি। মনু, তুই বাড়ী যা, তোর এখনও দেরী আছে, আমি আর ফিরবো না, আবার আসছিস? পারবিনে বলছি, তবুও তোর ঐ অশুচি দেহ নিয়ে আমায় ছুঁয়ে দিলি? তবে রে দাঁড়া, বলিতে বলিতে অন্ধকারে এমন জোরে এক চড় বসাইল, যে আমার কাণে তালা লাগিবার মত মনে হইল। আমি ধড়াস করিয়া খড়ের গাদা হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

পর দিবস যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে।

আমি চোখ মেলিয়াই আমার পার্শ্বোপবিষ্টা মাকে দেখিয়া বলিলাম, মা, আমাদের খড়ের ঘর যে পোড়াতে হবে, আমায় কেন এত বেলা পর্য্যন্ত জাগিয়ে দিলে না! বলিয়াই এক লাফে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বোঁ দৌড়ে ফেলুদার বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া মেজদা একটা নিসুন্দি গাছের ডাল হইতে পাতা ফেলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আমার ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘাকতক বসাইয়া ডালটা ভাঙ্গিয়া কহিলেন, পাজি শূয়ার, আর গাঁজা খাবি কি বল?

এই আকস্মিক প্রহারের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। উপরন্তু গাঁজা খাওয়ার অভিযোগ শুনিয়া আমার গত রজনীর সমস্ত কথা এক নিমেষে চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ফেলুদা যে গাঁজা খাইয়াই মন্ত্রপড়া তামাকের গুণ বর্ণনা করিয়াছিল ইহা আমার শরীরের সদ্য প্রহারের ফুলা ফুলা দাগে সহজেই ধরা পড়িয়া গেল। ভয়ে আমার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, আমি উত্তর দিবার জন্য চোখ খুলিতেছি এমন সময় মেজদা আর একটা চড় মারিয়া তাহার কথার পুনরুক্তি করিলেন। আমি "মাগো বাবাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম, আর খাব না মেজদা, আপনার পায়ে পড়ি এবারটা ছেড়ে দেন, আমি আর খাব না!

আরও গোটাকয়েক কঠিন হস্তস্পর্শ দিয়া মেজদা আমায় ছাড়িয়া দিলেন। চীৎকার শুনিয়া মা বাহিরবাটীতে আসিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, মাগো, ছেলেমানুষ না হয় একটা দোষ করেছে যোগীন, তা বলে কি এমনভাবে মারে, দেখ দিকি কেমন মারের দাগ লাল হয়ে উঠেছে। আমি মায়ের বুকে থাকিয়া

ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা আমাকে টানিয়া ঘরে নিয়া আদর করিয়া দুধের সর খাইতে দিলেন। আমি সমস্ত রাত্রি শরীরের বেদনায় অস্থির হইয়া মনে মনে আমার মাথার চুলগুলির উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া এগুলি কাটিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়া ঘুমাইলাম।

পর দিবস সকালে উঠিয়াই ফেলুদার নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া মেজদাকে গালি দিয়া কহিলাম, আমার চুলগুলো ফেলে দাও, ফেলুদা!

চুল কাটিবার যৌক্তিকতা ফেলুদা সহজেই স্বীকার করিয়া একটা ভোঁতা ধানকাটা কাস্তে দিয়া সমস্ত চুল কাটিয়া দিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, কে এমন করলে রে মনু, এই চুল যে মহাদেবের কাছে মানত ছিল—আগামী শিবরাত্রির দিনে বাবার চরণে দেবার কথা!

বলিয়াই তিনি আমার অমঙ্গল-আশঙ্কায়, যে আমার চুল কাটিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ফেলুদার উপর যেন এই অভিশাপগুলি না লাগিয়া পিছলাইয়া যায়, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতে করিতে আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

২

কয়েকদিন পরে সমস্ত সকাল বেলাটা ঘন কুয়াসায় আবৃত হইয়া কন্‌কনে শীতের খোঁচা সূচের মত বিঁধিতেছে। আমি ভোর বেলায় উঠিয়া নন্দীদের বাড়ী হইতে ফুল তুলিয়া ঘরে আসিয়া বই লইয়া বসিয়া গেলাম। মেজদা তখনও লেপ চাপা দিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি প্রত্যহ একটু বেলাতে শয্যাত্যাগ করেন তদুপরি কুয়াসার ভয়ে আজ যেন আর তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিতে চাহে না। আমি চীৎকার করিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছি এমন সময় বড় বৌদি আসিয়া কহিলেন, মনু তোমাকে একটীবার বাজার যেতে হবে।

আমি প্রত্যহই বাজার যাই। কিন্তু মেজদা যেদিন আমাকে অন্যায় অসঙ্গতভাবে ডালপেটা করিয়াছিলেন সেদিন হইতে তাঁহাকে জব্দ করিবার পথ খুঁজিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম, মেজদা আপনাকে বড় বৌদি ডাকছেন। মেজদা ঠেলা খাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়াই চক্ষু বুঁজিয়া ফেলিলেন। বড় বৌদি কহিলেন, হাঁ উনি যাবেঁন বাজারে, এক ঘটী জল গড়িয়ে খেতে গায়ে জ্বর আসে,— কুঁড়ের সর্দ্দার।

আমি অভিমানভরে মুখ ফুলাইয়া কহিলাম, কেন আমি রোজ রোজ বাজার যাব, আর তিনি ঘুমোবেন, না আজ আমি কিছুতেই যাব না, যাব না, ও মেজদা!

আমার ডাকে মেজদা পুনরায় চক্ষু মেলিতেই বড় বৌদি বলিলেন, মেজঠাকুরপো, একদিন না হয় তুমিই যাও না, ও তো রোজই বাজার যায়।

মেজদা দুর্গা দুর্গা জপিয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ মুখ ভারী করিয়া মেঝের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, মনু যাবে না?

না, আমি আজ পারব না, আমার পড়া নষ্ট হয়। রোজই বাজারে গেলে আমার পড়া শিখি কখন বলুন ত? বলিয়াই আমি ঝুঁকিয়া বইয়ের দিকে দৃষ্টি নত করিলাম।

মেজদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, আমি অভিমান করিয়াছি। তিনি অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, যাও আজকের দিনটে লক্ষিটি, কাল থেকে আমি যাব বলছি।

বড় বৌদি কহিলেন, বাপরে, বিছানা ছাড়তে হলেই প্রাণ বেরিয়ে যায়! বৌ এলে আর এই কুঁড়েমি থাকবে না বলে দিচ্ছি!

মেজদার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এবার অকাল, তাই আগামী বৎসরের মধ্যেই হইবে বলিয়া সকলেরই ধারণা। তাই তিনি একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, তখন আরও ভাল হবে। একদম বিছানা ছাড়তেই হবে না!

বড় বৌদি হাসিয়া বলিলেন, তখন এ সব জারিজুরি ভেঙ্গে যাবে। একটু কি দয়া মায়াও নেই? ছোট ভাই রোজ বাজারে যাবে, মাগো কি পাষাণ! চল মনু, পয়সা নিয়ে যাও!

বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইলেন, আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া পয়সা লইয়া বাজারে চলিয়া গেলাম। পথে যাইতে যাইতে মেজদার

বিনয়-কোমল মুখখানি ক্ষণিকের জন্য আমার অন্তরের গোপন প্রদেশে আনন্দের ফল্গুধারা বহাইয়া দিল। মেজদা যদিচ আমাকে সেদিন গাঁজা খাওয়ার অভিযোগে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিয়াছিলেন কিন্তু এই কারণটার উপরেও আর একটা ক্রুদ্ধ কারণ যে ছিল না তাহা নহে। ফেলুদা তাঁহার সতীর্থ ছিল। কিন্তু ফেলুদা থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াই সরস্বতীর মন্দিরে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। মেজদা তখনও বি-এ, এম্-এ, পাস দিবার স্বপ্নে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, অবশ্য তাঁহার আলস্য বাঁচাইয়া, লেখা পড়ায় অভিনিবেশ-সহকারে যেন জিদ করিয়া কামড় খাইয়া রহিলেন। উপরন্তু তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে গোময়ের কিম্বদন্তী তাঁহাকে এক চুলও বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এবং ফেলুদাই স্কুলের সকল প্রকার আধ্যাত্মিক, নৈতিক চরিত্র বিকাশের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহাদের বিদ্যাস্থলে রাহু প্রবেশ করাতে মিলনপথ বন্ধ হইয়া গেল তখন তাঁহারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ফেলুদা সংসারে ঈশ্বরলাভ করিয়া পারলৌকিক মুক্তিটাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। আর মেজদা দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র মুক্তি বলিয়া তদোপযোগী কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে তুমুল তর্ক হয় তাহাতে গায়ের জোর আর কণ্ঠস্বরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ অনেক সময় প্রবল হইয়া দেখা দেয়। মেজদা বলেন, আমার দেশবাসী অনাহারে, লাঞ্ছনায় দিন দিন লোপ পেতে বসেছে, আর আমি নাক টিপে নিজের মুক্তির উপায় করব? আত্মমুক্তির চেয়ে দেশের মুক্তিই প্রধান।

ফেলুদা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে, আমাদের আত্মাকে

জানতে পারলে অন্য সব মুক্তি আপনা আপনিই এসে যাবে—যেমন কাণ টানলেই মাথা আসে।

মেজদা বলেন, এমন লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী আত্মমুক্তির জন্য বনে পর্ব্বতে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে আছেন কিন্তু যদি তাঁহারা মুক্তিই পান তবে গেরস্থের ঘরে ভিক্ষে করতে আসবেন কেন ?

জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ভিক্ষার ছল করে আসেন, এতে সাধারণ গৃহস্থেরই উপকার হয়। না হলে তাঁদের উদরের চিন্তাটাই সব নয়। তাঁরা ইচ্ছা করলে মন্ত্রবলে সব আহার্য্য উপস্থিত করতে পারেন। বলিয়া ফেলুদা কোথায় এক সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে ধূলাগুলিকে সদ্য সদ্য রসগোল্লা পানতুয়ায় পরিণত করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিয়া কহিল, তোমরা এ সব বিশ্বাস কর না বলেই দেশের মুক্তি আনতে পার না।

মেজদা উচ্চৈস্বরে এমন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিলেন যে ফেলুদার কাণ লাল হইয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, এই জন্যেই আমাদের দেশের লোকের কিছুই হবে না। তোমরা দু পাতা ইংরাজী পড়ে আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঙ্গ করতে শিখেছ। আমাদের বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ যদি আজকাল বেঁচে থাকতেন,—

অবশিষ্টটুক বলিবার পূর্ব্বেই মেজদা বলিলেন, যখন নেই আর হবে বলেও আশা নাই তখন এ সমস্ত গাঁজাখুরী কথায় না থাকাই ভাল। তার চেয়ে এ সমস্ত ছেড়ে দিয়ে কোথায় তোমার দেশবাসী অন্নাভাবে মরে যাচ্ছে তার পেটে দু'মুঠো দেবার পথ খুঁজে বার কর !

ফেলুদা বুঝিল, যে মেজদা তাঁহাকে শিষ্যের মত আদেশ প্রদান করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা

যাও, তোমার আর পরামর্শ দেবার দরকার হবে না। সময়ে সব দেখতে পাবে। এমনিভাবেই তাঁহাদের তর্কের প্রায়ই নিষ্পত্তি হইত। কিন্তু তাঁহাদের শ্রোতা থাকিয়া বিচার করিতে না পারিলেও ফেলুদার বলিষ্ঠ লোহার মত কুস্তিমাজা দেহ ও অটল মনের জোর দেখিয়া তাহার দিকে যত আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম, মেজদার সকল বক্তৃতা তাঁহার আলস্যদোষের দুয়ারে আসিয়া ঝিমাইয়া যায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ন্যূনতা সর্ব্বভাবেই অনুভব করিতে লাগিলাম। মেজদা দেশের দুঃখে বিগলিত অশ্রু লইয়া যতই বক্তৃতা করুন, গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের সেবা করিতে, রোগীর শিয়রে সমস্ত রাত্রি নিরলসভাবে পাহারা দিতে, থিয়েটার করিবার সময় ষ্টেজ বাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজার পার্ট নিতে এমন কি ঘুটঘুটে অমাবস্যার অন্ধকারে বংশদণ্ড হাতে নির্ভীকভাবে চলাফেরা করিতে ফেলুদার জোড়া নাই; আর তাহার সহিত তুলনায় মেজদার বক্তৃতা ও কার্য্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যবধান দেখিয়া আমি ফেলুদার দিকেই অধিক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। আমার ন্যায় শিষ্যকে আয়ত্বমুক্ত দেখিয়া মেজদা মনে মনে ঈর্ষার আগুণে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহারই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের ফলে সেদিন তিনি আমার উপর তাঁহার সমস্ত ক্রোধ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মেজদার যতই রোষ-কবলে পতিত হই, বাজার যাওয়ার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র সহায়, রাত্রে তিনি প্রত্যহই বাগানের মধ্যে শৌচক্রিয়ার জন্য যাইতেন তখন আমিই তাঁহার সঙ্গে লণ্ঠন লইয়া গিয়া বসিয়া বসিয়া মশার কামড় খাইয়া তাঁহার সাহসরূপে হাজির থাকিতাম। রাত্রে খাওয়ার পর আর তিনি এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিতে পারিতেন না; দুই চক্ষু

আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া যাইত। আমি প্রত্যহ বাতি নিবাইয়া ঘুমাইতাম এমনি আরও ছোট খাট কতকগুলি কারণে তিনি যেমন আমাকে বাদ দিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিতেন না, আবার ফেলুদার জন্য আমাকে একান্ত নিবিষ্টভাবে গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করিয়া সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা লইয়া তিনি, যে একটু বেশ ভাল-ভাবেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন একথা আমি সহজেই বুঝিয়াছিলাম; এবং আমিও এই বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ-জ্ঞানের সুযোগে মেজদার হাতের লেখা মাসিক পত্র "নবযুগে" লিখিবার অধিকার কুড়াইয়া লইতে এমন কি ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া তাহা সংশোধন করাইতে নিঃসঙ্কোচে আব্দার করিয়া ফেলিতাম। মেজদা কবিতা এবং ছোট গল্পের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া ছাত্র মহলে বেশ খ্যাতি-বহাল ছিল এবং আমিও যে, কালে একজন কালিদাস কি সেক্‌স্‌পীয়ার হইব এ কথাটাও "নবযুগে" আমার "ব্রহ্মচর্য্য" কবিতাটী পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ খুব একচোট জটলা পাকাইয়া তুলিয়াছিল। আমি এইসমস্ত কারণে মেজদার সকলপ্রকার কুঁড়েমির মধ্যেও তাঁহাকে ভালবাসিতাম এবং তাঁহার বিপদ নিবারণের জন্য শারীরিক মানসিক পরিশ্রম দিতে কোনকালেই কুণ্ঠিত হই নাই।

বাজারটা রান্নাঘরে ফেলিয়াই শুনিলাম, ফেলুদা আসিয়া খুঁজিয়া গিয়াছে। আমি ছুটিয়া ফেলুদার বাড়ী গিয়া শুনিলাম, সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, দিনের মধ্যে আর ফিরিবে না। আমার মনটা দমিয়া গেল। ফেলুদা আমাকে না লইয়া কোথাও যায় না, আজ কেন এরূপ করিল, বোধ হয় মেজদা তাহাকে কোন প্রকার তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়াছেন। মনেমনে মেজদার উপর রাগ হইতে লাগিল।

কিন্তু ইস্কুলের বেলা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া পুকুরের দিকে ছুটিলাম। মা পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন, ওরে মাথায় তেল দিয়ে যা, নইলে মাথা গরম হয়ে উঠবে। দিন-রাত্তির যেন কত কাজ, তেল দিয়ে নাইবার-খাবার সময় হয়ে উঠে না! সব সময় এত কি কাজ? বলিতে বলিতে তিনি একবাটি তেল হাতে লইয়া পুকুর-পাড়-পর্য্যন্ত ধাওয়া করিলেন। আমি ততক্ষণে ঝপাস্ করিয়া জলে ডুব দিয়াছিলাম। পুনরায় উঠিয়া আসিতেই মা আমার মাথায়-গায়ে তেল মাখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি স্নানান্তে আহার শেষ করিয়া কেবল ফেলুদার কথা ভাবিতে ভাবিতে হর্ষে, দুঃখে আপ্লুতমনে ইস্কুলে চলিয়া গেলাম।

———

৩

সমস্ত দিন এবং সন্ধ্যার পরও ফেলুদার দেখা না পাইয়া আমার কেবলি মেজদার উপর রাগ বাড়িয়া গেল। ভাবিলাম, মানুষ এত হিংসুটে কেন? আমি যাহাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য অপরের এত মাথা-ব্যথা না হইলে কি সংসারের সকল গতি স্তব্ধ হইয়া যায়? এই অধিকার-বিচ্যুতির দ্বন্দ বহন করিয়া মানুষ কোনখানে আপনাকে সমৃদ্ধ করে তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া এক পক্ষে মানুষের প্রতি আমার যেমন অশ্রদ্ধা বাড়িতেছিল, অপর পক্ষে ফেলুদার এই নির্ম্মম ব্যবহারের জন্য অভিমানের বাষ্পে চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় খাল পারের যে অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় বসিয়া আমরা দুইজনে ধ্যান করিতাম সেখানে একাকী বসিয়া ধ্যানের পরিবর্ত্তে এই একান্ত একাকীত্ব আমাকে চাপিয়া ধরিল। কোনও প্রকারে মনের কল্পনাস্রোত রুদ্ধ করিতে না পারিয়া খালের জলে হাত পা ধুইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। জলের শীতল বায়ু আমার সমস্ত দেহ বরফের ন্যায় জমাইয়া ফেলিতেছিল, বাড়ী আসিয়া খাওয়ার অনিচ্ছা জানাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। মেজদা তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত "নবযুগ" খানা পড়িয়া শোনাইয়া আমার প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার এই নিস্তব্ধতা যে কি প্রকার মনস্তাপে তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল

তাহা আমি বুঝিয়াও আমার বিতৃষ্ণ মনকে নবযুগের কথাগুলিতে বসাইতে পারিলাম না। মেজদা যখনই নূতন কিছু লিখিতেন, প্রথমেই আমাকে শোনাইতেন, আমি শুনিতে অনিচ্ছুক জানিয়াও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া আমার নিকট হইতে তারিফ লইবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। আমিও যখনতখন একটা ইচ্ছামত মত জানাইয়া তাহার প্রবুদ্ধ মনকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতাম। কিন্তু অন্যকার নিরুৎসাহে যে তাহার অশ্বস্তি কতদূর দুঃখের কারণ হইল বুঝিয়াও কোন প্রতিকারের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য হইল না। মেজদা ঘুমাইবামাত্র নাক ডাকিতে লাগিল। আমার ক্লান্ত দেহে ঘুমের আবেশ দাগ বসাইতে পারিল না, চিৎ হইয়া চালের খাপে টিকটিকির আরশুলা-ভক্ষণ দেখিতে লাগিলাম। বাহিরের শীতার্ত্ত প্রকৃতির বুক চিরিয়া কয়েকটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া এই নিস্তব্ধতার কোলে প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। পার্শ্বের জানালাটা দিয়া কুয়াসা প্রবেশ করিতেছিল, উঠিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। এমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়া একটু তন্দ্রার ঘোর আসিতেই পায়ের উপর একটা খোঁচা খাইয়া সচকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্ধকারের মধ্যে চক্ষু চালাইবার চেষ্টা করিলাম। বাহির হইতে ডাক আসিল—"মনু, ও মনু, মানবেন্দ্র;" আমি বিছানার উপর বসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া কহিলাম, কে ফেলুদা? "হাঁ আমি। আলো জ্বালাসনি, যেমন আছিস অমনি বেরিয়ে আয় খুব আস্তে।" বলিয়া ফেলুদা আমার ঘরের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি উঠিয়া দরোজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই কহিল, আয় আমার সঙ্গে।

একবার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু ফেলুদা ততক্ষণে বারাণ্ডা ছাড়িয়া পুকুরের দিকে চলিয়াছে, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার অনুগমন করিলাম। একেত সমস্ত দিন দেখা পাই নাই তদুপরি যখন সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে তখন আর বিরক্ত করিবার মত মনের বল সহসা খুঁজিয়া পাইলাম না; কিন্তু তাহার সঙ্গে চলিতে চলিতে যখন আসিয়া গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে পড়িলাম, আমার মনে কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। জমাট অন্ধকার গাছপালার ছায়ায় আরও বিকট হইয়া উঠিয়াছিল। কতবার হোঁচট্ খাইয়াছি, কতবার কানের কাছে দীর্ঘশ্বাসের মত অনুভব করিয়া শরীরে কাঁটা দিয়াছে, মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু নালার পাশ দিয়া চলিবার সময় ভয় হইল আমি বুঝি স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া যাত্রা করিয়াছি। এই দ্বিধা নিরাকরণের উদ্দেশ্যে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফেলুদা, কোথায় যাবে?"

ফেলুদা এতক্ষণ তাহার বড় বড় পা ফেলিয়া থপ্ থপ্ শব্দ করিয়া চলিয়াছিল। আমার ডাকে গতিরোধ না করিয়া তেমনি ভাবে হাতে তালি দিয়া কহিল, "দুর্গাপুর যাব, দেরী করিস্ না, আজ সমস্ত দিন আমি সেইখানেই ছিলাম। একটী আচার্য্যের বাড়ীতে একজন বিধবা বৌয়ের কলেরা, আজ সেখানে থাক্‌তে হবে। আর দেখিস্, পাশের ধানক্ষেতের দিকে লক্ষ্য রাখিস্, এগুলোতে সাপ ব্যাঙ কত কি আছে, হাতে তালি দিয়ে চল্‌না, দেখ্‌বি সব ছুটে পালাবে।"

আমার পা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। প্রথমতঃ কলেরা রোগীর পার্শ্বে নিজেকে কল্পনা করিয়া গা'টা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল,

উপরন্তু পায়ের তলায় প্রতিক্ষণেই বিষধরের কুণ্ডলীকৃত ছায়া দেখিয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল এই সন্ত্রস্ততা বহন করিয়া একটা পত্রপল্লবহীন শুষ্ক কুলগাছের নীচে আসিয়াই ফেলুদা আমাকে বলিল "তোর পৈতেটা হাতে ধরে গায়ত্রী-জপ করে আয়—ভয় করিস না!"

আমার মনের মধ্যে যত না ভয় ছিল ফেলুদার ইঙ্গিত বাক্যে তাহা যেন মূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কুলগাছটার বিশীর্ণ শাখা, প্রশাখা বেড়িয়া বেতাল-পঞ্চবিংশতির ভূতের মত লাফালাফি জুড়িয়া দিল। হঠাৎ আমার গায়ের পাশ দিয়া একটা কিছু চলিয়া যাইবার মত বাতাস অনুভব করিয়া আমি ফেলুদার কোমর জড়াইয়া হৃদ্‌স্পন্দন শান্ত করিতে লাগিলাম। ফেলুদা চীৎকার করিয়া রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে কুলগাছের সীমানা পার হইয়া কহিল—"নে আর ভয় নাই, শুনেছিলাম এখানে নাকি কার ঘাড় মট্‌কে ফেলেছিল। ওকি তুই এখনও কাঁপছিস? ভয় কি? একটু থুতু নিয়ে গায়ে মেখে ফেল্, কোন ভূতের বাপের সাধ্য নাই তোকে স্পর্শ করে।"

আমি তাড়াতাড়ি খানিকটা থুতু সৰ্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া ফেলুদার পার্শ্বে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আবার ফেলুদার শক্ত পদতলের চট্‌চট্ আওয়াজ, আবার আমিও তাহার অনুকরণ করিলাম কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন আমাকে ঘিরিয়া উষ্ণ তাপ ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। তখনও আমি আস্তে আস্তে রামনাম আওড়াইয়া গায়ত্রী-মন্ত্র জপিয়া ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গায়ে মুখে থুতু মাখাইতে লাগিলাম। দিনের বেলা এই নির্জ্জন রাস্তা দিয়া

ধানক্ষেতের আলের উপরে পা চালাইয়াছি, কোনদিনই ঘনভাবে মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু আজ যেন উর্দ্ধে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষীণ তারকাদীপ্ত অস্পষ্ট আকাশের ব্যাপ্তি হইতে চতুর্দ্দিকের শিশিরসিক্ত মাঠের উপর যথাতথা অদ্ভুত অবয়বপূর্ণ মানুষের মূর্ত্তি আমার চক্ষুর দৃষ্টিকে উদ্দাম করিয়া তুলিল; গ্রামের নিকটবর্ত্তী ঝোপ্‌ঝাড়ের অবিচ্ছিন্ন একতা যেন একটা বিরাট শায়িত অশরীরি ছায়ার মত দুই পা মেলিয়া স্বর্গমর্ত্ত্যের পথ আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে। গ্রামের কাছে আসিয়া আমি পুনরায় একটা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষবিচ্যুত জলের স্পর্শ আমার কাঁধের উপর অনুভব করিয়া গলার স্বর পরিষ্কার করিয়া কহিলাম, "রাম রাম, ফেলুদা, ভূতে জল ফেলে দিয়েছে!"

আমার শরীরের আমূল শিহরণ ফেলুদাকে এক নিমিষের জন্য বিমূঢ় শঙ্কায় চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অল্পদূর চলিয়া গিয়া কহিল, "তুই এত ভীরু! আজকাল শীতকালের দিনে গাছ থেকে জল পড়ে তাও তুই জানিস না? আয়, ওই সাম্‌নেই বাড়ী দেখা যাচ্ছে। ধর, এই ওষুধটা চিবিয়ে ফেলে দে।"

হাত বাড়াইয়া ফেলুদার হাত হইতে একটা শিকড়ের মত ঔষধ লইয়া দাঁত দিয়া চিবাইয়া ফেলিয়া রোগিনীর বাড়ীতে উপনীত হইলাম।

ফেলুদা ঘরে ঢুকিয়াই তালপাখাখানি আমার হাতে দিয়া সঙ্গে আনীত ধৌত বস্ত্রদ্বারা রোগিনীর নোংড়া কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "মনু, তুই এখানে বোস্, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।"

ফেলুদা চলিয়া গেল। আমি এই বিসূচিকাজীর্ণ যুবতীর নিশ্চিতমৃত্যুর সম্মুখে বসিয়া তাহার দুই তীক্ষ্ণ ঘন চক্ষুর দিকে চাহিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিলাম। জল চাহিলে একটু জল দিয়া পুনরায় বাতাস করিতে লাগিলাম। বিছানার আসবাব্ বলিতে একটি শতছিন্ন মলিন কাঁথা আর শিয়রে একটা তেলচিটে বালিস, নীচে একটা চাটাই। এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে একটী যুবতী আর্ত্তনাদ করিয়া মৃত্যুর আগমন—সম্ভাবনা সূচিত করিতেছে কিন্তু কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন কেহই তাহার শুশ্রূষা করিতে আসে নাই ভাবিয়া আমার সমস্ত চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতে লাগিল। আমি এবং ফেলুদা যে এই হতভাগিনীর একমাত্র সহায় সম্বল হইবার সুযোগ পাইয়াছি এজন্য মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া সেবার গৌরবে আমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, তাহার আর কে আছে, একি শ্বশুর বাড়ী না বাপের বাড়ী, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন আর্ত্তনাদের মধ্যে এমন একটু ফাঁক ছিল না যখন আমি এই নিরাশ্রয়া মুমূর্ষুর কানের কাছে এই প্রশ্ন ধ্বনিত করিতে পারি। সম্মুখে একটী কেরোসিনের ডিবা তাহার অস্পষ্ট আলোকে বিছানায় শায়িত শুভ্র কঙ্কালের ছবিটী এমন ভীষণ ছায়া লইয়া আমার মনের মধ্যে দেখা দিল, যে আমার একাকী বসিয়া থাকিতে শরীর ছমছম্ করিতে লাগিল। কিন্তু ফেলুদা কোথায় গেল এতক্ষণ ধরিয়া আসে না কেন? উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া বাহিরের নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভয়েরই প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বাঁশের ঝাঁপ ফেলিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সংসারের মধ্যে আত্মীয়হীন

স্নেহকাঙ্গাল মায়ার ভিখারী যাহারা তাহাদের জন্য এইরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি কেন যে বিধাতা নির্দ্দেশ দিয়াছেন, মানুষের এই অসহায় অবস্থার জন্য শুধু অপরিচিত প্রাণীর সেবা-যত্ন যে, মরুভূমির মধ্যে একবিন্দু বারিপাতের ন্যায় কোথায় তলাইয়া যাইবে ;—তথাপি আপনার লোক একটীবার আসিয়া এই হতভাগিণীর হাতখানি তুলিয়া একটু সান্ত্বনার বাক্য দিয়া করুণামণ্ডিত হৃদয়ের মাধুর্য্য-বর্ষণে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছে—ইহা যে মনুষ্য-হৃদয়ের পক্ষে কত বড় নিষ্ঠুর পরিহাস তাহা ভাবিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে কালসর্পের কালকূট বিসর্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় ঝাঁপের উপর করস্পর্শ শুনিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। ফেলুদা কতকগুলি ভিজা কাপড় লইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "এই নোংড়া কাপড়গুলি তো বাড়ীর আর কেহ ছোঁবে না। কি নিষ্ঠুর পরিবার! শ্বাশুড়ী আছেন, ভাশুর, দেওর, ননদ, ভাজ কিছুরই অভাব নাই কিন্তু অদৃষ্টের চাপে আজ এই যুবতী বিধবা হয়েছে বলে সকলের কুটনজরে পড়ে একটুকু স্নেহের দাবী হতে বঞ্চিত, তার মৃত্যুর দ্বারাই তার এই বৈধব্যের অপরাধ স্বীকার করে নিতে হবে! মনু, এরা কি মানুষ?"

আমি এতক্ষণ এই বিষয়েই ভাবিতেছিলাম। ফেলুদার মুখ-নিঃসৃত বাক্যগুলিও আমার চিন্তার সমর্থন করায় এবং এই যুবতীর রক্তলেশহীন অস্থিচর্ম্মসার দেহের উপর দুটি স্পষ্ট চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার সকল অন্তঃকরণ হাহাকার করিয়া উঠিল।

যার স্বামী নাই, যাহার অদৃষ্ট বৈধব্যের বিড়ম্বনা ডাকিয়া আনিয়াছে তাহার কাছে পরিবারের লোক থাকিয়াও নাই।

তাহাদিগের ক্ষুদ্রতম স্নেহকার্য্যের অধিকার হইতে সে বহুদূরে চলিয়া গিয়া তাহাকে আপনার ভাগ্যের মুখোমুখী বসিয়া আজীবন অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে হইবে। আমি কহিলাম, "ফেলুদা, কেউ কি এ ঘরে আসে না ?"

"না, আমি অনেক বলেছি। সকলেই বলে, ছেলেপুলের ঘর কে যাবে বাছা। ওর তো সব ফুরিয়ে এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটীও যাবে, ও পোড়াকপালী বিয়ের বছরেই স্বামী হারিয়েছে, ওর পক্ষে বাঁচা না বাঁচা দুইই সমান।" আরও কত কি, যাক্‌গে, দাঁড়া আমি ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছি। বলিয়া ফেলুদা একটা তরল ঔষধ রোগিনীর মুখে ঢালিয়া ভিজা কাপড়গুলি বাঁশের বেড়ায় গুঁজিয়া দিল।

নিগূঢ় বেদনা ও স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার অন্তরে ঘৃণার তরঙ্গ ফেনাইয়া উঠিতেছিল তাহারই আবেগে হতবুদ্ধি দিশেহারা হইয়া আমি সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভোরবেলার দিকে বাড়ী ফিরিলাম। আমার অন্তরে-বাহিরে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল ফেলুদাকে তাহার আভাস দিবার মত প্রবৃত্তিও আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। মনের বেদনা মনের নিভৃত প্রদেশে চাপিয়া মুমূর্ষু সন্তানের সম্মুখোপস্থিতা মাতার ন্যায় অশ্রুজলে ইহাকে সিক্ত করিলাম আর প্রশ্ন করিলাম,—"এই স্বামীহারার বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি সংসারের সকল করুণা, মায়াদয়ার দুয়ার—চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় তবে, মানুষের মহত্তম হৃদয়ের মূল্য কি ? হৃদয়ের করুণামণ্ডিত মুখের স্নেহচ্ছবির সার্থকতা কোথায়, কেমন করিয়া মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে ?"

৪

পরদিনও নিশীথযাত্রা সম্পূর্ণ করিলাম। মাঠের মধ্যে মোল্লামৌলবীর "আল্লা আল্লা" চীৎকার আর তেমনভাবে শরীরের লোম খাড়া করিল না। কাল-পেচকের বিকট কণ্ঠস্বরও আর মনের চতুর্দ্দিকে বিভীষিকার সৃষ্টি করিল না, খালপারের শ্যাওড়া-গাছের ঘন ঝোপের মধ্যেও কোন মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না, এখন সমস্তই সহজ হইয়া আসিল, প্রাণের মধ্যে ত্যাগ ও সাহসের বিদ্যুৎ অসীম শক্তির সঞ্চার করিল। এইরূপে চারিদিন কাটিয়া যাওয়ার পর পঞ্চম দিনে রোগিনীর গৃহে ঢুকিবামাত্র রোগিনী অশ্রুমণ্ডিত মুখখানি বস্ত্রাঞ্চলে মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—"ফণীবাবু, আমাকে কেন বাঁচালেন, আপনারা এই শত্রুতা কেন ক'রতে গেলেন ?"

স্তম্ভিত-বিস্ময়ে ফেলুদা বিস্ফারিতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আমার এই কয়দিনের সঞ্চিত করুণার ধারা চক্ষুর মধ্যে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এত সেবা, এত যত্ন, সকল সম্পদ আহরণ করিয়াও অকৃতজ্ঞ বিধবার আমাদিগকে শত্রু আখ্যা দিতে কি জিহ্বা তৎক্ষণাৎ খসিয়া গেল না ? আমি খাড়া হইয়া উঠিয়া ফেলুদার হাত ধরিয়া কহিলাম, "চল, আর একমুহূর্ত্তও এখানে নয়, কি অন্যায় কাজ করেছি। কথায় বলে যেচে সাহায্য ক'রতে নাই, আপনিও দেখছি এ কথাটা প্রমাণ করে তবে ছাড়লেন ! যখন বিছানায় পড়ে কাৎড়াতেন তখন তো আপনার আত্মীয়-স্বজন

কেউ এসে একবিন্দু জল দিয়ে জিজ্ঞেস করে নাই, তবুও, তারা আপন আর আমরা হলাম শত্রু! ফেলুদা উঠে চল।"

যুবতী আমার হাতটী টানিয়া বসাইয়া কহিলেন, "চট্‌ছ মনু, ভাইটী আমার রাগ কোরো না। সত্যিই তারা যে আমার কত আপনার বলেই আমাকে স্বচ্ছন্দে মৃত্যুর কোলে ছেড়ে দিয়েছিল তা যদি শোন তবে আমার উপর রাগ থাক্‌বে না। আচ্ছা বল তো সকাল থেকে মুড়োখ্যাংড়ার সঙ্গে গালাগালি মাথায় করে যার দিন আরম্ভ হয় তার কি আর বাঁচবার সাধ থাকতে পারে! না হলে আমার সুদিন হলে তোমরা যে আমার কত আপনার তা কি অস্বীকার করতে পারতুম। আমি যে বিধবা, আমার এ সংসারে আপনার বল্‌তে যা কিছু ছিল তা স্বামীর সঙ্গে চিতায় দিয়ে এসেছি আমার কি বেঁচে থাকা উচিত, তুমিই বলতো লক্ষী ভাইটি!" বলিতে বলিতে তিনি আমার মাথায় এমন মধুর স্পর্শে অঙ্গুলি বুলাইতে লাগিলেন যে আমার সমস্ত দেহ তাহার ঐ কোমল নম্র বাণীর আধার দেহমূলে বারংবার লুটাইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিতে চাহিল। আমি স্তব্ধ নিশ্চলতা লইয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম। তিন জনেই নীরব প্রস্তরমূর্ত্তির মত অধোবদনে বিষণ্ণ-ভাবে বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আমার দিকে চাহিতেই দেখিলাম তাঁহার ঝাপসা চক্ষুর কোণে জলের ফোঁটা চক্ চক্ করিতেছে। আমি বুকের মধ্যে একটা হাতুড়ির ঘা অনুভব করিলাম। কত বড় দুঃখের আগ্নেয়গিরি তাঁহার অন্তরখানি দগ্ধ করিয়া দেহের সমস্ত সরসতা শুষিয়া ফেলিয়াছে তাহা কল্পনা করিতে পারিলাম না কিন্তু অনুভবের অব্যক্ত বেদনা

আমার চক্ষুদুটীকে ভারী করিয়া তুলিল। আমার এই অপরিজ্ঞাত দুঃখের আবেশ ফেলুদার দৃষ্টিতে কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা যাচাই করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিলাম কিন্তু সেও মাথা নত করিয়া কি ভাবিতেছিল তাই আমার দিকে চাহিয়া দেখিল না। ঘরখানিতে মিটিমিটি করিয়া যে আলোটা আমাদের নিঃসঙ্গতা দূর করিতেছিল তাহার ক্ষীণ শিখাটা যেন আমাদের এই অবসাদ দূর করিবার জন্য দপ্ দপ্ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যুবতী উঠিয়া বোতল হইতে কেরোসিন তেল ঢালিয়া কহিলেন, "আহা, এমনি করে সব মেয়াদ চুকিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় এবার সুস্থ হয়েছি। নাঃ আর কিছুতেই না। মরণের কাছে গিয়ে তার শান্তিময় স্পর্শের একটু আভাস যা এই কলেরার সময় পেয়েছি আমার ইহজীবনের স্থিতির চেয়ে তার স্পর্শ পরম শ্রেয়! ফণীবাবু, আপনি নীরব থাকলে চলবে কেন? আমার কর্ত্তব্য কি বলুন, আপনি আমার জীবনদাতা, আমার আত্মহত্যায় কারো মনে ক্ষোভ আসতে পারে কি?"

ফেলুদার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল এবং ইহার চঞ্চলতা ও শান্তি দুইই ম্লান আলোকের মধ্যেও এমন বিশেষভাবে আমার চোখে ধরা পড়িল, যে আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। নারীজাতির মোহিনীমূর্ত্তির প্রতি ফেলুদার কোন দুর্ব্বলতা কোন কালেই আমার চোখে পড়ে নাই এবং এই কারণেই বর্ত্তমানে ভাব-বিপর্য্যয়টা আমার কাছে এতদূর সত্য বলিয়া বোধ হইল যে আমিও মনের মধ্যে ইহার প্রতি শ্রদ্ধায় নিগূঢ় বিশ্বাস অনুভব করিতে লাগিলাম; অবশেষে নীরবতা

হইতে আমাদের মুক্তি দিয়া যুবতী কহিলেন, “আমার সব কথা না ব’ল্‌লে যে জগতের কাছে কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। আমার নাম করুণা। এগার বৎসর বয়সে হাতের নোয়া মাথায় সিঁদুর দিয়ে আর পাঁচজনেরই মত স্বামীর ঘর করতে এসে সহুরে মেয়ে বলে সকলের কাছেই খুব আদর যত্ন পেয়েছিলুম। স্বামী সহরেই পাটের অফিসে চাকরী ক’রতেন। মাসেমাস যেমন বাড়ীতে টাকা পাঠাতেন আমার জন্য তলেতলে গয়না গড়াণও যেন তিনি তেমনি একটা কর্ত্তব্য বলেই মনে ক’রতেন। বাড়ীর মধ্যে তিনি ইংরাজীশিক্ষিত এবং তাঁহারই স্ত্রী বলে আমার প্রতি সকলেরই ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বিশেষভাবেই ছিল। একটী বৎসর এবং এই কয়েকমাস বুঝি বিধাতা আমার জন্য মুক্ত হস্তে সুখের সমুদ্র ঢেলে দিয়েছিলেন, তাই আমার এই পোড়াদেহের যে রূপটা দেখে সকলেই ধন্য ধন্য ক’রতেন তার মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ রইল। বাড়ীর কাজেকর্ম্মে তেমনভাবে আমাকে জড়াতে সকলেই একটু সঙ্কোচ বোধ ক’রতেন এবং আমার খুটিনাটি অসুবিধা ও দূর করবার জন্য শাশুড়ী পর্য্যন্ত আমার তত্ত্বাবধান ক’রতেন। কিন্তু এই পোড়াকপালে এত সুখের তেজ সইবে কেন? এমনি হাসিখুসির মধ্যেই আমার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল সৌভাগ্য কেড়ে নিয়ে বিধাতা যে কার্পণ্য প্রকাশ করলেন তার ফলে আমার এই রূপটা সকলের কাছেই বিষাক্ত মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিল। সম্ভব অসম্ভব সকল তুচ্ছ কটূক্তি আমাকে চারিদিক থেকে শেলের মত বিঁধতে লাগ্‌লো,—অবহেলা একবার আশ্রয় পেলে নাকি তাহা ভস্মে ঢাকা আগুনের মতই

বেড়ে ওঠে।—পরিবারের মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই জীবন্ত অভিশাপকে ক্ষমা করবে কে? কেউ পারেনি, তাই আমার প্রভাত যাহা একটী বৎসর সুখসুবিধার হিসাবনিকাশে আরম্ভ হ'ত তাহাই আবার গঞ্জনা-তিরস্কারে ভরে উঠতে লাগলো। যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আগেও ছিল তাহা এখনও আছে কিন্তু যে পর্দ্দাটা মায়ার মত আমাকে ঘিরে রাখ্‌তো তা যেন স্বামীর সঙ্গে ঘুচে গেল। ভয়ে, আতঙ্কে সকলেই আমার মধ্যে ডাইনীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখ্‌লে আর এমনভাবে প্রচার ক'রলে যে আমারও ভয় হ'ল, বুঝি সত্যসত্যই আমি একটী ডাকিনী। এই দুর্ব্বলতাটুকুরও তখন প্রয়োজন ছিল, অন্যথা সাতটী বৎসর কেমন করে এই কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে, পরিবারস্থ লোকের সেবা করে আস্‌তে পারলুম! তারপরে আমাদের গেরস্থঘরে আমারই মত বিধবাদের যে অদৃষ্ট তার স্রোতে আমার দেহ মন সমস্তই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। একটী মুহূর্ত্তের তরেও বিশ্রাম নাই, কাজ, কাজ, কাজ; ত্রুটির নালিশে কাণ ভোতা হবার উপক্রম হয়েছে, অদৃষ্টের দোষ স্বীকার করে করে আর কোন চেতনাই অবশিষ্ট নাই। এক-একবার মনে হয় আমি বুঝি বেঁচে নাই, আমার প্রেতাত্মা বুঝি কোন ঋণশোধের জন্য দেহটাকে ক্ষয় করবার অপেক্ষা ক'রছে। এমনিভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় যখন মৃত্যুকামনা করে ঠাকুরের কাছে, স্বামীর কাছে মাথা নত করলুম তখনই বুঝি অন্তর্য্যামী ভগবানের দয়া হলো। কলেরার বেশে এসে আমাকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু জানিনা কেন, বোধ হয় আমার এখনও এই সংসারে বাঁচবার সাধ আছে,

পাঁচজনেরই মত সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে গৌরববোধ করবার ইচ্ছা রয়েছে, তাই এই হতভাগিনীর প্রাণটাকে তাঁর পায়ে নিলেন না। আপনারা এসে যে সেবাটা করলেন আমার জীবনের মধ্যে এই দয়াটা যে কতবড় এবং কত আশ্চর্য্য তা যদি বোঝাতে পারতুম,—একি মনু, তোমার চোখে জল এল—তোমার এই দিদির অপরাধ বোধ হয় সহ্য করতে পারছ না!"

বলিতে বলিতে তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। বিমূঢ় ক্লান্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। করুণাদিদির সহস্র ঘাতপ্রতিঘাত যেন প্রত্যক্ষভাবে আমার পিঠের উপর পড়িয়া আমাকে মৃত্যুবৎ করিয়া ফেলিয়াছিল; বুঝি হতভাগিনী দিদির তিক্ত, সংসারবিষাক্ত মুমূর্ষু প্রাণটা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অশান্তির আগুন দুই হাতে ছড়াইয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহিল। আমি ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে কহিলাম, "দিদি সংসারে বাস ক'রতে গেলে দুঃখের অংশটা বাদ দিলে চল্‌বে কেন?"

"ওরে পাষান, দুঃখের কি অবশেষ নেই রে! এই দেহ ভেঙ্গে পড়বার আর বাকী কি! আমার চেয়ে তুই বোধহয় বেশী ছোট হবি না। না হোক্, তোর মত বয়সে যদি কারও স্ত্রী মরে যায় তবে কি সে আমার ন্যায় অপরাধী হয়ে সংসারে বাস ক'রবে? লোকে কি তাকে হতভাগ্য বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে, পরিবারের লোকও কি কটূক্তি ক'রবে;—তা নয় রে, তা নয় আমরা স্ত্রীলোক, অবলা, অসহায়া, অশিক্ষিতা বলেই আমাদের এই দেশের বিচার নাই, ক্ষমা নাই, নির্ব্বাসনই আমাদের চরম শাস্তি নয়।—পলে-

পলে, তিলে-তিলে ক্ষয়রোগীর মত ঘা খেয়ে খেয়ে মৃত্যুই আমাদের পরম শান্তি।" বলিতে বলিতে বিবশ বিবর্ণ মুখের কাতরতা সমস্ত ঘরময় ছড়াইয়া, আমাদিগকে চিন্তার অবসর না দিয়া করুণাদিদি কাষ্ঠপুত্তলীর মত এমন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন যে আমি তাহার কম্পন সহ্য করিতে পারিলাম না, তাহার পা দুটা, চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম,—"দিদি আমারই ভুল হয়েছে, আমায় ক্ষমা করুন।"

"ওকি, ওকি—আমার পাপের তরী ভারী কোরোনা" বলিতে বলিতে তিনি আমার হাত চাপিয়া পা ছাড়াইয়া বলিলেন, "এই সম্মান জীবনে আজই পেলুম। তোমরা মানুষ নয় দেবতা।"

ফেলুদা তেমনি নির্ব্বাক তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, "মনু বাড়ী চল।"

"দাঁড়ান, যাবেনই তো, এখানে এই জীবন্ত পাপের সম্মুখে ব'সে সোয়াস্তি কই? আচ্ছা ফণীবাবু, একটা কথা বলবো আপনারা তার উত্তর দেবেন?"

ফেলুদা এমন অকস্মাৎ তাঁহার দিকে চাহিল, যে করুণা দিদি যেন একটা ঠেলা খাইয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,— "আচ্ছা আপনাদের মতে স্ত্রীলোকের কি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে নেই? শাস্ত্রের অনুশাসন কি কোন সময়েই মানুষের হৃদয়ের অপেক্ষা করে না?"

আশ্চর্য্য অভিভূত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি ধারণা করিতে পারিলাম না যে, করুণা দিদি উন্মাদ না প্রকৃতিস্থ হইয়াই হিন্দুঘরের সকল আবরণ মুক্ত করিয়া অক্লেশে এই হীন-কথার

অবতারণা করিলেন। এতক্ষণ আমার চিত্তে যে পবিত্র মূর্ত্তিটিকে শ্রদ্ধার নির্ম্মাল্য দিয়া অঞ্জলি দিতেছিলাম তাহা যেন একটা ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দুঘরের বিধবা আবার বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়া কিরূপে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে চায়! ফেলুদার ন্যায় অটল হিমাদ্রীগম্ভীর সংসারবিরাগী ব্রহ্মচারীর মনে যে ইহার তিক্ত বিষ কতদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া যাইবে ভাবিয়া আমার মনের সমস্ত বিস্তৃতি একনিমেষে সঙ্কুচিত হইয়া অন্ধকারের কৃষ্ণ আবরণে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ফেলুদা তেমনি নীরব তেমনি শান্তভাবে কহিলেন, "মনু, বাড়ী চল।"

আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া অগ্রসর হইলাম। করুণা-দিদি দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া কহিলেন, "অনেক কষ্ট দিলুম, অনেক অসঙ্গত কথা বললুম, অনেক অন্যায় করেছি—মাপ্ করবেন। মাঝে মাঝে দেখা পেলে খুব সৌভাগ্য মনে করব। মনু ভাইটি, তোমার দিদিকে যেন একেবারে ভুলো না!"

তাহার নম্র স্নিগ্ধ বাক্যগুলি আমার কাণের মধ্যে তপ্তশিষা ঢালিয়া দিতেছিল, আমি তাহার দাহ বাঁচাইবার জন্য বড় বড় পা ফেলিয়া ফেলুদার পশ্চাতে অন্ধকারে মিশিয়া গেলাম।



৫

করুণাদিদির সকরুণ মর্ম্মদাহী অভিনব কথাগুলি সমস্ত পথেই আমার কাণের মধ্যে নানা বেশে নানা ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিচিত্র সুর তুলিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল। স্তব্ধ নিশীথিনীর অমানিশার মত তাহার আচ্ছন্ন সজল চক্ষুদুটি গভীর রহস্য-যবনিকার অন্তরালে আমার মনের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য লেপিয়া পুছিয়া একাকার করিয়া ফেলিল। করুণাদিদির অনর্গল মর্ম্মঘাতী আত্ম-ব্যক্তির মধ্যে মধ্যে ম্লান হাস্রির ছটায়, যে একটী লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল বিরচিত হইয়া অন্তর্ঘনভাবের আবেগে, নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মত অশ্রুগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটুকু আভাস যেন আমাকে দুঃখে যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি পথের মধ্যে ফেলুদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না কিন্তু উভয়ের নীরবতা যেন উভয়কেই ক্লান্ত করিয়া তুলিল। পেচকের অকাল চীৎকার মধ্যে মধ্যে আমাদের বুক চিরিয়া বাহিরের অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছিল। ফেলুদা আমাদের গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া কহিল, "মনু, আজ আমাদের না আসাই ভাল ছিল, তাহ'লে এই দুঃখের ইতিহাসটুকু আমাদের প্রাণে এমন ভাবে আঘাত ক'রত না। আর সেখানে যাব না,—কি বলিস্?"

"কিছুতেই না। প্রথমে আমার একটু শ্রদ্ধা তাঁর উপর হ'য়েছিল কিন্তু তার শেষ প্রশ্নটায় আমার মন বিষিয়ে উঠেছে। তিনি যতই

দুঃখ পেয়ে থাকুন না কেন বিধবা হয়ে বিয়ের আশাটা কি পাপ নয় ফেলুদা ?"

"পাপ তো বটেই, কিন্তু তাঁর সে দুঃখটা যে কত বড় এবং কত অসহ্য তা হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না। আর—" ফেলুদা কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম "আমাদের বুঝেও দরকার নাই। যতই কঠিন হউক তাঁর দুঃখের ভার তিনি কি ইহা আমাদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান না ? না হলে আমাদের সম্মুখে এত কথা বলার প্রয়োজন তো আমি দেখছিনা ?"

"হয় তো তাই," বলিয়া ফেলুদা কিছুক্ষণ নীরবে পদচালনা করিয়া কহিল "যাক্‌গে, আমরা আর যাব না,—কি বলিস্ ? ওকি, কিসের শব্দ আসছে রে ? কেউ কাঁদছে না ?"

আমি একলম্ফে ফেলুদার পার্শ্বে আসিয়া রামনাম উচ্চারণ করিয়া তাহার ডানহাতটা চাপিয়া ধরিলাম। ফেলুদা বলিল, "ওকি রে ভয় পেলি ? ওই যে সুমুখের বাড়ীটাতে আলো জ্বল্‌ছে না ? কেউ হয় তো মরেছে তাই বাড়ীর মেয়ে-ছেলে কান্নাকাটী ক'রছে। কলেরা দেখছি আমাদের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে ! তখনও নারীকণ্ঠের একটানা ক্রন্দনের সুর আমাদের উভয়েরই প্রাণে আঘাত করিয়া "সেবার" মূর্ত্তিটাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া কহিলাম মেয়ে লোক কাঁদ্‌ছে, চল দেখে আসি।"

"চল্" বলিয়া ফেলুদা ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ক্রন্দনের ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া অগ্রগমন করিল। তাহার সঙ্গে আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদের উভয়েরই মন গলিয়া গেল। একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের কোলে কুসুমসুকুমার শিশুপুত্র চিরনিদ্রায়

শায়িত; সম্মুখে বসিয়া একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, মৃত ভ্রাতার শোকে আত্মহারা হইয়া আকুল আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রৌঢ়ার কাছে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া জানিলাম, সন্ধ্যার সময় তাঁহার পুত্র কলেরার কবলে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছে কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাহার শবের কোন সৎকার হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করা আমরা কেহই সঙ্গত মনে করি নাই,—তাই বলিলাম, "এখানে জ্বালানি কাঠ আছে?" প্রৌঢ়ার পাণ্ডুর মুখখানি তাহার আড়ষ্টতা লইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কাঠও আছে, পোড়াবার স্থানও আছে—কিন্তু বাবা তোমরা!"

ফেলুদা উত্তর দিল, "আপনার কোন ভয় নাই, আমরা ব্রাহ্মণ —এই গাঁয়েরই লোক;" বলিয়া ফেলুদা আমাদের পিতার নাম বলিয়া সম্যক্ পরিচয় জ্ঞাত করাইয়া দিল।

আমাদের পরিচয় পাইয়া রমণী শবদেহটীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া নির্ব্বাক হতভম্বের ন্যায় বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া রহিলেন। যে বালিকাটী আমাদের আগমনে অশ্রুজল মুছিয়া অকূলে কূল পাইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছিল, সে আমাদের কথার উত্তরে বলিয়া উঠিল, "আমরাও ব্রাহ্মণ।" প্রৌঢ়া তাহার দিকে শুধু বেদনাহত-দৃষ্টিতে একটিবার চাহিলেন, তার পরেই আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, আমাদের মড়া কি তোমরা ছোঁবে? গণদেব চক্রবর্ত্তীর বাড়ী বোধ হয় তোমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। সেই পাষণ্ড যখন তাহার পুত্রের মৃতদেহটী ফেলে

চোরের মত পালিয়ে গেছে তখন তোমরা তার জ্ঞাতিভাই হয়ে কি এ মড়া সৎকার করবে ?"

ফেলুদা এতক্ষণ শবদেহ তুলিয়া লইবার জন্য ঝুঁকিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সে এক লম্ফে হটিয়া গিয়া কহিল, "লোকে আপনাকে নিয়েই বুঝি কানাকানি করে! মন্নু, বুঝতে পেরেছি, উঠে আয়, ছুঁস্‌নে এ মড়া ছুঁস্‌নে।"

প্রৌঢ়ার পরিশ্রান্ত চক্ষুদুটী তীব্র বিদ্যুতের ন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "হাঁ, গণদেব, যে মহাপাতক তোমাদের সমাজের মাথার মণি, যার সহায়তায় বহু বিলাতফেরৎ সমাজে উঠ্‌ছে, যে নাকি বহু কুলনারীর গর্ভপাত করিয়েছে, যে কাপুরুষ পরস্ত্রীর আঁচল ধরে বহুস্থানে অপমানিত হয়েছে, সেই সমাজকুলতিলক তোমাদের নমস্য, আর সেই হীন কাপুরুষ গণদেবের রক্ষিতা আমি। আমার ছেলের মড়া ছোঁবে কেন? তার বাড়ীর সব লোক যদি ওলাউঠায় মরে ছারখার হয়ে যায় তাহ'লে তোমরা সকলেই তাদের শুশ্রূষা করবে, কাঁধে করে মড়া শ্মশানে নিয়ে যাবে, আনন্দে শ্রাদ্ধের সময় ভূরি-ভোজন করবে। যাও বাবা, তোমাদের এটুকু দয়া না করলেও চল্‌বে!"

ফেলুদা চীৎকার করিয়া কহিল, "মন্নু, উঠে আয় বল্‌ছি—কুলটার এত বড় কথা সাজে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হয় একথা কি আগে জানা ছিল না?"—বলিয়াই ফেলুদা আমার হাত ধরিয়া এমন হেঁচকা টান্ মারিল যে আমি তাল সামলাইতে না পারিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেলাম। বালিকাটি এতক্ষণ ফেলুদার উত্যক্ত ব্যবহারে বোধ হয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহাকে

লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনার যাবার ইচ্ছা হয় তো যান না, ওঁকে টান্‌ছেন কেন?" বলিয়াই আমাকে মাটি হইতে তুলিয়া আড়াল করিয়া বসিল। আমার পা-দুটী মন্ত্র-মুগ্ধ-প্রায় মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল; আমি ফেলুদার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বালিকাটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুপ্লাবনে ঘন চক্ষুপল্লব সিক্ত করিয়া কহিল, "আপনিও চলে যাবেন? আমাদের এই চরম শাস্তিতে আপনারও একটু দয়া হলনা। মা, গো!"

মায়ের বেদনাজর্জ্জর প্রাণের মধ্যে তখন আর কণামাত্র শান্তি-বারি অবশিষ্ট ছিল না, তিনি স্তব্ধ অবিচল অকুণ্ঠার সহিত কহিলেন, "যেতে দাও মা, ওঁরা যে ব্রাহ্মণ!"

"আমিও তো ব্রাহ্মণের মেয়ে মা! তুমি বল না মা বুঝিয়ে বল!" মায়ের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধ হয় দুঃসাধ্য ছিল। তাই তিনি তাহার সকল অপমান, সকল অপবাদ, আত্মগ্লানি নীলকণ্ঠের ন্যায় হজম করিয়া পাষাণ-প্রতিমার মত শুধু একবার আমার দিকে চাহিলেন। একটা অনুরোধ-বাক্যও তাঁহার মুখে বাহির হইল না। ক্ষীণ অশ্রু-সম্ভাষণ তাঁহার চক্ষে ব্যক্ত হইল না, শুধু এক অব্যক্ত অপরিত্যজ্য শোকের ছায়া তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট অঙ্গের অব্যতিরিক্ত অংশস্বরূপে তাঁহার চোখে মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। আমি আমার দ্বিধানিষণ্ণ মনের মধ্যে তাহারই স্পর্শ অনুভব করিয়া মূঢ়ের মত দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "ফেলুদা, মানুষের শত সহস্র অপরাধও এই সময়ে ধুয়ে যায়! একটীবার ক্ষমা করে শিশুর শবটার সৎকার করে যাই।"

ফেলুদা অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে আপনার কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া কহিল, "তোমার ইচ্ছা হয় থাক, আমি কিছুতেই পার্‌ব না!"

ফেলুদার এই কথা কয়েকটী যেন আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়া গেল। এতদিন আমি ফেলুদার সহিত অভিন্ন থাকিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। আমি তাহার শিষ্য, তাহার বাল্যসখা, অকৃত্রিম বন্ধু। কিন্তু আজ এই অখণ্ড অনবদ্য বন্ধুত্বের শীর্ষপ্রদেশে একটা মেঘচ্যুত বজ্রপাত বিদীর্ণ হইয়া যেন আমাদের সম্মুখের এই শিশু-শবের মধ্য দিয়া বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "রাগ কর্‌ছো, ফেলুদা, এই শিশু (কী) দোষ ক'রলে আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পারছি না?

ফেলুদা আমার কথার প্রত্যুত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না, একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অন্ধকারের অন্তর্প্রদেশে আত্মগোপন করিল। একদিকে বালিকার বেদনাবিদ্ধ অবনত দেহখানির পানে চাহিয়া অপর দিকে ফেলুদার নির্ম্মম নিষ্ঠুরের ন্যায় গৃহত্যাগের পশ্চাতে ঘৃণার ক্লেদাক্ত মুখচ্ছবি অনুভব করিয়া আমার লুপ্তচেতন-প্রায় বিক্ষুব্ধ-হৃদয়,—একদিকে প্রকৃতির নিবিড়তম হতাশ্বাসময়ী অমানিশা, অপর দিকে তারকাপুঞ্জের ম্লান রশ্মিদীপিকা, এই দুই সৃজন-প্রলয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সম্মুখে পশ্চাতের পরস্পরবিরোধী আলোড়নে দলিত মথিত হইতে লাগিল। মৃত্যু আসিয়া যে শিশুর পবিত্র আত্মা বিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছে তাহার প্রতি সামাজিক বিদ্বেষে কী যে শ্রেষ্ঠ মহৎ অনুষ্ঠান সাধিত হইবে তাহার কোন যুক্তি আমার

বিশৃঙ্খল মনের উপকূলে জাগিয়া উঠিল না। আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া সেই সন্ত-শোকার্ত্তা দুই মাতাকন্যার সম্মুখে বসিয়া তাহাদের দুঃখের অংশ কথঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রহণ করিবার লোলুপতা আমি সংস্কারের বর্ম্ম দিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পারিলাম না। ফেলুদার সহিত তর্ক করিবার সময় মৃত শিশুর মাতার দুই চক্ষুতে যে অভিমান, যে হিংস্র আগুন ঠিক্‌রিয়া বাহির হইতেছিল, আমার প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা গলিয়া শবের সমস্ত দেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা এতক্ষণ অসহায়ভাবে আমাকে অনুরোধ করিয়া যে অশ্রুপাত করিতেছিল তাহার মধ্য দিয়া—ঘনপুঞ্জাবৃত নীলিমার কোলে প্রভাতের অরুণাপ্লুত ছবিখানি—মলিন মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া আমার প্রাণের মধ্যে যে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত অব্যক্ত বেদনার স্পর্শখানি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা চিরদিনের তরে মুদ্রিত হইয়া গেল। বালিকা ভাবাবেশে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া আমাকে এমন অস্থির করিয়া তুলিল যে আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে বাধ্য হইলাম। মাতা বলিলেন, "কনক, তুই একবার বাবুর সঙ্গে যা, আমাদের গোয়ালঘরে কোদালি আছে দেখিয়ে দিয়ে আয়।—'কাজলকে' তো আর পোড়ান হবে না মাটি-চাপা দিয়ে রাখ্‌তে হবে!"

আমি উঠিয়া কনকের পিছু পিছু চলিলাম। কনক কেরোসিনের ডিবা হাতে লইয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই নিন্, আপনাকে কি বলে ডাক্‌ব?"

আমি কোদালি হাতে লইয়া বলিলাম "আমার নাম

মানবেন্দ্র, সকলে মনু বলেই ডাকে,—তুমিও মনুদাদা বলে ডাক্‌বে।"

বাহিরে আসিয়া কনক একটু গম্ভীর মুখে বলিল, "মনু দাদা, তুমিই কি মনুসংহিতা বই লিখেছ?"

আমি অবাক হইয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার বিস্ময়াবিষ্ট মুখের দিকে কৌতুকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "মনুইতো শাস্ত্রের কথা লিখেছেন। বাবা আমাকে এই বই থেকে অনেক কথা শিখিয়েছেন। সব কথা আমার ভাল লাগে না, একটু একটু না বদ্‌লালে আমার মনের সঙ্গে খাপ্‌ খায় না। আচ্ছা মনুদাদা, শাস্ত্র কি সত্যি?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "শাস্ত্রের সব কথাইতো ঠিক বলে জানি, কিন্তু আমি তো সেই মনু নই কনক! সেই মনু যে আমার জন্মের বহু আগে বই লিখে গেছেন।"

বালিকা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। মাতা এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি 'কাজলকে' কোলে লইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া পুকুরপারে একটা বেলগাছের তলা দেখাইয়া বলিলেন, "এখানে মাটি খুঁড়ে দাও বাবা! একটু বেশী গভীর করে—না হলে শেয়ালে এসে মাটি খুঁড়ে আমার 'কাজলকে' নিয়ে যাবে!" বলিয়াই তিনি গগনবিদারী ক্রন্দনে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপাইয়া তুলিলেন। আমার চোখের কোণে জলরেখা স্ফীত হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া কাজলকে ধরিত্রীর গর্ভে চিরশীতল শয্যায় শায়িত করিয়া যখন আমরা বাড়ী ফিরিলাম তখন শুকতারা হেলিয়া

পড়িয়াছে। কনক আমার পায়ের কাছে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি এই শোককাতরা মাতা ও কন্যার দুঃখের সীমা ধার্য্য করিতে না পারিয়া ম্লান গৃহখানির ততোধিক ম্লান আসবাবপত্রের দিকে চাহিয়া ভাঙ্গা-হাটের নীরবতা লইয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম।

৬

দুই আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘূর্ণাবর্ত্তে আমার চিত্ত এতক্ষণ যে ভাবে ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিতেছিল শিশুর শবসৎকারের পরেই তাহা শান্ত হইয়া ফেলুদার ব্যথালিপ্ত ক্রোধারক্ত মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। আমার মানসিক স্বাতন্ত্র্য যে—ডিম্ব হইতে বহির্গত পক্ষীশাবকের ন্যায় পাখা মেলিয়া স্বাধীনতার আকাশে, ফেলুদার অপরিমিত বিশ্বাসী চক্ষুকে চমকিত করিয়া উড়িতে পারে, একথাটা এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রতিভাত হইল যে, আমি মুহূর্ত্তের জন্য একটা ভিন্ন সত্বা উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার সম্মুখে সমস্ত সংসার যেন আমার করায়ত্ব দেখিতে পাইলাম, এতদিন যে দৃষ্টিতে পৃথিবী-টাকে দেখিয়া আসিয়াছি ঠিক সেরূপভাবে যেন আর দেখিতে পারিতেছি না; আকাশের রঙ বদলাইয়া গিয়া তাহারই ছায়াতে আমি যেন নবরূপে ধরাধামে আমার একান্ত সুখ-সুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার তরণীটিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার মত প্রেরণা অনুভব করিতে পারিলাম। আমি ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহার হিসাব দিবার জন্য আর ফেলুদার আদেশের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না, ইহাতে একটু আনন্দের সুখকর উন্মাদনা আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ফেলুদা যে আমার এই নব-জাগ্রত আত্মার হস্তপদসঞ্চালন এমন কি তাহার কচিমুখের ভাঙ্গাভাঙ্গা কথাগুলি সহ্য করিতে পারিবে না ইহাতে কোনই

সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এরূপ হইবে? সে যদি তাহার অন্তরের সমগ্র শক্তি লইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে তবে কি আমি এই প্রতিকূলতা ভেদ করিতে পারিব? সকলেই জানে, যে সে আমার পরিচালক, তাহার শত্রুতায় আমার অস্তিত্বটা খড়-মাটিছাড়া দেবমূর্ত্তির বাঁশের ফ্রেম হইয়া যাইবে এই ধারণাটাই এতদিন সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া আসিয়াছি! কিন্তু আমার ভবিষ্যতের শত লাঞ্ছনার সম্ভাবনা দেখিয়াও ফেলুদার গত রাত্রির কার্য্যটাকে আমি মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহার ত্যাগদীপ্ত মুখখানি করুণাদিদির সেবাচন্দনে যেভাবে মহিমান্বিত হইতে দেখিয়াছি তাহার সমস্ত প্রতিভা কেন যে 'কাজলের' মড়া দেহটার সংকারের সামনে ম্লান হইয়া গেল ইহার কোন সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া ফেলুদার জপ তপ ঈশ্বরোপলব্ধির স্বপ্ন সমস্তই এক নিমেষে অকিঞ্চিৎকর মনে হইল।

নৈরাশ্যভরা মন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাহির-বাড়ীতেই মাতা বলিলেন, "দাঁড়া, চান্ করে ঘরে আস্‌বি। বেশ্যাবাড়ীর শব দাহ করে এসেছিস, তোর কি আক্কেল বল্ দেখি! তোর বড়দা শুন্‌লে যে রেগে আগুন হয়ে যাবে। চুপেচুপে ডুব দিয়ে আয়। সমস্ত রাত খাওয়া নাই ঘুম নাই, চোখ মুখ বসে গেছে", বলিয়াই তিনি ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তিনি বোধ হয় এতক্ষণ আমার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু এই কথা যে ফেলুদাই তাঁহার কাণে তুলিয়াছেন তাহাতে কোন সংশয় রহিল না। ইহাতে ফেলুদার উপর আমার আরও ক্রোধ হইতে লাগিল। ফেলুদার কত অন্যায় কত ত্রুটি আমি নীরবে হজম করিয়াছি তাহার

জন্য যে একবিন্দু কৃতজ্ঞতাও ফেলুদা স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হইল এই হীনতাটা যেন আমার প্রাণে কশাঘাত করিতে লাগিল। দুর্লভ বন্ধুত্বের সকল গাম্ভীর্য্য যে এমনভাবে ধূলায় লুটাইবে তাহা তো আমার স্বপ্নেরও গোচর ছিল না। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রা অনাহারে আমার দেহ মনে আর কোনই শক্তি জাগ্রত ছিল না তাই আমিও ইহা লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া আহারান্তে ঘুমাইয়া পড়িলাম। অপরাহ্নে ঘুম হইতে উঠিয়াই ফেলুদার কাছে যাইবার জন্য আবার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অভিমানের আঘাতে তাহাকে শান্ত করিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িলাম। যে অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় আমরা সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিতাম তাহারই অনতিদূরে একটা হিজলগাছের তলায় বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফেলুদাকে অশ্বত্থ গাছের তলায় আসিতে দেখিয়া আমি আড়ালে মুখ লুকাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। ফেলুদা আমার দিকে চাহিলেন কিন্তু ডাকিবার মত কোন চেষ্টা দেখিলাম না। বাড়ী আসিয়া পড়ার ঘরে বসিয়া আমি বুঝিলাম যে আমাদের বন্ধুত্ব মৃত কাজলের সঙ্গে সঙ্গে মাটি-চাপা পড়িয়াছে। যা' হো'ক পরদিন আমি আমার কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিয়া বৈকালে আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই পাতাবাহারের গাছগুলি ছাঁটিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিলাম। ফুলের গাছগুলিতে মাকড়সা জাল পাতিয়াছিল, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া বাগানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। প্রতিদিন ইহা আমার একটা বাতিক হইয়া উঠিল। প্রত্যহই ফেলুদাকে দেখিয়াছি, চোখোচোখী হইয়া উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়াছি কিন্তু

কাহারও মুখে কথা নাই যেন কোন কালেই কোন—পরিচয় ছিল না।

দিন পনের এই ভাবে যাইবার পর একদিন হঠাৎ দেখি ফেলুদাও আমাদের বাগানের পার্শ্বে কতকগুলি পাতাবাহারের গাছ পুঁতিয়া একটী ছোট বাগান সাজাইয়া তুলিতেছে। ইহাতে আমার মনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল।

এমনিভাবে মাসখানেক অতিবাহিত হইল কিন্তু ফেলুদার সঙ্গে সন্ধির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমি ছন্নছাড়াভাবে চলাফেরা আরম্ভ করিয়া দিলাম। সমস্ত কাজকর্ম্মের শৃঙ্খলা ব্যাহত হইয়া একটা অনিয়ম বেশ স্পষ্টভাবেই উভয়কে চিন্তিত করিয়া তুলিল। ফেলুদাকে বৈকালে আর বড় একটা অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় দেখিতে পাই না কিন্তু কোথায় যে যায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে আমার আরও অসুবিধা হইল। এতদিন তবু সব সময়েই তাহাকে কাছে পাইতাম, একটা আশা ছিল, যে শীঘ্রই আমাদের এই ঝগড়ার অবসান হইবে। এখন সে পথ বন্ধ হইল ভাবিয়া আমি মনটা শান্ত করিবার জন্য কাঁধে চাদর ফেলিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িলাম। রবিশস্যের ফুলে-ফসলে মাঠের মধ্যে একটা সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া যাইতেছিল। আমি অনেকক্ষণ জমির পাশ দিয়া ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে আসিয়া কনকদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই এক মাসের মধ্যেও একটীবার না আসাতে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বাসা বাঁধিয়াছিল, তাই আস্তে আস্তে বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিলাম, কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই দেখি কনক একটা বাছুরের লেজ ধরিয়া

দৌড়িতে দৌড়িতে গোয়াল ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। আমি তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইতেই সে উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা, এই যে মনু দাদা এসেছেন। তুমি এতদিন আসনি যে মনুদা?"

আমি একটা বাজে ওজর দেখাইয়া বলিলাম, চল তোমার মা'র কাছে যাই। কনকের মা এতক্ষণ রান্নাঘরে বসিয়া রাত্রের আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়াই বাহিরে আসিয়া কনককে একটী জলচৌকি দিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "এতদিনে মনে পড়্ল বাছা, আমি আরও ভাবছি, বুঝি অসুথ-বিসুথ কর্‌ল বোধ হয়। কনক তো তোমার কথা দিন-রাত্তিরই আলোচনা করে। কনক একটু বাতাস কর, বড় গরম পড়েছে বাবা!"

কনক একটা তালপাখা আনিয়া আমাকে বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। আমি পাখাটি তাহার হাত হইতে লইয়া বলিলাম, "সময় পাই না মোটে। পরীক্ষার সময়ও এসে পড়েছে তাই আপনাদের এখানে আস্‌তে পারি নাই।"

কনকের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর ভাল ছিল তো?"

"হাঁ ভালই। আপনাদের কুশল তো?" এই বলিয়া আমি এক গ্লাস জল চাহিয়া পান করিতেছি এমন সময় কনকের মাতা কয়েকটী বাতাসা আনিয়া বলিলেন, "শুধুমুখে জল খাবে বাবা, এই বাতাসা-ক'টি মুখে দিয়ে জল খাও। তুমি যে এসেছ ভালই হয়েছে! আমরা তো এ গ্রাম ছেড়ে যাব ভাব্‌ছি। কবে যাই এখনও কিছু ঠিক নাই!"

"কেন, আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন কেন? কোথায়

যাবেন," বলিয়া উৎসুক ব্যগ্রনেত্রে কনকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিতেছে।

কনকের মা বলিলেন, "বাবা, তোমরা এখনও ছেলে মানুষ, সব কথা হয় তো বুঝ্বে না। আমরা যে এই সমাজে থাক্বার যোগ্যা নই। গণদেব চক্রবর্ত্তীর আশ্রয় এতদিন বাস করেছিলাম কিন্তু আজকাল সেও বড় একটা এখানে আসে না—আর আস্বে বলে আশাও নেই। তুমি হয় তো বল্বে গণদেব না এল তো কি হয়েছে? কিছুই হবে না অবশ্যি; কিন্তু আমি এতদিন যে আশায় এখানে পড়ে আছি তা তো হবার কোন পথ নেই, এ সমাজে ভদ্রলোকের সঙ্গে বাস করা তো আমার হতে পারে না। আমি যে পতিতা!"

মায়ের মুখে যে বিশেষণটা শুনিয়া কর্ণপাত করিবার মত প্রবৃত্তি হয় নাই তাহাই কনকের মায়ের স্বীকারোক্তিতে শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত চিত্তে বসিয়া সম্মুখের বাঁশঝাড়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কনকের মা পুনরায় আমার চিন্তাটাকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিয়া কহিলেন, "আচ্ছা মনু, আমাদের ন্যায় স্ত্রীলোককে ক্ষমা কর্লে কি তোমাদের সমাজ অধঃপতনে যেতো? আমিই ভুল করেছিলাম। আমাকে যখন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানেরা বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যায় তখনও আমার এই সমাজের ভদ্রস্থতার প্রতি লোভ ছিল, সমাজের শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল, তাই মুসলমানের আশ্রয় হতে পালিয়ে এসে এই সমাজের নেতা গণদেবের পায়ের তলায় আশ্রয় চেয়ে কেঁদেছিলাম। সেও আমায় সমাজে তুল্বে বলে অনেক চাটু-বাক্যে আমাকে ভুলিয়ে তার বাড়ীতে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু অতি গোপনে তার বাড়ীতে লুকিয়ে থাকার সময়েই আমার সন্দেহ

হয় যদিই সে আমাকে সমাজে তুল্‌বে তবে সে আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌বে কেন? এই সন্দেহের মধ্যেই যে কু-ভাবটা গণদেবকে আমার এই পোড়া রূপের দিকে পতঙ্গের ন্যায় ঠেলে দিয়েছিল তা প্রকাশ হ'তে দুই মাসই যথেষ্ট। সে আমার জন্য তার মান-ইজ্জত দুই পায়ে মাড়িয়ে আমাকেও কলঙ্কিনী করে তুল্‌লে। শেষে সে নিরুপায়-ভাবে আমাকে পৃথক করে এখানে এনে ঠাঁই করে দিলে। যাক্‌গে সে সব কথা। তারপরে যা হয়েছে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ, কিন্তু এর মধ্যে আমার একটা ভুল হয়েছিল—তার শাস্তি ভগবান আমাকে এখন দিচ্ছেন। আমার পক্ষে মুসলমানের আশ্রয়ে থাকাই উচিত ছিল। তাদের সমাজে থাক্‌লে আমার এই লাঞ্ছনাটুকু হ'ত না, তারা আমাকে কুলটা বলে ঘৃণা কর্‌ত না, তাদের কাছে আমি বৌ হয়ে যত্ন পেতুম, মা হয়ে অপরাধিনী হতুম না। যাক্, এর মধ্যে আমার এই ভুল ছিল—হিন্দু সমাজের প্রতি বিশ্বাস। যে সমাজ আততায়ীকে শাস্তি দিতে অক্ষম তাদের যে দুর্ব্বলকে ক্ষমা করার ক্ষমতা নাই একথাটাই আমার আগে বোঝা উচিত ছিল। শাসন আর ক্ষমা একই শক্তির কোলে দুই ভাই-বোন। তারা যে আমাকে এমন হতাদর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তার মধ্যে কোন কল্যাণের লেশমাত্র আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে মনু!"

তাঁহার কথাগুলি আমার মনের সংস্কারের মূলে আঘাত করিয়া আমাকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রতি দোষারোপে তাহা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার দ্বেষ-কুটিল অধরোষ্ঠ হইতে এক প্রকার বিকৃত বিষ স্ফুরিত হইতেছে দেখিয়া

বলিলাম, "এই সাবধানতা অবলম্বন না করলে সমাজ টি*কবে কেন মা!"

আমার মুখ হইতে মাতৃনামোচ্চারণে ক্ষণিকের জন্ম তাঁহার মুখ পরম ব্যথায় আলোকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, "ভেতরে ইঁদুর পুষে বাইরে থেকে মাটি চাপালে তা থাক্‌বে কেন! একদিন না একদিন তা জীর্ণ বেশে ধূলিসাৎ হবেই। ভেতরে সহস্র গলদ, নৈতিক শক্তির ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাববশতঃ ইহা পচে পড়বার বেশী দেরী নাই। এ সমাজের দুর্ব্বলতার জন্মেই মুসলমানেরা আমায় চুরি করবার সাহস পেয়েছিল, কিন্তু তার শাস্তি দেবার মত প্রবৃত্তি অথবা শক্তি এর নাই, না হলে সমাজ সহজেই আমাকে পুনরায় ঘরে ফের্‌বার মত উদারতা দেখাতে পারতো।"

"সত্যের অনুরোধেই উদারতা দেখাতে পারেনি। আপনার যে পাপ হয়েছে তা কি আপনিই ভুল্‌তে পারছেন?"

আমার এই আক্রমণটা যেন তাঁহাকে ভীষণ আঘাতে হিংস্র করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন, "আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলটাকে পাপ বলে তোমরা দূরে রাখ্‌তে পার কিন্তু এর ফলে এ সমাজও অচিরে চিরসমাধি লাভ করবে।"

আমি বলিলাম, "ভুলচুকটাকেও স্বীকার করে নিতে হবে! হিন্দুসমাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে পাপের প্রশ্রয় দেবে না।" একটুখানি ম্লান হাসিতে তাঁহার মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া তিনি বলিলেন, "মানুষের পক্ষে এই কৃচ্ছ্রতার কোন মূল্য নাই। মানুষ এই বাঁশের বেড়াটার মত নয়! বেড়াটা কোন দিন ভুল করে না,

মিথ্যা বলে না, চুরি করে না, তার স্থানটীর বাইরে এক পাও গতি-বিধি নাই। কিন্তু মানুষকে যেমন ঘরেও থাকতে হয় বাইরেও চলাফেরা করতে হয় তেমনি সত্যপালনও করতে হবে, ত্রুটিও স্বীকার করে নিতে হবে। মানুষ যদি বলে আমি শুধু ডান পায়ে হাঁটবো তবে কি সে বেশী দূর হাঁটতে পারে? লাফিয়ে লাফিয়ে খোঁড়ার মত কিছুদূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে তখন আর চলবার ইচ্ছেও হবে না—দুই পায়ে যারা চলে তাদের প্রতি সহজেই ঈর্ষা হবে। আমাদেরও আজ এই অবস্থা মনু। জোর করে এক পায়ে চল্‌ছি আর গুহামধ্যে প'ড়ে বাহিরের ওলটপালট দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌ছি আর প্রতি পলে গায়ের প্রতি অঙ্গে পচ ধর্‌ছে তবু বল্‌ছি, আমার এই ভাল, এই গুহার বড় দুনিয়াতে কিছু নাই। এই ভাবে এই সমাজের মৃতদেহ দেখ্‌লে যে আমি কত সুখী হই সে আর তোমাকে বুঝাই কেমন করে।"

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তলোলুপ শ্বাপদের বজ্র-চক্ষুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাঁহার দিকে চাহিতে পারিলাম না, হেঁট হইয়া পা দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ তিন জনেই চিন্তিত মুখে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির তীব্র ঝঙ্কার শেলের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনিই পুনরায় নীরবতা দূর করিয়া কহিলেন, "আসল কথা কি জান, মনু? আমরা রমণী বলেই সমাজটা এই কাপুরুষতা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। নারী-জাতিকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে জানে না,—নারীর লজ্জা ইজ্জৎ বাঁচাবার মত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা নাই, এই সমাজ নারীকে যে ভাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখতে চায় পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তা

চায় না। এই জন্যই অন্য জাতের কাছে এই সমাজকে মাথা হেঁট করে থাক্‌তে হয়!

যাও তো মা, তোমার মনুদাদাকে একটু দুধ এনে দাও!" শেষ কথাকয়টী তিনি কনককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন। কনক এক বাটি গরম দুধ আমার সম্মুখে রাখিয়া গিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। তাহার মা "দাঁড়াও বাবা" বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা ডালায় করিয়া কিছু চিঁড়া ও বাতাসা আনিয়া দিয়া বলিলেন, "কিছু নূতন ধানের চিঁড়ে কুটেছিলাম; ও কি ঠেলে রাখ্‌লে চল্‌বে কেন বাবা, অভাগিনী মায়ের কথার অমান্য ক'রো না", বলিয়াই তিনি আমার বাটিতে চিঁড়া ও বাতাসা ঢালিয়া জল আনিতে চলিয়া গেলেন।

তিনি যে আমার মাতৃ-সম্বোধনের দাবী এমনভাবে রক্ষা করিবেন তাহা আমি ভাবি নাই। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কেমন করিয়া তাঁহাদের ঘরে খাইব এই বিচার বিবেচনার তুচ্ছতম পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি এমনি অবলীলাক্রমে আমাকে সম্মোহিত করিলেন, যে, তাঁহার সরলতার কাছে আমি বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি আমার সম্মুখে বসিয়া কহিলেন, "আজ তোমার জাত গেল মনু?"

আমি তাঁহার রসিকতাটাকে গাম্ভীর্য্য না দিয়া কহিলাম, "মায়ের হাতে খেলেও নাকি জাত যায়? তা যায় যাবে, এখন তো আর এই লোভটা সাম্‌লাতে পার্‌ছি না!

আমার মনে হয়, ঘৃণা না হ'লে সকলের সঙ্গেই খাওয়া-বসা রাখা মানুষ মাত্রেরই উচিত। ধর্ম্মের নাম করে নীচ জাত উচ্চ

জাতের ভেদ সৃষ্টি করলে সমাজের একতা থাকে না, আর এই একতা নেই বলেই বোধ হয় আমাদের পরাধীনতা সম্বল", বলিয়াই চাহিয়া দেখিলাম মাতার মুখ হইতে অপূর্ব্ব অভিনব তৃপ্তির রশ্মি নির্গত হইয়া তাঁহার দুই চক্ষু উদ্ভাসিত হইয়া গেছে।

তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছ বাবা। আসলে শ্রেণীবিভাগটা শুধু কাজের বেলা প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তীমশায় কনককে যখন গীতা পড়াতেন তখন আমি বেশ কাণ পেতে শুনেছি, ভগবানের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে খাওয়া-ছোঁওয়ার শ্রেণীবিভাগের কথা কোনখানেই নাই। অবশ্য আজকাল শুধু ব্রাহ্মণকে দোষ দেওয়া চলে না, ভদ্র কায়স্থ থেকে নীচ জাতি সকলেরই নৈতিক বলের এত অভাব হয়ে পড়েছে, যে তারাও এই শ্রেণীর সিঁড়িটাকে মর্য্যাদা দিয়ে পূজো না করলে পাপের ভয় করে। কিন্তু এই সংস্কারটা যত শীঘ্র হয় দূর করা উচিত।"

কথাটা শেষ করিয়া তিনি বাহিরে তাকাইয়া অকস্মাৎ মুখখানা বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া একবার আমার দিকে চাহিয়াই একটা শঙ্কার ভাব গোপন করিয়া ফেলিলেন। সম্মুখেই গণদেব চক্রবর্ত্তী তাঁহার কামরূপের বেতের লাঠি হাতে লইয়া চৌকাঠের মধ্যে এক পা বাড়াইয়া আমাকে এমতাবস্থায় দেখিয়া স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার শরীরের সমস্ত লোমকূপ খাড়া হইয়া শিহরিয়া উঠিল। গণদেব চক্রবর্ত্তীর রসিকতার খ্যাতি তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাঁহার কদর্য্য রসিকতার দ্বারা আমার আশঙ্কা এবং অসহায় ভাব দূর করিয়া

কহিলেন, "খাও ভায়া, এই মধুর হাতে খেতে পাওয়া বড়ই সৌভাগ্য। বলি মোহিনী! আজকাল ছোকরাদের হাত কর্তে আরম্ভ করেছ কি আমাদের অন্ন তুল্‌বার জন্যে? তা হ'তে দিচ্ছি না, এখনও দাঁত আছে, চিঁড়ে আমরাও খেতে পারি!"

এই পরিহাসবাক্য আমার হাতখানি স্তব্ধ করিয়া চিঁড়াগুলিকে এমন শক্ত কঙ্করের মত করিয়া তুলিল, যে আমি বসিয়া বসিয়া জল-চৌকির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কনকের মা একখানা জল-চৌকি আনিয়া গণদেবের সম্মুখে দিয়া কহিলেন, "ছেলেটার সৎকার কর্‌বার ভয়ে পালিয়েছিলে আবার পোড়ামুখে কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না! পাষান হয়ে মুখ দেখাতে এসেছ, ছি ছি! ছি বল্‌লে আর তোমার জীবনে রইল কি, ধিক্! আমার এই ছেলে যদি এসে না পর্‌ত তবে বোধ হয় 'কাজলের' শেষ কাজ হত না।"

গণদেব এক মুহূর্ত্তে তাঁহার ঘৃণালিপ্ত মুখখানিতে চোরা হাসি টানিয়া কহিলেন, "ভায়া দেখ্‌ছি অনেক আগে থেকেই যাতায়াত করে। তা বেশ্‌তো বেশ্‌তো আমি তা হলে উঠ্‌লাম।"

আমার আর চিঁড়া খাওয়া হ'লো না। আমি হাত গুটাইয়া জলের ঘটি লইতে হাত বাড়াইলাম। মা তৎক্ষণাৎ আমার হাতটা চাপিয়া বলিলেন, "না খেয়ে উঠ্‌ছ যে বাবা, আমার মাথা খাও এটুকু খেয়ে নাও।" বলিয়া তিনি গণদেবের পানে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "মুখে আগুন তোমার মরণ হয় না, কার সঙ্গে কি কথা বল্‌তে হয়, তাও জান না? তোমার ইচ্ছে হয় যেতে পার!"

গণদেবের মুখের উপর দিয়া একখণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাবে কালই কা'র দুয়ারে গিয়ে

দাঁড়াতে হয়। আর মনু, তোমারও এই খাওয়ার জন্যে জাত গেল তা জেনো !”

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মা বলিলেন, “আমার হাতে ভাত না খেলে যার ক্ষিধে যায় না তার মুখে এত বড় কথা সাজে না। তুমি কি মনে কর,—যে দেশে গণদেব নাই সে দেশের মানুষ ভাত পায় না !”

“তাই তো আমি জানি”, বলিয়া গণদেব লাঠিতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল। কনক একবার মায়ের মুখের দিকে পরক্ষণেই করুণভাবে আমার দিকে তাকাইয়া লজ্জার আবেশে মাথা নত করিল। মা বলিলেন, “যাক্‌গে, আপদ বালাই, দূর হ’ দূর হ’ মিন্‌সে” ! বলিতে বলিতে তিনি ধপ্ করিয়া দরোজাটা বন্ধ করিয়া পুনরায় খুলিয়া ফেলিলেন। আমি আচমন শেষ করিয়া পান লইয়া বলিলাম, “তা হলে মা, এখন আসি।”

মা আমাকে বাহির পর্য্যন্ত বাতি দেখাইয়া কহিলেন, “আমাদের যাওয়ার আগে খপর দিলে এসো বাবা ! আসবে তো ?”

“নিশ্চয়ই আসব”, বলিয়া আমি কুণ্ঠিত গ্লানিপরিপূর্ণ ভীত মনখানির সহিত দ্বন্দ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।



৭

প্রভাতের নিদ্রাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের আচ্ছন্ন ক্লান্তি দূর হইয়া স্বচ্ছ অন্তর্প্রদেশটীর সমস্ত গোপন অংশ পর্য্যন্ত স্পষ্ট দিবালোকে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। গত রজনীর সমস্ত কথাগুলি একে একে আমার চোখের সম্মুখে চিত্রাবলীর ন্যায় ব্যথায়—আনন্দে, ভয়ে—ভাবনায় রঞ্জিত হইয়া প্রতিভাত হইল। আমি যে কনকের বাড়ীতে খাইয়া সত্যই সমাজের কাছে দোষী, গণদেবের এই কথাটা যেন আমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবার জন্য পুনরায় আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রচ্ছন্ন হাসির অন্তরালে থাকিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। গণদেব যে-এই ত্রুটি লইয়া পঞ্চমুখ হইবে, সমাজের কাছে আমাকে অপদস্থ করিতে সহস্র প্রকারে চেষ্টার ত্রুটি করিবে না, অথচ গণদেবের নামেও এই নালিশ উত্থাপন করিলে তিনি তাঁহার সম্মান পদমর্য্যাদা ও অর্থের সাহায্যে এই আক্রমণ সহজেই ব্যর্থ করিয়া দিবেন। কিন্তু আমার ধর্ম্মভীরু বড়দাদা এই বিচ্যুতি প্রশ্রয় দিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আমাকে মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া ছাড়িবেন না। একে একে কনকের মায়ের যুক্তিপূর্ণ অকাট্য বাক্যগুলি আমাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল কিন্তু বড়দাদার গম্ভীর তেজোব্যঞ্জক শান্ত চক্ষুর তরবারিতে তাহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার কল্পনায় আমার চিত্ত প্রতিক্ষণেই এই উচ্ছ্বাসের অপেক্ষা করিয়া ভস্মাবৃত

আগুণের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন এমনিভাবে কাটিয়া গেলেও যখন আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইল না, তখন আমি যেন, সম্মুখোস্থিত ক্রুদ্ধ পশুরাজের উদ্যত নখাঘাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম বলিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। কিন্তু গলাতে মাছের কাঁটা লাগিলে যেমন হয়, একটা কথা কেবলি আমার মনের মধ্যে বসিয়া তেমনিভাবে ব্যথা দিতেছিল। 'কাজলের' শব-সৎকারের পূর্ব্বে ফেলুদার সম্মুখে গণদেবের নিন্দা-পরিবাদ করিবার কালে তাঁহার মায়ের সমস্ত মুখ যেমন ঘৃণা-বিদ্বেষের উচ্ছ্বাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত গতরাত্রির কথাবার্ত্তায় দেখিতে না পাইয়া তাঁহার এই আনত নম্র ভাবটাকে আমি প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কনকের মা যদি গণদেবকে তেমনিভাবে গালাগালি দিয়া অপমানিত করিতেন, আর সেই পাপিষ্ঠ বৃদ্ধ যদি সেই লাঞ্ছনার বাণে জর্জ্জরিত হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতেন, তবে, আমি যতদূর উৎসাহিত হইতাম, মাতার স্নিগ্ধ বাক্যগুলি তাহার কোন আভাস না দিয়া সংশয়ের জালে ব্যামোহিত করিয়া তুলিল। এক নিমেষে মায়ের প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধা কালিমালিপ্ত হইয়া আমাকে তাঁহাদের বাড়ীর দিকে না যাইবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগিল। তাঁহার সমাজ-সংস্কারের প্রবুদ্ধ বচনগুলি আমার কাছে নিরর্থক হইয়া তাঁহার প্রতি একটা তাচ্ছল্যের ভাব মনের মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। আমার এই নূতন অনুভূতির ফলে, সৎকার-ক্রিয়াটা যে নিতান্ত মূর্খের কাজ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া ফেলুদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য মন প্রমত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দেড় মাস

যাবৎ ফেলুদার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ। তাই এই অসহ্য অবস্থাটা আমাকে কেবলি অশান্তির দিকে ধাবিত করিল।

এই প্রকারের অব্যক্ত অপরিমিত বেদনা লইয়া আরও তিন মাস কাটিয়া যাওয়ার পর আম কাঁঠালের মরসুম পড়িয়া গেল। এই সময়টা আমাদের গাছে-গাছেই কাটিত, কিন্তু সে'বার আর ফেলুদা আমার সঙ্গে নাই; আমি একাকী আম পাড়িয়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া বাগানে সময় কাটাইতে লাগিলাম। আমাদের আমবাগানের পার্শ্বেই ফেলুদার বাগান। মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মুখে এক প্রকার গাম্ভীর্য্য, এমনি বিরক্তি লইয়া বিরাজ করিত যে আমার সন্ধি-সত্ত্বা আহত ফণিনীর ন্যায় বিবরে প্রবেশ করিতে চাহিত। কিন্তু বিধাতা আমার প্রাণের এই ব্যথা দূর করিবার সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

বর্ষাসমাগমে আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিকে জল থৈ থৈ করিয়া উঠিল। সদর হইতে কালেক্টারসাহেব সপত্নীক আসিয়া পানসী বাঁধিয়া আমাদের কৌতুহল বাড়াইয়া তুলিলেন। তিনি প্রায় পনের দিন যাবৎ আমাদের ঘাটে নৌকার নোঙ্গর ফেলিয়াছেন। আমরা প্রতিদিন বৈকালে ভ্রমণোপলক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতাম। ফেলুদাও মাঝে মাঝে এই সাহেব মেম দেখার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইত। সেদিনও যথারীতি আমি ও মেজদা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে ভৈরবনাদে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুমুল ঝড় বৃষ্টি আসিয়া আমাদিগকে গৃহাভিমুখে ধাবিত করিল। কিছুদূর দৌড়িয়া আসিয়াই লোকালবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে অদ্ভুত মর্ম্মঘাতী দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কালেক্টার

সাহেবের পত্নী বোধ হয় গ্রাম হইতে একাকী ফিরিতেছিলেন। আকাশের মেঘসজ্জা ও গুরুগর্জ্জন শুনিয়া পথের দূরত্ব কমাইবার জন্যে তিনি মাঠের সিক্ত আল ধরিয়া আসিবার কালে অন্যমনস্কভাবে জুতা মোজা সমেত একটা পচা ডোবার কাদায় পড়িয়া করুণ কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। মেমের মিনতিপূর্ণ ক্রন্দনে আমার প্রাণ সাহায্যের আশায় আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু মেজদা আমাকে ধমক দিয়া কহিলেন, "কেন তুল্‌তে যাবি। ও বেটীদের এমনি ভাবেই মরণ হোক, আমাদের উপর যে ভাবে অত্যাচার করে, সব সময়েই ঘৃণা করে চলে, তাদের কি সাহায্য কর্‌তে আছে? তুই সাহায্য কর্‌বি কিন্তু ওরা এত অকৃতজ্ঞ যে, পরক্ষণেই তা ভুলে গিয়ে তোকে জব্দ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। আয় চলে আয়, মরুক্‌গে!"

আমার প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বেই ফেলুদা সেই দিক দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল। সে আসিয়া কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঝপাস্‌ করিয়া জলে নামিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল, "মনু চেয়ে আছিস্‌ যে বড়, নেমে আয়!"

আমি মেজদার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ফেলুদার সঙ্গে মেমের হাত ধরিয়া পাঁজাকোলা করিয়া তাঁহাকে আনিয়া উপরে তুলিয়া দিলাম। ভয়ে মেমের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি আমাদিগকে তাঁহাদের পানসীতে পৌছিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পানসীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার কালে কালেক্টারসাহেব কৃতজ্ঞচিত্তে বহু ধন্যবাদ দিলেন। মেমসাহেব তাঁহার রেশমী থলিয়া হইতে দুইখানি

দশটাকার নোট বাহির করিয়া ফেলুদার সাম্‌নে ধরায়, ফেলুদার বিকৃত মুখ দেখিয়া তাহা থলিয়ায় রাখিয়া দিলেন। ফেলুদা তাঁহাকে বলিলেন, "আমাদের বাংলাদেশের লোক সাহায্য করে মূল্য নেয় না। আমাকে এ ভাবে অপমান কর্‌বেন জান্‌লে এ কাজে হাত দিতাম না।"

আমার ভয় ছিল বুঝি এই প্রত্যাখ্যানের সহিত উদ্ধত বাক্যে সাহেবের ক্রোধ উৎপাদন করিবে, কিন্তু আশ্চর্য্যচক্ষে সাহেবের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই চক্ষে কৃতজ্ঞতার শৌর্য্য ছাড়া কিছুই বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি আমাদের দুই জনের পিঠে চাপড় মারিয়া আরও ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন।

কিন্তু ফেলুদার সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হইল ভাবিয়া আমি মেমসাহেবকে শতশত ধন্যবাদ ও তাঁহার মঙ্গল-কামনা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

ঘটনাটি এইখানেই শেষ হইল না। ইহা লইয়া ফেলুদা ও মেজদার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাঁধিয়া চিরতরে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল। মেজদা বলিলেন, "তোমার দেশবাসীকে পরাধীন করে রাখ্‌তে চায় যারা, তা'দের প্রতি সহানুভূতি দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।"

ফেলুদা স্নিগ্ধবাক্যে উত্তর দিল, "দেশবিদেশের কথা ভুলে গিয়ে একটু বিচার কর। একজন অসহায়া স্ত্রীলোক সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে তাহা না দেওয়াতে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তার দায়ী আমাদের দেশের লোক হ'তে পারে না।"

"স্ত্রীলোক বলে কি তা'র আন্তরিক ইচ্ছার মধ্যে কুটিলতা নেই ?"

"হয়তো থাকৃতে পারে, কিন্তু, বিপন্নকে সাহায্য করা আমাদের

হিন্দুর প্রধান কর্ত্তব্য। সে সময় তা'র জাতি কুলশীলের বিচার কর্‌তে নাই। এইগুলোও আমাদের দেশের প্রধান কাজ। আমরা স্ত্রীলোককে সম্মান কর্‌তে পারিনে বলেই আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা!"

মেজদাদা ফেলুদার কথাটায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এই উদারতার জন্যেই তোমরা বাইরের শত্রুকে ঘরে এনে পরাধীনতা ডেকে আন্‌ছ। একটু শক্ত না হলে এখনও অনেকদিন এই অপমান মাথায় বয়ে বেড়াতে হবে।"

"দেখ যোগীন, আমার দেশের এই উদারতা, এই প্রেম ভাবের জন্যে যদি আরও নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় তাও কর্‌ব, কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে দেশটাকে বাহিরের আপিস আদালত সৈন্য সামন্ত কামান গোলার আধিপত্যে আবদ্ধ ক'রো না। অন্তরের স্বাধীনতার জন্যই ভারতবর্ষ এতদিন ধরে পশুবলে⋯বলীয়ান জাতির নির্য্যাতন সয়ে এসেছে, আর এই স্বরাজ্য দিয়েই আমরা জগতের মনোজগতে স্বাধীনতা বিস্তার করব। হিংসার পরিবর্ত্তে হিংসা আমাদের নীতি নয়, হিংসার পরিবর্ত্তে আলিঙ্গনই আমাদের ধর্ম্ম। জাননা বুদ্ধের শিক্ষা, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম কোন পথের নির্দ্দেশ দেয়?"

ফেলুদার মুখখানা অলৌকিক আলোকে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। সে যেন ধ্যানপটে মহাপুরুষের সুপবিত্র মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিল। মেজদা তাহার এই আধ্যাত্মিকতার প্রতি কোন দিনই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। তিনি বিদ্রূপতিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাদের এই ধর্ম্মভাব নিয়ে তোমরা রসাতলে যেতে বসেছ, তবু চেতনা নাই। দেশকে জাগাতে হলে শক্তির পরিবর্ত্তে

শক্তির বিকাশ চাই। আপিস আদালতগুলো বাদ দিয়ে তোমরা কিছুতেই দেশের শাসনভার হাতে নিতে পার না। আমরা দিন-দিন জীর্ণ দীনহীন হয়ে যাচ্ছি শুধু এই অবহেলার মোহে। এক কাঠা জমির উপর যা'দের দাবী নাই তারা বিশাল বিশ্বপ্রেমের অধিকার করবার কল্পনা কর্‌লে লোকে বাতুল ছাড়া আর কিছু বল্‌বে না।"

"এইখানেই তোমাতে আমাতে তফাৎ যোগীন, দেশটার বাহির নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট, কিন্তু অন্তরের গৌরবময় সুউজ্জ্বল আলেখ্যটী তোমার অনধিগম্য, কিন্তু আমি আমার দেশের জল-মাটীকে তাহার অন্তরের শ্যামলিত সুস্নিগ্ধ প্রেমমণ্ডিত বিরাট কল্যাণমূর্ত্তিটীর বিকাশ বলেই জানি। অন্তরের মলিনতা বিদূরিত হ'লে বাহিরের সৌন্দর্য্য আপনিই মহিমান্বিত হবে। একটু তলিয়ে দেখ যোগীন।"

"আমার তলিয়ে দেখবার পূর্ব্বে তুমি একবার চক্ষু মেলে দেখ। তোমার সম্মুখে ক্ষুধিত দেশের আত্মা দারিদ্র্যের করাল বদনে ধুক্‌ছে, ম্যালেরিয়ায় মরে হেজে যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষে মড়কে দেশ শ্মশান হতে আর দেরী নাই। এখনও একটু উপর হতে নেমে এসে তাদের উন্নতির চিন্তা কর। পরাধীন জাতি হয়ে এত বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রেম করে চীৎকার কর্‌ছ বটে, কিন্তু স্বাধীন জাতের লোক প্রকাশ্যে না হলেও পরোক্ষে দাঁত বার করে তোমাদের এই আহাম্মুকীর মোটেই তারিফ্‌ করে না। আত্মমর্য্যাদা নাই বলেই কুকুরের ন্যায় চাবুক খেয়ে পদলেহন কর্‌তে যাচ্ছ, ধিক্‌!" বলিয়াই মেজদা একটা গর্ব্বদীপ্ত কটাক্ষে ফেলুদার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলেন। সে রুষ্ট চক্ষে

চাহিয়া অধর দংশন করিয়া কহিল, "যার ঢাল-তলোয়ার নেই, পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই, তার পক্ষে আস্ফালনই সম্বল। কিন্তু জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ কর্‌তে হলে সুকঠিন সাধনা দরকার। শুধু বক্তৃতা দিয়ে দেশ গরম কর্‌তে পারবে, মনটাকে হিংস্র নেকড়ে বাঘের মত কর্‌তে পারবে তোমার ন্যায় হুজুগে লোক, কিন্তু আসল কাজ হবে না। তোমরা দেশের যে দুঃখের বর্ণনা করে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু তার অশ্রুজল দূর করা তো দূরের কথা, তোমার গ্রামের মধ্যে যে কত নিরন্ন নিঃসহায় লোক, হা—অন্ন, যো—অন্ন করে মারা যাচ্ছে তার প্রতীকার কি কিছু কর্‌তে পারছ? শত শত মন চাউল বিতরণেও এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার অনল নিবৃত্ত কর্‌তে পার্‌বে না। এ ক্ষুধা যে পেটের ক্ষুধা নয়, মনের ক্ষুধাই অসন্তোষের আগুনে লক্ লক্ করে ফুঁরে বেরোচ্ছে। তোমার পাশ্চাত্য দেশেও কি এই অভাব নেই? তারা বিলাসে সম্পদে কলে কারখানায় প্রতিদিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জগতটাকে নিংড়ে রস তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, কিন্তু, যে কলসীতে তা'রা ভেসে বেড়াচ্ছে বলে তোমার ধারণা, সেই কলসীর তলায় মস্ত ফুটো আছে, কাজেই অচিরাৎ সে নিমগ্ন হবে সন্দেহ নাই। বাহিরে অভাবের আগুন জ্বালিয়ে শান্তির প্রত্যাশা পাগলের প্রলাপ। ভেতর থেকে ভারতের সত্য যুগের কল্পনা স্বার্থক করে তোল, দেখ্‌বে, চিরশান্তিতে দেশ স্নিগ্ধ হয়ে যাবে।"

ফেলুদার প্রাঞ্জল ভাবাবিষ্ট অভিব্যক্তিতে মেজদা কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "পরাধীন জাতির আর অন্য উপায় নেই তাই এই বড় বড় বুলি।"

ফেলুদা ক্রুদ্ধ বিরক্তিতে অধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বড়র সাধনা না করলে বড় হ'তে পারবে না। নিজের মনঃপুত হয় না বলে অপরকে নিন্দা করা আমাদের অতি হীন স্বভাব। পরাধীন বলেই আজ আমি এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করেছি এবং আমি এর জন্য ভগবানের শাস্তি-হস্তের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

ভগবান তোমাকে পরাধীন থাকতে বলেনি। খৃষ্ট বলেছেন, যারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে তারা ভগবানের প্রিয় হয়।"

"তোমার কেতাবী মুখস্থ বিদ্যাটা চাপা দিয়ে নিজের মনের মধ্যে খুঁজে দেখ, কি সৌম্যমূর্ত্তি নিয়ে নবারুণলিপ্ত সুপ্রভাত, রাত্রির অবসানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন ভারতের দুয়ারে এসে সমস্ত জাতি প্রণতশিরে এই অমৃত লুটে নেবে। তাই আমাদের এখন ভগবানের দিকে চেয়েই চলতে হবে!"

"দেশের মধ্যেও ভগবানের কথা তুলছ। এই ভগবান ভগবান করে আমরা ক্রমেই দেশ ভুলে, দেশের কল্যাণ ভুলে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছি।"

"ইহা আমাদের উপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ। ভগবানকে এত ক্ষুদ্র বলে ধারণা ক'রো না। বাহিরের সমগ্র কর্ম্মে কাজে যেমন ভগবানের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি প্রত্যেক জাতির উপরও বিধাতার শুভ ইচ্ছা ফল দেয়। ভগবানকে ভুললে আমাদের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা।"

ফেলুদার এই কথার পর যে তুমুল ব্যক্তিগত আক্রমণ আরম্ভ হইল তাহা বিবৃত করা আমার পক্ষে অসাধ্য। ঈশ্বর বোধ হয় তাহাদের তর্কের মধ্যে পড়িয়া নিজের প্রাণ হাতে লইয়া তাহাদের

দুইজনকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিলেন। সেই দিবস হইতে ফেলুদার ছায়া মাড়াইতেই মেজদা নারাজ। কিন্তু আমি এই দুই মল্লশক্তির মধ্যে পড়িয়া, টাগ—অব্—ওয়ারের দড়ির মত শক্ত-ভাবে সংযোগ রক্ষা করিয়া রহিলাম।



সেদিন একপশলা বৃষ্টি হইয়া পথে কাদা জমিয়াছিল। আমি আস্তে আস্তে ফেলুদার ঘরে আসিয়া তাহাকে ধ্যানাবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। মেঘনির্ম্মুক্ত অস্তোন্মুখ সূর্য্যের হরিৎবর্ণের কিরণে বৃক্ষতরু সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া ইহার ম্লান আভা আসিয়া ফেলুদার কপালে পড়িয়া উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। আমি ধীরে ধীরে তামাক সাজিয়া নিশ্চিন্তমনে ধূমপান করিয়া ফেলুদার দিকে হুঁকাটা বাড়াইয়া দিলাম। ফেলুদা একদমে একটা লম্বা টান দিয়া হুঁকাটা চৌকির কোনে ঠেকাইয়া বলিল, "মন্টু, সংসার ক্ষেত্রে সাধনার বড় বাধা। আমাদের সন্ন্যাসী হ'তে হবে। সন্ন্যাস নিতে হলে বুদ্ধের ন্যায় গৃহত্যাগ কর্‌তে হয় তা জানিস্? জগতের যত মহাপুরুষ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁরা যৌবনকালেই পরিবারের মায়া ত্যাগ করে ডোর—কৌপীন নিয়েছিলেন। তুই পার্‌বি?"

অনেকদিন হইতেই গেরুয়া পরার সখ আমার ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিলাম, "পার্‌ব নিশ্চয় পার্‌ব, কাপড় চোপড় গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নেব তো?" "তা ত নিশ্চয়ই নেব" বলিয়া ফেলুদা পদ্মাসন ছাড়িয়া বলিলেন, "আগে মনস্থির করে নিই, চল্ আমার সঙ্গে।"

আমি তাহার কথামত উঠিয়া গেলাম। আমাদের স্নানের ঘাটের

পার্শ্বেই একখানি ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা ছিল। ফেলুদা তাহা চালাইয়া বলিল, কাটোয়ার শ্মশানে একজন সন্ন্যাসী এসে বাস করছেন, তাঁর কাছে কিছু সদুপদেশ নিয়ে আসি।"

অমানিশার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ মাথায় নিয়ে আমরা নৌকা ঠেলিয়া চলিলাম। সন্ধ্যার প্রথম আভাস মাঠের উপর ম্লান ছায়া ফেলিয়াছে। অদূরে হাট-প্রত্যাগত হাটুরেরা নৌকায় বসিয়া ভাটিয়ালি সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে। আমরা উভয়েই নিবিড় গাম্ভীর্য্য লইয়া সন্ন্যাসের স্বপ্নে বিভোর। ক্ষণপরেই শ্মশানের পাদদেশে নৌকা বাঁধিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। শ্মশানের পার্শ্বেই আমাদের নৈহাটী গ্রামের বিনোদ বৈরাগীর মায়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী ছোট মন্দির। আমরা মন্দিরের মধ্যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া দেখিলাম কিন্তু কোথাও কেহ নাই। ফেলুদা একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্‌গে, সময় না হলে গুরুর দর্শন মেলে না, তা বলে নিরাশ হলে চল্‌বে না। আজ শ্মশানে বসে ধ্যান করে মন স্থির করি আয়।"

আমরা উভয়ে গিয়া শ্মশানের মধ্যস্থলে আসন করিয়া বসিলাম। অনতিবিলম্বে রাত্রির গূঢ় অন্ধকার আমাদিগকে ঘেরিয়া শ্মশানের ভীষণত্ব বাড়াইয়া তুলিল। ফেলুদা ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে কি একটা মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন। আমি তাহারই অস্ফুট শব্দে সাহস সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। এক একবার ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছিল। চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা কলসীগুলির মধ্যে যেন এক একটী প্রেতাত্মা আমাদিগের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কত বৃদ্ধ যুবক শিশু নর নারী নির্ব্বিশেষে এই পবিত্র শান্তি-সদনে দেহাবসানের পর মুক্ত হইয়াছে, কত পাপী এখানে ভূত হইয়া

পাশের বটগাছ ও বেলগাছের উপর বসিয়া মুক্তির অপেক্ষা করিতেছে, অদূরে কয়েকটা শিয়াল কি একটা পদার্থ লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া বিকট শব্দে বিবাদ করিতেছে। আমার মনে হইল যেন আমার আসনের নিম্ন প্রদেশে ভূগর্ভ হইতে কেহ মাথা তুলিয়া উঠিবার জন্য আমাকে ঠেলিতেছে। আমার রোমাঞ্চিত দেহের স্পন্দন নিস্তব্ধ হইয়া হিম-শীতল বরফের ন্যায় জমিয়া গেল। আমি স্থির নির্ব্বাক উৎকণ্ঠায় ফেলুদার নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ডাকিনী যোগিণীর নৃত্য-সম্ভাবনার ভয়ে আতঙ্কে বিজড়িত হইতে লাগিলাম। মন্দিরের গাত্র সংলগ্ন বটবৃক্ষের কুহরে বসিয়া একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল। আমার আপাদমস্তক তাহার কম্পনে দুলিয়া উঠিল। এমন সময় ফেলুদা আরম্ভ করিল, "মনু, সংসার ত্যাগই শ্রেয়। নারী নরকের দ্বার। মানুষ প্রতিপদে এই নারীর সাহায্যে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই দিবসের মোহিনী জাতি, নিশীথের বাঘিনী মূর্ত্তিতে আমাদের সকল সাধনা সকল জপতপ হরণ করে নিচ্ছে, এই সদ্য নরকের প্রতিচ্ছবির আশ্রয়মুক্ত হওয়াই যোগীর লক্ষণ। রমণীজাতিকে বর্জ্জন করে এমনি ভাবে সমাহিত শান্তভাবে ধ্যান প্রাণায়ামে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলে দেহ শুদ্ধ হবে। কূটস্থ হয়ে বাহিরের চেতনা বিলুপ্ত হয়ে ঈশ্বরে যোগযুক্ত না হ'লে সিদ্ধিলাভ হবে না। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য ত্যাগ। তুই পারবি মনু?"

আমি এতক্ষণ যে ভয়ে অভিভূত হইতেছিলাম তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম ভাবিয়া বাঁচিয়া গেলাম। আমি বলিলাম, "পারব"!

ফেলুদা আবার বলিল, "কামনা বাসনা লোপ না হলে আমাদের একাগ্রতা সম্ভব নয়। এখন হ'তে কামিনী কাঞ্চনের লোভ পরিত্যাগ কর। আত্মীয়জনের আদর যত্নের আকাঙ্খা সম্যক বিসর্জ্জন দিয়ে মূলাধারস্থ চিন্ময়ী-শক্তি জাগিয়ে, সহস্রারে শতদল-মূর্ত্তিতে বিকশিত কর, জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হবে, সংসারে দ্রষ্টার ভাব আস্‌বে, জ্ঞানের আলোকে সমস্ত চিত্ত উদ্ভাসিত হ'বে। কাজেই আমাদের সন্ন্যাস নিতে হবে। সাধনার প্রথম এবং শেষ বাধা নরকের দ্বার নারী। তাহাকে প্রথমেই ত্যাগ করে, পাহাড়ে পর্ব্বতে নির্জ্জনে সাধনা কর্‌তে হবে, তবেই সদ্‌গুরুর দর্শন মিল্‌বে। সাধুগণ বলেন, আকুলতা থাক্‌লে গুরু আপনিই দর্শন দেন। আমাদের ও আত্মসংযম করে কুটস্থ ভাবে এই সাধনা কর্‌তে হবে।"

বলিয়াই সে চতুর্দ্দিকে মৃত্যু-শীতল নীরবতা বাড়াইয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া উঠিয়া বলিল, "চল্‌ বাড়ী যাই"।

আমি ফেলুদার সব কথা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টাও করিলাম না, কিন্তু আপাততঃ উঠিবার কথা শুনিয়া পরম মুক্তি অনুভব করিয়া উঠিয়া গেলাম।

পরদিন রাত্রিযোগে আমাদের কাপড় গেরুয়া রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দুই নবীন সন্ন্যাসী সংসারপঙ্ক পশ্চাতে ফেলিয়া বৈদ্যনাথের দিকে যাত্রা করিলাম। কয়েকদিন ক্রমাগত পদচালনায় নানা বিপদ-সঙ্কুল বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানিকে বেতো ঘোঁড়ার মত ঠেলিতে ঠেলিতে যখন আসিয়া বৈদ্যনাথধামের কালীমন্দিরের দুয়ারে বিছাইয়া দিলাম তখন সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা

পবিত্র ঝঙ্কারে কীর্ত্তন করিয়া আরতি আরম্ভ হইয়াছে। তৃষ্ণায় আমাদের কণ্ঠনালী শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় মনে হইতেছিল।

মন্দিরের পাদদেশে বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন একটী প্রাচীন দির্ঘিকা হইতে আকণ্ঠ জলপান করিয়া আমরা নাটমন্দিরের এক কোণে তল্পীতল্পা ফেলিয়া শুইয়া পড়িলাম। রৌদ্রে জলে অবিরাম হাঁটিয়া আমাদের পায়ে ফোস্কা পড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণা কঠোর-ভাবে অনুভব করিলেও, সন্ন্যাসের লিপ্সায়, তাহা উভয়েই, পায়ের তলে জুতার কাঁটার ন্যায় গোপন রাখিয়া উদাসীনভাবে চলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু একটুখানি আশ্রয় পাইয়া এই বেদনা যেন সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইবার জন্য জ্বরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল। কঠোর পরিশ্রমের পর নিদ্রা যে কত গভীর হইতে পারে তাহা জীবনের মধ্যে আজই প্রথম অনুভব করিলাম। গায়ে প্রবল জ্বরের উত্তাপ, অন্তরে আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদ—বেদনা দুইই যেন এই নির্জ্জন করাল-বদনা বিভীষণার মন্দির-সংলগ্ন গহন বনপ্রদেশের স্তব্ধতায় মূঢ় মুগ্ধ হইয়া কাতরভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অধিক রাত্রিতে আমি শীতে আড়ষ্ট হইয়া জ্বরের প্রাবল্যে আর্ত্তনাদ করিয়া জাগিয়া গেলাম। শূন্য নিস্তব্ধ পুরী যেন কোন সাধনায় নিমগ্ন হইয়া তান্ত্রিক ভীষণতা প্রচার করিতেছে। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলাম। পার্শ্বেই ফেলুদা, নিস্পন্দ অচেতনের মত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আমার সমস্ত শরীরে এমন দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা হইতে লাগিল যে আমি পুনরায় ধূলিশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই পদশব্দে চাহিয়া দেখিলাম একটী প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী ভৈরবী আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আমার

দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে। আমার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল। আমি চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমার মূর্চ্ছার ভয় দূর করিয়া বাঙ্গালী রমণীসুলভ কোমল কণ্ঠস্বরে বলিলেন, "তোমরা কা'রা বাছা, দেখছি এই অল্প বয়সেই সন্ন্যাস নিয়েছ। তুমি কাঁদছ কেন ছেলে, তোমার কি বাড়ীর জন্ত মন কাঁদছে ?"

আমার শরীরের রক্ত-বিন্দুসকল যাহা জমিয়া বরফের টুকরার মত অনুভব করিতেছিলাম, সেগুলির পুনঃ সঞ্চালন বুঝিয়া, কণ্ঠস্বরে বলপ্রয়োগ করিয়া বলিলাম, "মা আপনি কে তা জানি না, আমার ভয়ানক জ্বর হয়েছে, যদি একটু জল খাওয়াতে পারেন তবে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।"

সন্ন্যাসিনী আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "উঠে খাও।" আমি উঠিয়া হাত জোড় করিয়া মুখে ধরিবামাত্র তিনি কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া বলিলেন, "তুমি একটু ঘুমোও, আমি তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি।" আত্মত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর স্নিগ্ধ মনোরম বাক্যে আমার বক্ষের অবরুদ্ধ বেদনা হাহাকার করিয়া বাহির হইতে চাহিল। আমি দুই চক্ষু মুছিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার প্রত্যেক কমনীয় অঙ্গুলি চালনা, আমার মনের কঠোরতা ভাঙ্গিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। একে একে আমার বাড়ীর কথা, মায়ের কথা মনে পড়িয়া দুই চক্ষু স্ফীত হইয়া অনুতাপের তরলতা গলিয়া মাটী ভিজিয়া গেল। মায়ের মত স্নেহশীলা রমণীর করুণাস্পর্শ আমাকে সন্ন্যাসের সঙ্কল্প হইতে ছিনাইয়া গৃহাভিমুখে

যাইবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগিল। ফেলুদা বলিয়াছিল, "নারী নরকের দ্বার।" কিন্তু মাতৃস্নেহের মত স্বর্গলোক বিধাতার সৃষ্টির কোন অজ্ঞাত অংশে থাকিতে পারে! যাঁহার স্তন্য পানে আমার এই দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে, যাঁহার আকুল যত্নে আমার দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে, যাঁহার অবিরাম নিঃস্বার্থ আদরে আমার হৃদয়প্রদেশ স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সাধনা কোথায়, শান্তি কোথায়, সিদ্ধি কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে এক মুহূর্ত্তে এই সন্ন্যাসী বেশ, গৈরিক বস্ত্র, এই স্বেচ্ছাকৃত ক্লেশের অভিনয় সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। এই যে রমণী আমার পরিচর্য্যায় অনাহূতভাবে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে এই ত্যাগ এই মানবত্ব এই প্রেমের মহিমায় সমালোকিত মূর্ত্তির কোনখানে অসুন্দর,—কোনখানে নরকের গ্লানি বিচ্ছুরিত হইতেছে? এই করুণায় প্রদীপ্ত মুখখানির চতুর্দ্দিকে স্নেহের যে প্রতিভা জগতের সকল আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছে তাহার তুলনা কোথায়?

এই প্রকার আত্মগ্লানি, অনুশোচনা আমাকে অন্তরে অন্তরে জীর্ণ করিয়া অবসাদ-ছায়ায়, ঘুমের প্রলেপ মাখাইয়া দিল। উত্তপ্ত অবসন্ন দেহ লইয়া যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন মন্দিরের সেবায়েৎ-বৃন্দ মাতৃপূজার আয়োজনে ব্যস্ত। ফেলুদা উঠিয়াই স্নান করিয়া আসিয়া মন্দিরের বারান্দায় ধ্যান করিতে বসিল। আমিও সমস্ত রাত্রির অবসাদ দূর করিবার জন্য এই জ্বর-দেহেও অবগাহন-স্নান করিয়া ফেলুদার পার্শ্বে বসিয়া গেলাম। এইভাবে ধর্ম্মকার্য্যে সেইদিনও কাটাইলাম, রাত্রিও কাটিল, কিন্তু, আমার পরিচর্য্যা-

নিরতা বিগত রজনীর কল্যাণ-মূর্ত্তিটী দৃষ্টিগোচর হইল না। আমার মনের মধ্যে এই ছবিটী জাগ্রত হইয়া কেবলি বলিতে লাগিল, "বাড়ী ফিরিয়া যাও।" ওই মূর্ত্তিমতি সেবাসুন্দর হৃদয়ের মাধুর্য্যমণ্ডিত স্বর্গীয় অঙ্গুলি-স্পর্শের জন্য, ললাটে একপ্রকার শিহরণ অনুভব করিলাম এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর স্নেহপূর্ণ করুণ মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ স্বর্গবিভা দর্শন করিয়া শৈশবে মায়ের যত্ন-পবিত্র হস্ত দু'খানি স্মরণ হইল এবং নারীজাতির প্রতি হিন্দুর ঘোর অবিচারের কথা স্মরণ করিয়া আমার সন্ন্যাসের সঙ্কল্প গ্রন্থিমুক্ত মুক্তারাশির ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। পদে পদে নারীকে ঘৃণা করিয়া, প্রতিদিবস আপনার পাশবিক ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতার জন্য নারীকে অপরাধিনী করিয়া আমরা যে কাপুরুষতার চরম পরিচয় দিয়াছি, তাহারই ফলে, আমাদের নারী সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের সহায়লাভের সুযোগ পায় নাই এবং এই জন্যেই আমরা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর মত অচল অকর্ম্মণ্য হইয়া চক্ষুজল, হাহুতাশ সার করিয়াছি। শক্তির মহিমা হৃদয়ে অনুভব করি না বলিয়াই আমাদের কার্য্য নিষ্ফল হয় এবং আমাদের জীবন শিথিল-শিকড় বৃক্ষের ন্যায় পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

এইপ্রকার অন্তরে বাহিরের বিরোধ-জীর্ণ হৃদয় লইয়া পরেশনাথের দিকে যাত্রা করিলাম। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থের মাঝে মাঝে শ্যামশিখর দেবদারু নাগেশ্বরের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল সরকারী রাস্তা ধরিয়া জল ঝড় বহিয়া পবিত্রতীর্থ পরেশনাথে উপনীত হইলাম। এখানে আসিয়া শিলাসজ্জিত মনোরম একটী নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়া আমাদের কঠোর সাধনায় মনঃসংযোগ করিলাম। দিবসে একবার

মহাদেবের প্রসাদ পাইতাম তাহাদ্বারাই রাত্রির ক্ষুধাও নিবৃত্ত করিয়া ভস্মাবৃত দেহে ধূলির সম্মুখে বসিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব অপেক্ষায় ঊর্দ্ধচক্ষু হইয়া রহিলাম। কিন্তু সংসার বিরাগী অন্তরের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে প্রতিক্ষণেই আত্মীয় পরিজনকে ওতপ্রোতঃ-ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার সকল সংযম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। অল্প আহারে এবং কঠোর কৃচ্ছ্রতায় আমাদের উভয়েরই চক্ষু বসিয়া মুখাকৃতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল, এবং মাসখানেক যাইতে না যাইতে আমার ঘুসঘুসে জ্বর আরম্ভ হইল। ঐ সময় কেবল মনে হইত, যদি বাড়ীর মাছের ঝোলভাত পাইতাম, তবে, যে একটা আনন্দ হইত তাহা বোধ হয় ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেয়েও মধুর। এইভাবে আমার মন ক্রমশঃ ঈশ্বরলাভের আশা হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইতে লাগিল। ফেলুদার মুখেও এই প্রকার বেদনা গালের রেখায় রেখায় প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে অবিরাম জপতপ দিয়া তাহাকে বিদূরিত করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে যখন মন একান্ত দুর্ব্বল হইয়া মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, তখন আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম, "হে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, তুমি যদি চিরকাল পর্ব্বতগুহাতেই থাক, গহন বনান্তরালে জনপদসমূহে যেখানে কোটি কোটি নরনারী অহোরাত্র তোমাকে ডাকিতেছে, সুখে দুঃখে তোমার পরম করুণার কথা কীর্ত্তন করিতেছে, যেখানে তোমাকে দর্শন করিবার মত অহঙ্কারের সাহস পর্য্যন্ত বিরল, সেখানে তাহারা, যদি তোমার কৃপাকণা হইতে বঞ্চিত হইয়া তোমাহীন হইয়াই কালাতিপাত করিতে থাকে

তবে, তোমার ন্যায় পক্ষপাতী ভগবানের আশা আজ হইতে আমি ত্যাগ করিলাম, এ জীবনে আর ভগবানের নামোচ্চারণ করিব না ; তোমার স্নেহবঞ্চিত সাধারণ নরনারী যেখানে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, পরিবারবর্গের প্রতিপালনার্থে নিঃস্বার্থভাবে হলচালনা করিতেছে, পিতার জন্য পুত্র স্বার্থ বলি দিতেছে, সন্তানের জন্য পিতামাতা সর্ব্বত্যাগী হইতেছে, স্বামীর জন্য সাধ্বী পতিব্রতা আত্মদান করিতেছে, আমিও সেই, তোমার ন্যায় ঈশ্বর-বিহীন স্থানেই দিনের পর দিন অতিবাহিত করিব। আমি তোমার আশা এই পর্ব্বত শিখরে এই মুহূর্ত্তে জলাঞ্জলি দিয়া চলিলাম।”

এইভাবে আত্মনিবেদন করিয়া আমি ফেলুদার অজ্ঞাতে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। কয়েক দিন পূর্ব্বেকার তত্ত্ব-কথা আমার মনে তোলাপাড়া করিয়া উঠিল। আমি বলিয়াছিলাম, “পায়ের কাছে যে আকাশ আছে মাথার উপরেও সেই আকাশ রয়েছে।”

ফেলুদা বলিয়াছিল, “মাথার উপরে যে আকাশ আছে তাতে যেমন বিচিত্র রং প্রতিফলিত হয়, পায়ের কাছে তা হয় না। একারণেই শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মের তত্ত্ব, গুহাতে আছে বলে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।”

আমি উত্তর দিয়াছিলাম, “শত রং থাকা সত্ত্বেও কাছের আকাশের মতই উহা স্পর্শের অতীত। ভগবান ও আমাদের স্পর্শের অতীত, অনুভবের বাইরে। কাছের মতই শুধু দেখাই আমাদের সম্বল। সুতরাং ঘরে থেকে সাধনা করাও যা, বনে পর্ব্বতে গিয়েও সেই একই ফল।”

আমার মনের এই সান্ত্বনাটা বোধ হয় ফেলুদার মনঃপূত হয় নাই তাই সেও আমাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিয়া নীরব হইয়া গিয়াছিল।

যাহোক আমি পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে আসিয়া হতভম্ব চিত্তে ভাবিলাম, যে পথ হাঁটিয়া একবার পার হইয়াছি তাহা পুনরায় পায়ের জোরে পাড়ি দেওয়া সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। কিন্তু গেরুয়া-বাস গ্রহণের সময় কাঞ্চন বর্জ্জন করিয়া একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিলাম। সমস্তক্ষণ ষ্টেশনে নিঝুম ভাবে পড়িয়া থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, ধরা পড়িলে হয় তো সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু কোম্পানীর সহৃদয়তা থাক্ আর নাই থাক্ তাহার গার্ড-জাতীয় সাইলক্‌দের যে, কোন মায়া মমতার লেশ মাত্র নাই তাহা হাজারীবাগ জংসনে আসিয়াই বিলক্ষণ টের পাইলাম। কোথায় আমার বাড়ী যাওয়া, কোথায় মাতৃপদতীর্থে পুণ্যাভিষেক, সমস্ত ওজর আপত্তি জেরায় জেরায় নিস্ফল করিয়া দিয়া আমাকে ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরে লইয়া যাইতে তাহাদের এক মিনিটও ব্যতীত হইল না। কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি অক্লেশে তাহাদের হাসি-বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটী প্রৌঢ় হ্যাট-কোট পরা বাঙ্গালী আসিয়া আমার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আমাকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন! সদ্য বিপন্মুক্ত মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা, চিরকালের জন্য গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে আমাকে গোড়া নীতিবিদ্ করিয়া তুলিয়াছিল। ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিতেই, তাঁহার পত্নী আসিয়া

আমাকে হাত ধরিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, "বাছা এ বয়সে সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছ—তোমার কি মা নাই ?"

আমি নীরবে নতমস্তকে বসিয়া বলিলাম, "মা আছেন। আমি বাড়ী যাচ্ছি। সঙ্গে পয়সা কড়ি কিছুই নাই।"

"তা তো বুঝ্‌তেই পারছি। লক্ষীটি বাড়ী যাও, তোমার বাকী ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। তোমার নাম কি বাবা ?"

"মানবেন্দ্র দেবশর্ম্মা," বলিয়াই প্রৌঢ়ার দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত বিষণ্ন মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাষ্পাবৃত চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমাদের বাড়ী কলকাতায়, উনি এতদিন সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন, এখন পেন্সন নিয়েছেন তাই আমরা বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। তুমি সময় পেলে আমাদের বাড়ী যেও," এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্বামীর নামাঙ্কিত একটী ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে দিয়া চক্ষু মুছিবার জন্যে আঁচল তুলিয়া লইলেন।

আমি কার্ডখানি বৈদ্যুতিক আলোকে পাঠ করিয়া দেখিলাম ভদ্রলোকের নাম ডাক্তার শ্রীঅমলেন্দু সিংহ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই রমণী আমাকে কিসের জন্য এত আন্তরিকতা দেখাইলেন। সংসারে স্নেহের স্রোতে বুঝি জাত্যাভিমান উচ্চনীচ ভেদ অনায়াসেই ভাসিয়া যায়! আমি অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "আপনাকে আমি মাসিমা বলেই ডাক্‌ব। জীবনে যেখানেই থাকি, আপনার স্নেহের দুয়ারে অত্যাচার কর্‌তে যাব নিশ্চয়ই।"

আমার আত্মীয়তাপ্রকাশে মাসিমার স্ফীতাশ্রু-চক্ষুর্দ্বয় বুকের

দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, "মানবেন্দ্র, পুত্রহীনার ব্যথা বুঝি ভগবানও দূর করতে পারেন না। আমার বিমল যে আজ তোরই মত বড় হ'ত গোপাল, আমায় ভুলিস্‌নে, যত শীঘ্র পার আমার কাছে যেও! কলেজে পড়্‌তে হলে আমার কাছে থেকেই পড়্‌বে।"

বলিয়াই মাসিমা আমাকে তুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিয়া আমার বুকের বেদনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ এমনিভাবে বসিয়া থাকিবার পর তাঁহাদের গাড়ী আসিয়া পড়াতে আমার টিকিট কাটিয়া দিয়া তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। আমি অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চলন্ত লৌহ-সরীসৃপের মধ্যে ধারাসমাচ্ছন্ন মাসিমার চক্ষুতুটী স্মরণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী ফিরিয়াও ওই তুঃখের গৌরবে নির্ব্বিকার মাসিমার সকরুণ মুখখানি আমার বুকের একটী সুউজ্জ্বল প্রদেশ অধিকার করিয়া রহিল।

৯

বাড়ী আসিবামাত্র গ্রামের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়িলে যেমন তাহারা আকুল প্রাণে ছুটাছুটি করিতে থাকে, গ্রামের কৌতুহলী মানুষ নরনারী অভেদে আমার কিম্ভূত-কিমাকার বেশ দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। মা আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মুহুর্মুহু অশ্রুপাতে ভিজাইতে লাগিলেন, বড় বৌদি আমার আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল দুই হাতে মুছিয়া ফেলিলেন, মেজদার চক্ষু ছলছল করিতেছিল, বড়দার যে গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে প্রেরণা দিত তাহার নিবিড়তাও যে এমনভাবে গলিয়া যাইতে পারে তাহা দেখিয়া আমার মুখখানা শ্বেত মর্ম্মর-মূর্ত্তি মায়ের বক্ষ-মধ্যে গোপন রাখিয়া প্রতিবেশীর ভৎ´সনার চাবুক হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। কয়েক দিনের মধ্যে এই কাঁদুনির পালা হজম করিয়া আমি বাড়ীর বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। পুনর্ব্বার যথাপূর্ব্ব স্নানাহার করি স্কুলে যাই কিন্তু ইহার মধ্যেও ফেলুদার কথা মনে হইয়া ঈর্ষা হইতে লাগিল।

ফেলুদা হয়তো অক্লান্ত সাধন-বলে ভগবানকে সম্মুখে পাইয়া ইচ্ছামত বর আদায় করিয়াছে, ষড়ৈশ্বর্য্য লাভের গোপন পথটী আবিষ্কার করিয়াছে, আর বোধ হয় এই গ্রামে ফিরিয়া আসিবে না, এই চিন্তাটা আমাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল। আমিও যে

ফেলুদার এই সিদ্ধির একমাত্র অংশভাগী হইতে পারিতাম কিন্তু আমার তুচ্ছ মায়ার আকর্ষণেই সংসারের পরম আকাঙ্ক্ষাচ্যুত হইলাম এ সমস্ত বিষয় ভাবিয়া আমার মন সংসারের মধ্যে পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় না এদিক না ওদিক হইয়া টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। ফেলুদার বিচ্ছেদে আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের কারণগুলি আর আমাকে উৎসাহিত করিল না।

কিন্তু ভগবান আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। একদিন শারদীয় জ্যোৎস্নার মধ্যে আমার অন্তরের দাপাদাপি স্তব্ধ করিয়া, সকলের নিরুৎসাহী মনে বিস্ময় তুলিয়া, মেজদার কুট বিদ্রূপের প্রতিচ্ছবি হইয়া ও আমাকে অগাধ বিষাদ-সিন্ধু হইতে পরিত্রাণ দিয়া ফেলুদা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ফেলুদা তাহার এই পরাজয়ের জন্য, যদিও কিঞ্চিৎ লজ্জানুভব করিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রতি গ্রামের প্রায় সকলেরই পূর্ব্বসঞ্চিত স্নেহ-বশতঃ তাহাদের হারানিধি প্রাপ্তির আনন্দ তাহাকে মুহ্যমান হইবার অবসর দিল না। আমি তাহার ঘরে যাইতেই সে বলিল, "মনু এমনভাবে কি চলে আস্‌তে হয়? তোর জন্যে আমার মন কেমন করছিল, এইভাবে কি মন একাগ্র হয়!"

আমি তাহার একমাত্র বিঘ্ন মনে করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, "বাড়ীর জন্য মন অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিল, তোমাকে বল্‌লে হয়তো আস্‌তে দিতে না।"

"তা ঠিক বটে, তুই কাছে থাক্‌লে আমার মনে জোর পাই। যাক্‌গে আবার চেষ্টা করা যাবে। কি বলিস্‌?" বলিয়াই ফেলুদা গেরুয়া কাপড় ছাড়িয়া শাদা ধুতি পরিধান করিল।

আমি ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। ফেলুদার সিদ্ধির জন্যে আমি যে একমাত্র ধূমকেতু, এই কথাটার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন হৃদয়বত্তা লুক্কায়িত ছিল তাহা যেন আমাকে ভূতাবিষ্ট করিয়া তুলিল। ফেলুদার বন্ধুত্ব যে কত গভীর এবং কত অকৃত্রিম তাহা ভাবিয়া সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের কমলসদৃশ তাহার সুপ্রসন্ন মুখখানি আমার মনের মধ্যে মহামহিম সৌন্দর্য্য বিছাইয়া দিল।

ফেলুদা ফিরিল কিন্তু আমার আগেকার ফেলুদা যে পরেশনাথ পাহাড়েই রহিয়া গিয়াছে তাহা সহজেই অনুভব করিলাম। আজকাল সে নিঃসঙ্গভাবে চিন্তাবিষ্ট নয়নে নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবে, তাহার গতিবিধি এমনই সংযত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি তাহার এই হৃদয়বিদারী গাম্ভীর্য্যের প্রস্তর-প্রাচীরে প্রবেশ লাভের জন্য মাথা কুটিয়াও ব্যর্থকাম হইলাম। এইভাবে তাহার প্রতি দুর্জ্জয় অভিমানে আমার হৃদয় প্রদেশে মরুভূমির ঊষর প্রান্তরের মত ধূধূ করিতে লাগিল। একদিকে আমার এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থা অপরপক্ষে বাড়ীর মধ্যে মেজদার শুভ বিবাহের আয়োজন সার্থক হইতে লাগিল! কিন্তু মেজদার সলজ্জ আনন্দ-লিপ্ত আস্যে আমার শোকতাপ বিন্দুমাত্রও লাঘব হইল না।

সেদিন আশ্বিনের সন্ধ্যাটা পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে রজতমায়ায় অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ফেলুদার সাক্ষাৎলাভের আশায় করুণাদিদির বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলাম। জনহীন নিস্তব্ধ বাড়ীটার কোন ঘরেই আলো নাই। আমি আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে গিয়া ক্ষীণ আলোক বর্ত্তিকার সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া ডাকিলাম, "দিদি ?"

তিনি বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “এসো মনু ভাই, পথ ভুলে এসেছ নাকি?”

আমি বারান্দায় উঠিয়া বলিলাম, “ফেলুদাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলাম। কোথাও দেখা না পেয়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আপনার কাছেই এসেছি। ফেলুদা যে ফিরে অবধি কেমন হয়ে গেছে!”

তিনি একখানা পিঁড়ি পাতিয়া কহিলেন, “বসো, ফণীবাবুতো সন্ধ্যার আগে এসেই ফিরে গেছেন। আজকাল ওঁর একটু পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি, বটে তা শুধু আমাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে বৈ তো নয়! তুমি তো জানই মনু, সেই যেদিন তোমাদের সুমুখে আমার দুঃখের কথা বলেছিলুম, তারপর তোমাকে আর দেখ্‌তে পাই নাই। কিন্তু ওঁর মহৎ প্রাণে বুঝি আমার জন্যে একটু দয়া হয়েছিল তাই আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। তার আগেই আমাদের বাড়ীর সকলেই কলেড়ার ভয়ে এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র পালিয়েছিলেন।

আমি শুধু ফণীবাবুর মুখ চেয়েই এখানে পড়ে রইলুম। আমাকে কত আশা দিলেন, কত সান্ত্বনা দেখালেন, মেয়ে মানুষের প্রাণ ভাল মন্দের কি জানি,—কেমন একটা মায়া হ'লো; তাই তাঁকে বলেছিলুম যদি ভালবেসেই থাকেন তবে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে চলুন না কেন? কি জানি মনু, মানুষকে এত সহজেই বিশ্বাস করা যায় না। সেই থেকে ওঁর মন বিগ্‌ড়াল, উনি তোমাকে নিয়ে সন্ন্যাসী হতে গেলেন কিন্তু ফিরে এসে আবার কান্নাকাটি সাধাসাধি। এসবের তো কোনই প্রয়োজন ছিল না। এখন আমি কি করি বলতো লক্ষ্মী ভাইটী আমার।”

আমার কাণের মধ্যে রাশিরাশি অগ্নিবৃষ্টি করিয়া তিনি চুপ করিলেন। আমি তাহার দাহনে ভস্মীভূত হইবার অপেক্ষায় পিঁড়ির সঙ্গে আঁটিয়া যাইতে লাগিলাম। একটা কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে সুখ দুঃখভরা এক নূতন চিত্রজগৎ আমার চক্ষের সম্মুখে কল্পনার বৈচিত্র্য লইয়া আবির্ভূত হইল। ফেলুদার সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যে যে গোপন ইতিহাসটী লুক্কায়িত ছিল তাহার এইপ্রকার নিষ্ঠুর মর্ম্মঘাতী প্রকাশের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। একবার মনে হইল এই ক্লেদপূর্ণ নরকাগ্নির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া পলায়ন করি কিন্তু কৌতুহলী মন ফেলুদার সকল ইতিবৃত্ত আহরণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পায়ের সহিত পিঁড়ির স্ক্রু-আঁটা প্যাঁচ অনুভব করিয়া বসিয়া রহিলাম। দিদি পুনশ্চ বলিলেন, "আমার এই জীবনের মধ্যে যদি কোন শান্তির আশা থাকে তবে তাহা ফণীবাবুর মধ্যেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি যে এই প্রাণটা তাঁহার হাতে তুলে দিলে কত বড় মুক্তি পাই তা আমার বোঝাবার শক্তির বাহিরে। কিন্তু আজকাল তাঁর দুর্ব্বলতা আমাকে আদর্শচ্যুত কর্‌তে বসেছে। আমার মনের সম্ভ্রম ইজ্জৎ সমস্ত তাহার পায়ে নির্ব্বিচারে লুটিয়ে দেবার কালে যে কোনই সংশয় জাগে নাই একথাটা জোর করে তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছা হয়! মনু তোমার সঙ্গে 'দেখা হলে তাঁকে বলে দিও, মেয়েমানুষ যাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে তাকে ইহজীবনের সংঘর্ষে ত্যাগ কর্‌তে পারে না। আমি হতভাগিনী বলেই আজ তিনি আমায় উপেক্ষা কর্‌ছেন কিন্তু যদি আমার ভালবাসা সত্য হয় তবে আমার অশ্রুজল ব্যর্থ হবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার ছল ছল চক্ষু হইতে মুক্তাধারা বহিয়া যাইতে লাগিল। আমি স্তম্ভিত চিন্তায় নিস্পন্দ অচেতন দেহের মধ্যে কোন সাড়া না পাইয়া স্থির অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে মোহাবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিলাম। পুনরায় তিনি আমাকে এই বিহ্বলতার হাত হইতে মুক্তি দিয়া কহিলেন, "তুমি বোধ হয় আমার এই অবৈধ দাবীর প্রতি আগুন হয়ে উঠ্‌ছ কিন্তু, দুর্ব্বলতা যদি এক পক্ষের বলে 'রায়' দিতে চাও তবে কিন্তু তোমার দিদি সন্তুষ্ট হবে না।"

আমি নড়িয়া চড়িয়া দেহের জড়তা অপনোদন করিয়া কহিলাম, "অপরের হলেও বা বিশ্বাস হ'ত কিন্তু ফেলুদার উপর আমি এ অপরাধ চাপাতে পারি না।"

করুণাদিদির উত্তেজিত মুখখানি আমার বাক্যবানে বিকৃত হইয়া উঠিল, তিনি যথাসম্ভব একটা ঢেউ চাপিয়া কহিলেন, "আমাদের দেশের পুরুষের মনে যে বিদ্বেষ চিরকাল নারীর প্রতি বর্ষিত হয় তার ব্যতিক্রম তোমাতেও হবে না তা বুঝ্‌ছি কিন্তু, তোমাকে আমার ভাই বলেই মনে করি। তোমার দিদির কথাটা একবার বিশ্বাস কর। দিদিকে অপরাধিণী কর্‌বার আগে শুধু এই কথাটা শুনে রাখ যে, আমাদের পতনের জন্য পুরুষরাই দায়ী। আর এখানে তো দোষের কিছুই নাই, ফণীবাবু যে মহান, তারই একটা পরিচয় মাত্র।"

আমার বিতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "এই মহত্ত্বের সবখানেই পাপ। বিধবাকে ভালবেসে ফেলুদার মহত্ত্ব চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হয়েছে।"

করুণাদিদি মুখে একটা কটাক্ষের ছায়া ফেলিয়া কহিলেন,

"এখানে কোন পাপ নাই। ভালবাসতে পারা ও পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য তা আমার জীবনের দুঃখের মধ্যে বেশ বুঝতে পেরেছি। তুমিই বলতো আমার কোনখানেও কি পুণ্যের আভাস দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দিবারাত্রি নির্য্যাতন নিগ্রহ যাকে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার পক্ষে একটা আশ্রয় পাওয়া বহু পুণ্যের ফল, আর যিনি এই আশ্রয় দেবার মত উদারতা দেখাতে পারেন তার প্রাণটা যে, নীতির মাপকাঠিতে ওজন করা চলে না একথা অতি সত্য। যা হো'ক, তুমি যদি ভাল মনে কর তবে তোমার ফেলুদাকে একটিবার কাল্‌কে আসতে বো'লো। আর যদিই আমাদের যাওয়া হয় তবে একবার এসে তোমার দিদির এই যাত্রাটার জন্য আশীর্ব্বাদ করে যেও। ব'স একটু জল খেয়ে যাও।"

আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, "এখানে খাওয়াটা আমি অপমান বলেই মনে করি। আর ফেলুদার কাছে আমি এসব বিষয় কোন কথা বল্‌তে পারব না তাও বলে যাচ্ছি, কারণ, সে কোন দিনই আমাকে এসব কথা বলে নাই। আর, আমার অশীর্ব্বাদে আপনার কোন উপকার হবে না, তাও গোপন করে কোন লাভ নাই।"

বলিতে বলিতে আমি ঘরের বাহির হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে বাতি লইয়া বাহির বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া বলিলেন, "এ ক্রোধটা স্ত্রীলোকের কাছে প্রকাশ করাতে কোন পৌরুষ নেই মনু। এমন দিন আস্‌তে পারে যখন তোমারও এই তেজ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, তখন এই

স্ত্রীলোকের পায়ের তলায় আত্মবিসর্জ্জন দেবার পথ পাবে না,” বলিতে বলিতে আমার শরীরে ঘৃণার কালিমা ছড়াইয়া দিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া ও মুখের মধ্যে করুণার বন্যা বহাইয়া বলিলেন, “পাগল, আজ পর্য্যন্ত ভালবাসা পাওনি বলেই এমন রুক্ষ স্বভাব!” সর্ব্বাঙ্গে সহস্র বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিয়া আমি তাঁহার আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিলাম। পাপের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সেই রমণী, আমার সমস্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মাথা মুড়াইয়া, সম্মুখে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। পথে আসিতে আসিতে তাঁহার ব্যথা-বেদনায়-ভরা মুখখানিতে নরকের অন্ধকার দেখিয়া ঘৃণায় আতঙ্কে আমার শরীর রি রি করিয়া উঠিল। ফেলুদার নরকের রাজত্ব আমার বিস্মিত চক্ষুর সম্মুখে এমন বিষাক্ত আলোকে প্রতিভাত হইল যে, আমি তাহার প্রহরায় নিযুক্ত, পাপ ও শয়তানের বিভৎস-বিকৃত হাসি-পঙ্কলিপ্ত নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া ভীতপ্রাণে ছুটিতে লাগিলাম। ফেলুদার মহত্ত্বের বিশ্বাস প্রচার করিবার কালে ফেলুদার শান্ত সুন্দর যে আকৃতি আমার মনে বিরাজ করিতেছিল, তাহাকে এই পূতি-গন্ধময় নরকের মধ্যে চিরনিমজ্জিত দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিল—‘সংসারে কি বিশ্বাসের কোনই অবসর নাই?’ করুণাদিদির কলেরার সময় যে সমস্ত বৃক্ষ-তরু ভূতের মত সজীব হইয়া আমার মনে ভীতি সঞ্চার করিয়াছিল তাহারা যেন, আমার মনের স্তম্ভিত দাবানলে দগ্ধ হইয়া অন্তঃসার বিহীন জড়তা লইয়া চুপ করিয়া আছে। বাড়ী আসিয়া বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু একটা কথা আমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, তিনি আজ ফেলুদার কাছে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া আমার কাছে ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছেন সত্য কিন্তু, কনকের মায়ের মত তিনি যদি মুসলমানের আশ্রয়ে চলিয়া যান তখন কি আমি তাঁহার জন্য একবিন্দু অশ্রুজল ফেলিব? তখন কি তাঁহাকে দোষী করার মত সাহস হইবে? তখন আমরা তাঁহাকে সংসারের সধবা এয়োস্ত্রীগণের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইব? তাঁহার ভবিষ্যৎ সন্তানের প্রতি কোন অবহেলা পোষণ করিব না? তবে কেন তাঁহার এই সম্মানকর সৎসাহসের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছি! এমনি করিয়া বিধবারা যে আমাদের সমাজের কত সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিতেছে এবং একারণেই যে সমাজের সবল দেহ শীর্ণ হইয়া যায়, এই হিসাবটা তো আমরা তলাইয়া দেখি না। তিনি যে মুসলমানের হাতে না পড়িয়া ফেলুদার মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আর, ফেলুদাও যে এই উদারতাটুকুর জন্যেই তাঁহার সূচিভেদ্য সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে ইহা যে, বিরাট মহত্ত্বের পরিচায়ক, তাহা ভাবিয়া যুগপৎ তাঁহার ও ফেলুদার প্রতি আমার ভক্তিবিনত মন, অনুপম গৌরবে প্রণতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। এই ভাবে ফেলুদার সহিত তাঁহার গৃহত্যাগ, তাঁহাদের নির্জ্জন গৃহবাস, সমাজ-চক্ষুর অন্তরালে এই দুই মহৎ প্রাণের হৃদয়-বিনিময়, তাঁহাদের অনাগত অভিব্যক্তির সুকুমার সৌন্দর্য্য প্রভৃতির ভবিষ্যৎ, আমার হৃদয়কে উৎসাহে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে আমার কাঁধে হাত দিবার সময় করুণাদিদির যে আক্রোশ

উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে অঙ্কুশাঘাতে বিদ্ধ করিয়াছিল ও তাহার মধ্যে যে প্রধূমিত কামনার কালানল বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই অস্পষ্ট ধারণাতীত তাৎপর্য্যটি যেন, গৃহের অন্ধকার কোণ হইতে উঠিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আমি ইহার কঠিন আবেষ্টন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আলো জ্বালাইয়া পড়িয়া রহিলাম।



১০

অনেক চিন্তার পরও আমার স্নেহান্ধ মন, কথাটা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। শুধু তাঁহার অভিব্যঞ্জনার উপর ফেলুদাকে অবিশ্বাস করিবার মত স্পর্দ্ধা, আমার অন্তরে তন্ন তন্ন করিয়াও খুঁজিয়া পাইলাম না। একপক্ষের নালিশ ও সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর, অপর পক্ষের বিচার করা যে নিতান্ত মুর্খসঙ্গত তাহা ভাবিয়া, আমি, ফেলুদার সঙ্গে বোঝাপাড়া করিবার সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু এমনি-ভাবে আশা নিরাশার মধ্য দিয়া মাসখানেক গত হইলেও যখন ফেলুদাকে এই প্রসঙ্গটা বলিবার সুযোগ পাইলাম না, সাক্ষাৎ হইলেও ফেলুদার আতঙ্কিত মুখখানি লইয়া যখন সে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন, আমি বজ্রাহত পথিকের ন্যায় কোন চেতনা জাগ্রত নাই বুঝিয়া গুমরিয়া মরিতে লাগিলাম।

মানবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পক্ষে মানুষের জ্ঞান যে কত অসম্পূর্ণ অথচ, এই ভঙ্গুর ইমারতের মধ্যে বাস করিয়াই আমরা স্বপ্ন-জগতের সকল বিলাস উপভোগ করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকি, তাহাই আমার, এই বন্ধুত্বের রন্ধ্রময় ভিত্তির অকস্মাৎ পতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ় বিশ্বাসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। আমরা যে ভূমিতে পদতল ন্যস্ত করিয়া দর্পদম্ভে জগতের সমক্ষে আস্ফালন করি, তাহার নীচে যে চোরাবালি ধ্বসিয়া গিয়া আমাদিগকে সগর-সন্তানের নির্ব্বাসন-ভূমিতে নিপাতিত করিয়া প্রতি পলেই আমাদের জ্ঞানের অহংকারটিকে অনন্তপথে ধাবিত করে, এই অভিজ্ঞানটা আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই, জাগতিক সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদের তরঙ্গে, ঝঞ্ঝাবিত্রস্ত তরণীর মত দুলিতে থাকি। আমার এই বন্ধুত্বের প্রদেশেও আমি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়োজন করিতেছিলাম তাহার সকল অনুষ্ঠান ব্যর্থ করিয়া দিতেই বোধ হয় ফেলুদা আমার নিকট হইতে দুর্গম প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বাল্যাবধি তাহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া তাহার সুখে সুখানুভব করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া তাহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এমন কি তাহার সামান্য উপকারের জন্য আমার ক্ষুদ্রতম স্বার্থলিপ্সা বিসর্জ্জন দিতেও যে, আমি কোনকালে কুণ্ঠিত হই নাই, এই কথাটা বলিয়া, তাহার অকৃতজ্ঞতার জন্য তাহাকে ভৎ'সনা করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমার সৎকর্ম্মের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যখন তাহাকে আক্রমণ করিব ভাবিতেছি তখনই, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সসাগরা ধরিত্রীদানের পরও স্বমুখে

পুণ্যকৃত্য বর্ণনের ফলে স্বর্গচ্যুতির মত, আমার এই গৌরবের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত হইবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল।

পরেশনাথ হইতে প্রত্যাগমনের পরেই একটা জিম্ন্যাসটিকের আখড়া খুলিয়া আমি দেহের সংস্করণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলাম। আমার উপর দিয়া যত প্রকার বাধা বিপত্তিই নিষ্ঠুরভাবে বহিয়া যাক্, আমি দেহচর্চ্চা হইতে একদিনও প্রতিনিবৃত্ত হই নাই। সেদিনও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আখড়ায় গিয়া ডন-বৈঠক দিয়া শরীরে ঘাম বাহির করিয়া ফেলিয়াছি এমন সময়, গণদেব চক্রবর্ত্তীর ছেলে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া গেল। আমি যথারীতি স্নানের পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দর্শন-সৌভাগ্যের আশায় তাহার বাড়ী গেলাম। তিনি আমাকে তাঁহার শয়ন ঘরে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "মানবেন্দ্র, আজ কাল তুমি ছেলে মানুষ নও। আমার সঙ্গে শত্রুতা করা আর বাঘের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এক! একথা তুমি বেশ জান। তবুও তুমি আমার বিরুদ্ধে লে'গে কনকের মাকে কোথায় সরিয়েছ এবং কোন সাহসে তাই জান্‌তে চাই?"

গণদেবের ভনিতা আমাকে আকাশ হইতে ফেলিয়া দিল। আমি তো আজ প্রায় দুই মাস যাবৎ কনকদের বাড়ী যাই নাই কিন্তু ইহার মধ্যে যে তাঁহারা গণদেবের হৃদয়-খাঁচা শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এত কথা আমি জানিতাম না। আমি তাঁহার কথায় বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, "তোমারই এই কাজ। না হলে ওদের এত সাহস হ'ত না যে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। তুমি সহজে আমার

হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না বলে দিচ্ছি। কোথায় রেখেছ তা সঠিক্ বল।"

আমি এত বড় মিথ্যাবাদীর কথার উত্তরে কি বলিব তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলাম, "আমি কিছু জানি না।"

গণদেবের দুই চক্ষু মধ্যাহ্ন সূর্য্যের বালুকণার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত দেহে দাঁড়াইয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "কিছু জাননা! ন্যাকা আর কি? তুমি তো রোজই তাদের বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্তে। পেটে পেটে শয়তানি রেখে বাইরে সাধু সেজে ভণ্ডামী কর্বার আর জায়গা পাওনা? আমার নাম গণদেব, যার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, দুনিয়ার সব খপর আমার কাণে আসে! দুর্গাপুরের গগনের বাড়ীর বিধবা বৌটাকে বে'র করে নেবার চেষ্টায় আছ তাও এই শর্ম্মার কানে এসেছে। এখনও বল কোথায় রেখেছ?" বলিতে বলিতে গণদেব কণ্ঠস্বরের উগ্রতা মন্দ করিয়া কহিলেন, তোমার মেজদার বিয়ের সময় যদি কোন গণ্ডগোল না চাও তবে আমার কাছে সব কথা খুলে বল!"

ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত গণদেব গৃহ মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। কনকের মায়ের জন্য আমি সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। যাহা জানিনা সে সম্বন্ধে সাফাই গাহিবার তেজ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু, করুণাদিদির বিষয়টাও যে এই মক্ষিকা-চরিত্র গণদেবের নিকট অগোচর নাই এবং ইহাতে যদিও ফেলুদাই দায়ী, কিন্তু, তাহার অন্তরঙ্গস্বরূপ আমার উপরেও যে, এই আক্রমণ, উদ্যত তরবারির ন্যায় ঝুলিয়া রহিয়াছে

তাহা ভাবিয়া আমার মন দমিয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার কোনই লাভ নাই। আমি যদি জান্‌তাম কনকরা কোথায়, তবে আপনাকে নিশ্চয়ই তা বল্‌তাম। আমার কোন স্বার্থ নেই যে আমি সত্যের অবিচার কর্‌ব।"

কিন্তু আমার সরলতা যেন, তাঁহার সন্দেহ-আঁধার ঘনিভূত করিয়া তুলিল। তিনি বিকৃত অধরে দন্তপাটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে কচি খোকাটি পেয়েছ কি না? এই করে করে আমার চুল পেকে গেল আর তুমি অর্ব্বাচীন বালক আমার চোখে ধূলো দেবে! মোহিনীর সঙ্গে যদি তোমার কোন স্বার্থ না থাকে তবে তাদের বাড়ীতে রাত দিন পড়ে থাকৃতে কেন? ভায়া একটু রয়ে সয়ে খেতে হয়!" কথা-গুলি তাঁহার মুখ হইতে উদ্বমনের মত বাহির হইয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে দুর্গন্ধ বাষ্প ছড়াইয়া দিল। আমি নাভিমূল হইতে উত্থিত ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হস্তের মাংসপেশীর স্ফীতির মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হইতেছে বুঝিলাম এবং থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ইচ্ছা হইল মিথ্যাবাদী লম্পট কপটাচারী পশুর মিথ্যাকথার দুঃসাহস চিরতরে ঘুচাইয়া দেই। এক লাফে উঠিয়া বলিলাম, "বয়স বিবেচনা করে সব সহ্য করেছি কিন্তু এখনও সাবধান না হলে এখুনি সমুচিত শাস্তি দিয়ে যাব।"

বলিতে বলিতে আমার দৃঢ়মুষ্টি তুলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি আতঙ্কিত চক্ষে আমার দিকে

চাহিয়াই দরোজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পাপীর চিত্তে যে, ভয় সহজেই ক্রিয়া করে তাহা বুঝিতে আমার আর বাকী রহিল না। নৈতিক চরিত্রে হীন মানুষ তাহার দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য যতই আস্ফালন করুক, সৎসাহসের কাছে তাহার মাথা, প্রভুভক্ত কুকুরের মত নত হইয়া আসে। পাপিষ্ঠ গণদেবেরও অন্তরের স্থৈর্য্য, নদীতীরে শূন্যোদর শৈলসানুর মত থর থর কম্পান্বিত ছিল। তাই আমার রক্তচক্ষু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় বিবরমুখী করিয়া তুলিল। তিনি মাথা চুলকাইয়া দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চাকরের নিকট হইতে এক ছিলেম তামাক খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু পরদিবস গ্রামে আমার নামে ঢি ঢি পড়িয়া গেল। বর্ষা সমাগমে ভেককুল যেমন বিকট চীৎকারে তাহাদের জীবন-সঙ্গীত প্রচার করে, আমার নামে মিথ্যা রটনাবলীতে, বিকশিতদন্ত চণ্ডালাধম গণদেবের চেলা-চামুণ্ডারা, তেমনিভাবে নাচিয়া-কুঁদিয়া মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল। বিভিন্ন লোকের মুখে অসম্ভব আজগুবি কথা এমন বিচিত্র ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যেন, তাহারা প্রত্যেকেই স্বচক্ষে আমাকে কনকের মায়ের বাড়ীতে বিভিন্ন অবস্থায় দেখিয়াছে। সত্যের অনুরোধে ন্যায়ের অনুরোধে তাহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া বড়দার সম্মুখে নালিশ উত্থাপন করিয়া, মেজদার শুভ উদ্বাহকার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হইবার অবসর দিতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

এইভাবে সত্যই মেজদার বিবাহের দিনে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্রহ্ম-

জ্ঞানীর দল, লুচি মাংসের লোভে সমাগত হইয়াও তুমুল তর্কে বিতর্কে বৈঠকখানা ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলেন। আমি সকলকেই জানাইয়া দিলাম যে, আমি কোন পাপ করি নাই, সুতরাং আমি এই মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পার্‌ব না।"

দক্ষ প্রজাপতির বংশকুলতিলকগণ সকলেই মহাচিন্তিত মুখে বিধান দিলেন, "আমি শুধু কনকদের বাড়ীতে খাই নাই একথা বল্‌লেই, তাঁরা অনুগ্রহ করে আমায় পংক্তিতে গ্রহণ কর্‌তে পারেন।"

আমি তাহাতেও অসম্মতি প্রকাশ করাতে বড়দা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "মনু বিষয়টা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি কিন্তু, যাদের নিয়ে আমাকে এক সমাজে দিন রাত্তির থাক্‌তে হবে তাদের কথা আমাকে মান্‌তেই হবে।"

আমি বলিলাম, "আমি একটা মিথ্যা কথা বল্‌লেই 'যে' সমাজের কৌলিন্য বেঁচে যাবে আমি সেই সমাজকে মানি না।" বড়দার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল—তাহাতে দুর্ব্বলতা ও স্নেহের রশ্মি চক্‌চক্ করিতেছে। আমি বড়দার মুখের দিকে চাহিয়া মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে সভার মধ্যে গিয়া বলিলাম, "আমি কনকদের বাড়ী খাই নাই।"

সভামধ্যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই আমার গুণপণা কীর্ত্তণের মধ্যে উদর পূর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আমার মনে যে অনুশোচনা আমার অন্তর পুড়িয়া খাক্ করিতেছিল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই বুঝিলেন।

সত্য-বিচ্যুত, চানক্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতি

অভিশাপ বর্ষণকালে কনকের মায়ের যে দুই চক্ষু, হিংস্র-আগুন ছিটাইয়া আমাকে দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা যেন, আমার এই অপমানে খিল খিল করিয়া হাসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যে সমাজে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের গ্লানি রাজত্ব করিতেছে, তাহার প্রতি অংশ যে, জীর্ণ দেবালয়ের মত ধূলিসাৎ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? যেখানে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতার পূজা, বিচারের পরিবর্ত্তে সংস্কারের আধিপত্য, শিক্ষাহীন সেই সমাজে যে, মিথ্যার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কনকের মায়ের হাতে সুখাদ্য ভক্ষণ করিয়া 'যে' গণদেব আপনার উদর তৃপ্ত করিতে নিত্য অভ্যস্ত ছিল সেই গণদেবই একই কারণেই, আমার জাতিচ্যুতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধান দিবার মত স্পর্দ্ধা রাখিয়া সমাজের মস্তকে বসিয়া আস্ফালন করিতে পারে! সুতরাং এই সমাজের ধর্ম্মচর্চ্চার শিরায় শিরায় যে, পূতি-গন্ধময় স্বার্থ-লোভের পঙ্ক উত্থিত হইতেছে তাহার, ক্লেদাক্ত তরলতা দেখিয়া আমার আবাল্য সংস্কার ভাঙ্গিয়া গিল্‌টি করা সোণার স্বমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। এবং আমার রুদ্ধ আক্রোশ ফুলিয়া ফুলিয়া গণদেবের উপরে এই অভিনয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগিল। আমি আমার অপমান জাগ্রত রাখিয়া তাঁহার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় সুযোগ অন্বেষণ করিয়া চলিলাম। এই সময়ে যদি ফেলুদাকে আমার কাছে পাইতাম তবে ফেলুদার বংশদণ্ড যে, এই ইতরতার সমুচিত উত্তর প্রদান করিত, তাহা ভাবিয়া, ক্ষণিকের জন্য মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে খুঁজিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় আসিয়া পাইলাম। ফেলুদা সমস্ত বৃত্তান্ত

পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল। তবুও আমি পুনরায় বিবৃত করিয়া আমার মনটা ভারমুক্ত করিবার সুযোগ হারাইলাম না। আমি বলিলাম, "এত মিথ্যার উপর 'যে সমাজ' প্রতিষ্ঠিত তা'র কি প্রতীকারের কোন উপায় নাই ? আমার মনে হয় সমাজের—তথা-কথিত কর্ত্তাব্যক্তিদের এই ভ্রমটা, গায়ের জোরেই হো'ক্ আর তর্ক করেই হো'ক্ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।"

ফেলুদা আমার কথার পর কিছুক্ষণ হেমন্তের ম্লান আকাশের মেঘ-সঞ্চালন দেখিয়া বলিল, "গায়ের জোরে পৃথিবীর কোন মহৎ কাজই স্থায়ী হয় না। আর, এই পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাবাগীশের দল, যারা সংস্কৃত বইয়ের এক একটী অক্ষরকে এক একটী ধর্ম্মবাণী বলে স্বীকার করে,—তার এক পা নড়চড় হ'বার ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়, তাদের সঙ্গে তর্ক কর্‌তে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। অজ্ঞানীর সঙ্গে তর্ক কর্‌লে কি কোন মীমাংসা হয় ?"

"কয়েকজন অজ্ঞানীর প্রতাপে এই বিরাট সমাজটা অধঃপাতে যাবে আর আমরা কি তা'র কিছুই কর্‌তে পারব না ?" বলিয়া আমি ফেলুদার চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই মুখে নিরাশার চিহ্নমাত্র নাই, শুধু একটা দৃঢ় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা উছলিয়া পড়িতেছে। সে গম্ভীর স্বরে কহিল, "দ্বন্দ্ব করে সমাজের কোন উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে না। সত্য সসীম, মিথ্যা অনন্ত। এই মিথ্যার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে গেলে তার স্পর্শে তোমারও মন কলুষিত হবে। তা না করে যাহা ন্যায় বোঝ, তা'র জন্য সকল দুঃখ ক্লেশ অপমান অঙ্গের ভূষণ করে নাও। এই কঠোর সাধনা নিলে সংসারের সকল সুখভোগ বিসর্জ্জন দিতে হবে সত্য, কিন্তু, পরিণামে তুমিই জয়ী হবে।"

আমি ফেলুদার উপদেশে কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু, আমার নীরব সাধনাতে সমাজের উপকার বহুদিনের কাজ বুঝিয়া বলিলাম, "এই সমস্ত নেতার হাতে সমাজের দণ্ড-মুণ্ড ছেড়ে দিয়ে আমার কর্ত্তব্য নিয়ে আমি থাক্‌তে পারি, কিন্তু, যা'রা এই অত্যাচারগুলো না বুঝে মাথা পেতে গ্রহণ করে, তা'দের তো আশু প্রতীকার কিছুই হবে না !"

ফেলুদা দূরে দিক্‌চক্রবালের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "এই পতন একদিনে সম্ভব হয় নাই মানবেন্দ্র, বহুদিনের কুশিক্ষা, বহু কুসংস্কার, এদের মনের গায়ে বল্মীকস্তূপের মত ঘিরে ধরেছে। ঠিক এমনিভাবে বহুদিন ধরে নির্য্যাতন ভোগ করে তিন কাল পূর্ণ হ'লে তবে এদের মুক্তি। কোন মানুষ বিচার বুদ্ধি দিয়ে ইহার কোন পরিবর্ত্তন আন্‌তে পারবে না। যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর তাদের অন্ধ-নির্ভরতা, সেই 'ধর্ম্ম' যদি তাদের না বাঁচায় তবে কোন উপায় নেই। তাদের এই শত আচার বিচার সংস্কারের তলেও ধর্ম্ম ব'লে একটা ভাব আছে, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তা'রা এই ধর্ম্মের কোন মর্য্যাদা রাখ্‌ছেনা, তবুও, এই সত্য আপন মহিমায়, প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের মত এদের জীবনে প্রতিফলিত হ'বে।"

বলিয়াই ফেলুদা উঠিয়া পড়িল। আমি তাহার কথার মধ্যে বিরাট উদাসীনতা দেখিয়া তাহা প্রাণ দিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না, মনে মনে শুধু সমাজের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

১১

মথিত-সরোবর কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিলে যেমন তাহার পঙ্কিলতার নিম্নে সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য হইয়া উঠে, আবার তাহা শান্তভাব ধারণ করিলে স্বচ্ছ স্ফটিক-শুদ্ধ জল দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি, প্রত্যেকটি অভিনব দুর্ঘটনায় আমার চিত্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু, কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার সমস্ত গভীরতর অংশ নির্ম্মল হইয়া উঠিল। ফেলুদার যুক্তিপূর্ণ শান্ত প্রেরণা, আমার চক্ষে এক যবনিকালুপ্ত সত্যের আলেখ্য, অনাবৃত করিয়া ধরিল। কনকের মায়ের সমাজ-বিদ্রোহ, করুণাদিদির সমাজের প্রতি মর্ম্মদাহী অভিযোগ, সমস্তই যেন এক বিরাট বিপ্লবের অগ্নি-গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া, অসন্তোষের শিখায় প্রধূমিত হইতেছে। অধিকন্তু আমার মিথ্যাভাষণ দ্বারা সমাজের কৃত্রিম সমস্যা বিদূরিত হইল দেখিয়া, আমার মধ্যে যে অবহেলার বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া, সমাজের প্রতি আমার যেটুকু বিশ্বাস অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সমাজের স্বত্বপ্রধান প্রজাপুঞ্জ, যখন, পদে পদে সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তখন, তাহার প্রত্যেক অংশ যে বন্ধনমুক্ত তৃণাবলীর ন্যায়, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অন্ধ হইয়া উঠিবে, তাহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াও যখন ইহার কোন

ব্যতিক্রমের পন্থা পাইলাম না তখন ফেলুদার কথাগুলি আমার কাছে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া দেখা দিল।

এমনিভাবে অবসন্ন মস্তিষ্কে দিন বহিয়া চলিল। কিছুদিন পরে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আমাদের পুকুর পারে একটা লাউ গাছের মাচা বাঁধিবার খুঁটী পুঁতিতেছি এমন সময় একটি বালক, ফেলুদার নামীয় করুণাদিদির পত্র লইয়া পত্রখানা আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানা খামে আবদ্ধ ছিল না সুতরাং আমি অক্লেশেই পাঠ করিলাম। কিন্তু পত্রখানা অর্দ্ধপঠিত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া গেল। মাটি হইতে তুলিয়া তাহা ফেলুদার ঘরে বালিশের উপর রাখিয়া দিয়া আসিলাম। ফেলুদা তখন মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিতেছিল। আমার আর মাচা বাঁধা হইল না। চিন্তায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। ফেলুদা আগামী কাল দিদিকে লইয়া পশ্চিমে যাত্রা করিবে। কিন্তু সেদিনও ফেলুদার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় এই বিষয়ে কিছুই বলে নাই। করুণাদিদি আমার কাছে যে অস্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইল বুঝিয়া, রাগে অভিমানে অবসন্ন দেহে আমি স্নানান্তে জোর করিয়া নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া উঠিয়া গেলাম। ফেলুদার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু, অভিমানের বাষ্পে দুই চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ফেলুদা আজ একজন নারীর মোহ-চক্রে পড়িয়া সংসারের তীব্র আঘাতের মুখে বিপর্য্যস্ত হইবার কালেও কি আমার ন্যায় বন্ধুর সহানুভূতি প্রত্যাশা করে না? যদি তাই হয়, তবে আমিই বা অযাচিতভাবে কেন তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া পাপের অংশীদার হইতে যাইব?

এইরূপ মনোবেদনা লইয়া সমস্ত দিন কাটিল, পরদিবসও তাহার দর্শন মিলিল না, কিন্তু তার পরদিন যখন গ্রামের মধ্যে কাণাঘুষা আরম্ভ হইল তখন আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। সেই পত্র দেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের যাওয়া সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল, মনে হইত ফেলুদার মনে যদিও একটা দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে, সে তাহার সুপবিত্র মনের জোরে সহজেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু আমার সকল বিশ্বাস সকল স্বপ্ন পদদলিত হইয়া গেল দেখিয়া, আমি বিরক্তচিত্তে ফেলুদার এই কার্য্যটাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক অমানুষিক বলিয়া বিবেচনা করিলাম। অনেকেই আমার কাছে আসিয়া ইহার গূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিল কিন্তু আমি তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ভাবিলাম ফেলুদা আজ অবিসংবাদিতভাবে অধঃপতনের চরম সীমায় পদার্পন করিয়াছে। ফেলুদা যে নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করিত, তাহারই উত্তাল তরঙ্গে তাহার ঘৃণাপূর্ণ ক্লেদাক্ত দেহ হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার হৃদয়-গগনের ভাস্করমূর্ত্তি আজ মসীলিপ্ত নারকীয় পঙ্কে নিমগ্ন, হতচেতন। নারীর মধ্যে এমন কি অসম্ভব শক্তি নিহিত আছে যাহার প্রবল আকর্ষণে, ফেলুদা পিতা মাতা ভাই বন্ধু পরিত্যাগ করিল, পল্লীগৃহের স্নিগ্ধ আশ্রয় চিরতরে পশ্চাতে ফেলিয়া গেল। ফেলুদার এই সুকঠোর ত্যাগ দ্বারা কোন্ মহান আদর্শ সার্থক করিতে যাইতেছে! আমার দগ্ধ বিশৃঙ্খল বুদ্ধিতে তাহার কোন উত্তর না পাইয়া এই তমসাবৃত সমস্যার জাল ছিন্ন করিবার জন্য আমার মন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীশাবকের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কিন্তু মানুষ আপনার প্রিয়জনের উপর শত অভিমান অনুভব করিলেও অপরের কটাক্ষপাত সহ্য করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। আমি ফেলুদার বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধার ক্ষুরে শান দিতেছিলাম। কিন্তু যখন গ্রামের লোক তাহার নামে কুৎসা রটনা করিয়া উপন্যাস গড়িয়া তুলিল, তখন তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার তুচ্ছ ক্লেশ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মহত্ব প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ হইলাম না। আমার মনে হইল করুণাদিদির প্রতি সমাজ যে অবিচার করিয়াছে তাহার প্রতিবিধান করা ফেলুদার পক্ষে উদারতাজ্ঞাপক। পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াও করুণাদিদি সকলের কাছে লাঞ্ছিত পদানত, তাঁহার সুখস্বপ্নময় যৌবন কঠোর কৃচ্ছ্রতায় অন্যায়ভাবে অপমানিত হইতেছিল। সাত বৎসর পূর্ব্বে করুণাদিদি কৈশোরে বিধবা হইয়াছেন, কিন্তু সমাজ, তাঁহার এই দৈবপীড়ণের প্রতীকার করিবার মত কোন সদ্ভাব দেখান তো দূরের কথা তাঁহার মুমূর্ষু দেহের প্রতি কলেরার সময় যে পাশবিকতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে ফেলুদার এই ত্যাগ, এই সৎসাহস অতুলনীয়।

চিরশত্রু ফেলুদার এই কার্য্যটাতে মেজদা পরম গর্ব্ব অনুভব করিয়া ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ যে, এই প্রকার কুকার্য্যের অপেক্ষায় নিঃসন্দেহ ছিল তাহা প্রচার করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ হারাইলেন না। তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "এই জন্যেই ভণ্ডটার সঙ্গে মিশ্‌তে তোমায় বারণ করেছিলাম।"

কয়েকদিন যাবৎ ফেলুদার সম্বন্ধে উত্তর প্রত্যুত্তরে আমার মন ক্লান্ত হইয়া একটু নিশ্চিন্ত আরাম খুঁজিতেছিল, তাই, মেজদার কথাটার কোন বৈশিষ্ট্য না দিয়া আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

মেজদা আমার এই তুষ্ণীভাবটাকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "সমাজের উপর এই কলঙ্ক আরোপ ক'রে ফেলু যে অন্যায় করেছে তার জন্যে তা'র শাস্তি হওয়া উচিত।"

আমি এই কথায়ও কোন সাড়া দিলাম না। কিন্তু সংসারে একপ্রকার মানুষ আছে তাহারা পরনিন্দা করিবার কালে তাহাদের জিহ্বাকণ্ডুয়ন বন্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মেজদাও তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই মুখরোচক প্রস্তাবটা তর্কে বিতর্কে রসাল করিবার জন্য আকুল হইয়া বলিলেন, "তার বাপ তশীলদার বলেই এ যাত্রা রেহাই পাবে, জেল খাটালে তবে এই কুকাজের ঠিক শাস্তি হয়। তার বাপের টাকা আছে কাজেই গগন আচার্য্য শত্রুতা কর্‌তে সাহস পাবে না, না হ'লে যে কি হ'ত!"

মেজদা একটু একটু করিয়া আমার বুকের মধ্যে শূল বসাইতেছিলেন। আমি তাঁহার এই অনধিকার আক্রমণ রোধ করিবার জন্য বলিলাম, "সমাজের উন্নতি অবনতি তা'হ'লে টাকার উপরই নির্ভর করে! আসলে নীতির প্রতি কারও দরদ নেই; ফেলুদার এই কাজটা যদি সমাজের পক্ষে অপমানকর মনে করেন তবে, সকলে অর্থ সাহায্য করে গগনকে নালিশ কর্‌তে বলুন না কেন?"

আমার কথাটাতে মেজদার মুখখানা ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহা গোপন করিয়া কহিলেন, "আর কেউ তো গগনকে সাহায্য করবে না? গোচারনের মাঠে যে এজমালী জমিটা আছে সেটা নিয়ে সকলের সঙ্গেই তার শত্রুতা, কাজেই গগনের এই দুঃসময়ে কেউ তাহাকে অর্থ সাহায্য কর্‌বে না। যদি তা না হ'ত

তবে যে ফেলু এখন হাজতে বসে অনুশোচনা করৃত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"তা'হলে দেখ্ছি সমাজের স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে অতি তুচ্ছ। যে সমাজের হিতাহিত, ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষের উপর নির্ভর করে, সে সমাজ ধ্বংস হয়েছে, তার জন্য খেদ করে দুর্ব্বলতা বাড়িয়ে কোন ফল নাই। আর তাও বলি, এই কাজটা যদি কোন মুসলমান করৃত তা'হলে বোধ হয় আপনিও সন্তুষ্ট হ'তেন?" এই বলিয়া আমি বই লইয়া বসিয়া গেলাম।

মেজদা এতক্ষণ চৌকির উপর শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "মুসলমানরা যদি মেয়েটাকে নিয়ে যেত, তবে তো সে জাতি-চ্যুত হ'ত, তখন আর তার সম্বন্ধে বাক্যালাপ করা ও পাপ হ'ত। তা হয়নি বলেই যে, ফেলুর কাজটা ভাল হয়েছে তা আমি কিছুতেই স্বীকার করৃব না।"

"আপনাকে স্বীকার করাবার জন্যে কেউ সাধাসাধি করৃছে না। তা'র ভালমন্দ সে বুঝ্বে, আমি এ সব কথায় কথা কইতে চাইনে", বলিয়া আমি মেজদার উদ্দেশ্যহীন তর্কের পথ বন্ধ করিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলাম। মেজদা বিরক্তমুখে উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস ফেলুদার মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মনু, বাবা তুই তো সব জানিস, সে কোথায় আছে বলে দে। তাকে খবর দিয়ে এনে বিয়ে করিয়ে দেব। এত ভাল ছেলের মতিগতি যে, বিধবা মেয়েটা এক কথাতেই গুলিয়ে দিয়েছে তা তো আমার মনে হয় না।"

আমি বলিলাম, "আমারও না। ফেলুদা কোথায় আছে তা

আমাকেও বলে যায়নি, তবে সে বিধবা বিয়ে করবে বলেই বোধ হয় এ কাজটা করে বসেছে।"

আমার কথায় ফেলুদার মায়ের দুই চক্ষু হইতে অজস্র-ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বিয়ে করার কথা বল্‌লে তো আমরা ভাল জায়গায় কুল মেল দেখে বিয়ে দিতাম।"

আমি বলিলাম, "শুধু বিয়ে করাটাই তো ওর ইচ্ছে নয়। বিধবা-বিয়েটা সমাজে চলিত কর্‌বার জন্যেই সে এত বড় কাজে হাত দিয়েছে। কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যে ফেলুদা কোন কাজ করে না এ কথা তো আপনি জানেন। কাজেই দুঃখ করে কোন লাভ নাই কাকীমা।"

কাকীমা অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিয়া কহিলেন, "মায়ের প্রাণ কি এত দুর্ণামের মধ্যে স্থির থাকতে পারে মনু? তোমার কাকাবাবু তো এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করেন না। জানতো কেমন শক্ত মানুষ তিনি? ওঁর ও মুখখানা ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। এর চেয়ে যে সন্ন্যাসী হওয়া ভাল ছিল।"

"সন্ন্যাসী হলে ও কি আপনার কষ্ট হত না?"

"তা হ'ত বটে, কিন্তু রাত দিন নিন্দা শুনতে হ'ত না। ফেলুর নামে যেসমস্ত কথা আমার কানে আসে, ইচ্ছে হয় মাটির নীচে বসে থাকি। আচ্ছা, সে কি একটা চিঠিও লিখ্‌তে পারে না? কোন মতে তার ঠিকানাটা পেলে ত আমরা ও লিখ্‌তে পারি। শুধু তার শরীর ভাল আছে এ কথাটা জানলেও তো আমি ঠাণ্ডা হই। যা' খরচ লাগে মনু, আমি দেব, তুই একবার চেষ্টা করে

দেখ্ না," বলিয়া কাকীমা আবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মাটিতে গড়াইতে লাগিলেন।

আমি এই নিদারুণ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে নানা আশ্বাস উপদেশ দিয়া উঠিয়া আসিলাম। কিন্তু ফেলুদার পাষাণ-বুকের উপর শ্রদ্ধা রাখিতে পারিলাম না। মনে মনে তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কয়েক দিন পরে এই প্রকার চিন্তাচ্ছন্ন আমি, বই বুকে লইয়া সন্ধ্যার পর ঘুমাইতেছিলাম এমন সময়, মেজদা আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দিয়া বলিলেন, "মনু উঠে গিয়ে খেয়ে এস না, তোমার জন্য মেয়েরা তো আর রাতভোর জেগে থাক্‌তে পারে না।"

মেজদা বোধ হয় এতক্ষণ আহারের পর বিছানায় পড়িয়া পান চিবাইতেছিলেন। মেজবৌদিদি এখনও রান্নাঘরে আবদ্ধ, তাই উঠিয়া আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, "বড়দাদার খাওয়া হয়েছে?" মেজদা ঝঙ্কার তুলিয়া বলিলেন, "ওঁর এখন আদ্দেক রাত। তুমি খেয়ে এসে আজাড় করে দিলেই পার। এ সমস্ত কি, মেয়েদের শরীর কি রক্ত মাংসের নয়? দিনের সমস্তক্ষণ চুলায় থাক্‌বে আবার রাত্তিরে ও বারোটা বাজাবে। একটু বুঝে চল্‌তে হয় তো"!

অত্যন্ত ক্ষুধা সত্ত্বেও মেজদার কথাটাতে আমি অপমান বোধ করিলাম। "আমি খাবনা, ক্ষিধে নাই" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। মেজদা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "ক্ষিধে নেই বলে দিলেই পার্‌তে, সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

তারপর কোন কথাই আমার কানে আসিল না। কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে বিছুটি লাগাইয়া দিয়া মেজদা চলিয়া গেলেন। মেজদা

বিবাহের পর হইতে মেয়েদের সুখ সুবিধার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার জন্য বড় বৌদিদিকে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত প্রত্যহই রান্নাঘরে বসিয়া ঢুলিতে হইত।

তাঁহাকে এবিষয়ে মনোযোগী করিতে গেলে উদ্ধত বাক্যে তিনি উত্তর দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মেজ-বৌদিদি আসিবার পর, তাঁহার সমস্ত আলস্য কোথায় উড়িয়া গেছে, তিনি অত্যন্ত সময়ানুবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছেন! শুধু তাই নহে, অধিক পরিশ্রমে মেয়েদের শরীর নষ্ট হইয়া যায়, এই কথা লইয়া তিনি নির্লজ্জের মত যেভাবে মায়ের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিতেন, তাহা শুনিয়া আমার গা ঝিমঝিম করিয়া উঠিত। আমি আশ্চর্য্যচক্ষে তাঁহার দরদী হৃদয়-নিঃসৃত বাক্যগুলি শুনিয়া যুগপৎ ক্রোধে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া যাইতাম। মেজবৌদি যে, কি পরশমণির স্পর্শে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন তাহা একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা জানেন! কিন্তু তিনি যে অক্লেশে তাঁহার সকল দম্ভ সকল কুঁড়েমি ঝাঁটাইয়া দূর করিয়া দিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমি বৌদিদির শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছি। এর ফলেই মেজদা এখন মেয়েদের পক্ষ-পাতিত্ব করেন, মাকে তাঁহার শিক্ষা ও ব্যবহারসম্বন্ধে সচেতন করিবার মত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন। এমন কি আমাকেও মধুর প্রলেপে, বিষের হুল ফুটাইয়া দেন। আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ-ভাবে ঘুমাইবার জন্য দরোজা বন্ধ করিতে উঠিলাম, কিন্তু বড় বৌদিদি আসিয়া বলিলেন, "মনু, এস খেয়ে

নাও ভাই, আমি ভাত দিচ্ছি, তিনি তো গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।"

আমি অনিচ্ছা জানাইয়া বলিলাম, "খাব না ক্ষিধে নাই। বড় বৌদি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, না থাকে, যা হয় চারটী মুখে দিয়ে যাও; রাত্তিরে না খেলে সকালে পিত্তি পড়্‌বে যে।"

বড়বৌদিদি আমাকে টানিয়া আনিয়া পিঁড়িতে বসাইয়া ঢাকা অন্ন-ব্যঞ্জন বাড়িয়া দিলেন। আমি খাইতে খাইতে বলিলাম, "মেজদা কি আরম্ভ কর্‌লেন তা তো বুঝ্‌তে পারছিনে। আমাদের বাড়ীতে তো এসব উৎপাত ছিল না।"

বড় বৌদিদি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এখন ও ছেলে মানুষ তাই ওরূপ কর্‌ছে। বয়স হলে এসব থাক্‌বে না।"

"এত বয়েস হ'ল এখনও একটু বুদ্ধি বিবেচনা হ'ল না? আর হ'বে কি বুড়ো হলে! সেদিন মাকে সাবধান করে দেওয়া কি মেজদার উচিত হয়েছে?" বলিয়া আমি ভাতের গ্রাস মুখে তুলিলাম।

বৌদিদি আমার পাতে লবণ দিয়া কহিলেন, "কাজ কর্ম্ম কর্‌লে কি আর মেয়ে মানুষের শরীর খারাপ হয়? আমি তো কাজ কর্‌লে থাকি ভাল। কি জানি ওঁর কেমন বুদ্ধি। দুই বেলা তো রোজই রাঁধ্‌তে হয় না! সেদিন আমার শরীর খারাপ ছিল বলেই ওঁকে দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি কাজটাকে এতখানি কর্‌বেন ভাব্‌লে আমি জ্বরগায়েও রান্নাঘরে আসতাম। কথাটা তোমার বড়দার কানেও উঠেছে,

কিন্তু, তিনি বল্‌লেন, 'ছেলে মানুষের কথা ধর্ত্তব্য নয়। এখন কলেজে পড়ে, এখনও বুঝ্‌-ব্যবস্থা তেমন পাকা হয় নাই।' যাক্‌গে এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করোনা; আমিই কি আর ওসবে মেতে আছি?"

আমি চুপ করিয়া খাইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ বড় বৌদির চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "মেজঠাকুরপোর কি এমন ভাবে আমাকে অপমান করা ভাল হয়েছে। আমি যে মুখ্যু, একথা তো সবাই জানে, তবু তিনি আমার শিক্ষার অজুহাতে আমার মা-বাপের অন্ধ-শিক্ষা নিয়ে খোঁচা দিলেন।"

বড় বৌদির দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আমি বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খাইয়া নিঃশব্দে কতকগুলি ভাত গিলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। মেজদা যে তাঁহার বৌয়ের মাইনর পাশ দেওয়ার মহিমা প্রচার করিয়া, তাঁহার বিদ্যার গৌরব সকল লেখাপড়ার গোড়ায় ছাই দিয়াছেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে শোকে ও দুঃখে আমি বিছানায় গিয়া পড়িলাম।

১২

কাঁকাল হইতে জলপূর্ণ পিতলের কলসীটা ধপ করিয়া বারান্দায় নামাইয়া মা তাঁহার রান্না ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন রাত্তিরে তো দুপুরে একটীবার চারটে গিলি। মাঝে মাঝে এসে যে চারটি চাল ফুটিয়ে দেয় এরই জন্যে তুই, মেজবৌর পক্ষ

নিয়ে আমাকে এত কথা বল্‌তে এসেছিস্‌ যোগীন?" মায়ের চক্ষু ছাইয়া অশ্রুধারা উতলা হইয়া উঠিতেছিল তাহা আঁচলে মুছিয়া তিনি কহিলেন, "আমি আমার শাশুড়ীর ঘরে একলাই ছিলাম। একটু কুটো জুগিয়ে দেবার দোসর কেউ ছিল না। কিন্তু এই করেই টোলের দশ পনের জন ছাত্রের জন্য দু'বেলাই রান্না করেছি, নিরামিষ রান্নারও আয়োজন করে দিয়েছি, চারটে গাই গরু ছিল তাদেরও সেবা করেছি—এই দু'হাতের বেশী তিন হাত লাগে নাই। এতখানি বয়েস হল বৌয়ের কাছে এখন নু'য়ে থাকৃতে হবে", বলিয়াই মা অবরুদ্ধ ক্রন্দনের ধারা মুক্ত করিয়া দিলেন। বড়বৌদিদি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মাছ কুটিতেছিলেন, তিনি ঘোমটা টানিয়া স্তব্ধ দেহে বসিয়া রহিলেন। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া আমি পিঁড়িতে বসিয়াছিলাম। মেজদা আমার সম্মুখে উঠানে দাঁড়াইয়া কতকগুলি বই রৌদ্রে শুকাইতেছিলেন। মেজবৌদি বোধ হয় ঘরে বসিয়া ইংরাজী হাতের লেখা পাকাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেখিলাম না।

মা বঁটি পাতিয়া একটী কুমড়া কাটিতে বসিয়া বলিলেন, "এই ভাবে খেটেখুটেই তোদের মানুষ করেছি, মেয়ে দুইটাকে ওঁর পুণ্যফলে পার করেছি। কিন্তু আমার মেয়ের নামে তো ওরূপ কোন কথা ঘুনাক্ষরেও শুন্‌তে পাইনি? ওরাও যে আমার হাতে মানুষ হয়েছে যোগীন? সবই আমার অদৃষ্টের ফের। যতদিন পর্য্যন্ত আমার হাতরথ চালাতে পার্‌ব ততদিন যা পারি নিজেই করে কর্ম্মে নেব, আর, একান্ত অচল হ'লে বড় বৌমা তো আছে!"

মেজদা বইগুলি উল্টাইয়া দিতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমার রান্নার জন্যে বল্‌ছি? তোমরা কথায় কথায় ওকে বক্‌বে; ওতো ছেলে মানুষ পরের মেয়ে।"

"কাজ শেখাতে গেলে একটু আধটু কড়া কথা বললেই যদি বকা হয়, তা'হ'লে থাক তোমার বৌকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে ভাত দিও,—আর নেমে আসতে হবেনা!" বলিয়া মা চুপ করিলেন।

মেজদা বলিলেন, "দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যদি কড়া কথার উপর রাখ, তবে, নিঃশ্বাস ফেল্‌বে কখন, আর, সমস্ত ক্ষণই তো কাজ করে তবু তোমাদের মন পাওয়া যায় না।"

"সমস্ত দিনই কি আমি ওকে গালি পাড়ি নাকি? তুই চুপ কর যোগীন, মুখ পোড়াস না। সংসারে কি তুইই একা বিয়ে করেছিস আর তোর বৌ-ই খালি লেখা পড়া জানে? এত যদি অপমান মনে হয়, তবে, ঠাকুর চাকর এনে ঠিক করে দে না, বড় মানুষের মেয়ে;—রান্নাবান্নায় হাত পুড়িয়ে কাজ কি? পায়ের উপর পা তুলে হুকুম কর্‌বে", বলিয়া মা মুখের উপর শ্লেষের আভা ছড়াইয়া দিলেন।

ধাবমান অশ্বের মত চাবুক খাইয়া মেজদা উদ্ধত কণ্ঠে বলিলেন, "বড় মানুষের মেয়ে না হ'তে পারে কিন্তু তোমাদের এই পক্ষপাতিত্ব সহ্য সে তো কর্‌বেই না আমিও কর্‌ব না বলে দিচ্ছি। তোমরা ওকে নিয়ে রাতদিন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কর্‌বে কাঁহাতক্ সহ্য কর্‌ব?"

"ওষুধ করেছে যোগীন, সোণার প্রতিমা সাধ করে ঘরে এনেছিলাম, তা'র মধ্যে যে এত বিষ তা কি জানতাম? তুই যা

ইচ্ছা কর—তোর বৌকে নিয়ে তুই ঘরে বসে থাক্, আমাদের আর কথা শোনাস্নি”, বলিতে বলিতে মা বঁটীটা কাৎ করিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

মেজদা গরগর করিতে করিতে বইগুলি বগলে তুলিয়া বলিলেন, “আজই বড়দা এলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করব। এত পরাধীন হয়ে আমি থাকতে পারব না।” বলিয়াই মেজদা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি উঠিয়া বিহ্বল বিমূঢ় ভাব দমন করিবার জন্য বৈঠকখানায় গিয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম একটা বর্ষনের পরেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে, কিন্তু মেজদা আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া মা এবং বড় বৌদিদির নামে অনেক অবান্তর কথা লাগাইয়া বড়দার কাছে প্রস্তাব করিলেন, “এই ভাবে রাতদিন ঝগড়াঝাটির চেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যেই বল্‌ছি, আমাকে পৃথক করে দিন।”

বড়দাদা নম্র প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “এক পরিবারে থাকতে গেলে এসব কথায় কান দিতে নেই যোগীন। সকলেই একটু সয়ে বয়ে নিলেই চলে। আর মেয়েদের কথায় তোমার তো কান দেওয়াই উচিৎ নয়।”

মেজদা পা দিয়া মাটি ঘসিতে ঘসিতে বলিলেন, “কানে আসে বলেই কান দিই, এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আপনি তো এসব দিকে লক্ষ্য করেন না, তাই আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, আমাকে পৃথক করে দিন।”

বড়দা কিছুক্ষণ বিষণ্ণ চিন্তার পর বলিলেন, “তোমার যদি

পৃথক হ'বার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তুমি নিজেই পৃথক হয়ে থাক্‌তে পার,—বিষয়-আশয় কি আছে না আছে তুমি তো সবই জান।"

"বিষয়-আশয় পরেও ভাগাভাগী কর্‌লে চল্‌বে, এখন আমি আলাদা বন্দোবস্ত করে নেব। শেষে আমাকে কোন দোষ না দেন এই জন্তেই আগে থেকে বলে রাখ্‌ছি।" বলিয়া মেজদা মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বড়দা বলিলেন, "আমি ভাব্‌ছি আর ক'দিন পরেই তো তুমি কলেজ চলে যাবে, তখন তুমিও এখানে থাক্‌বে না। তার আগে বি, এ, টা পাশ দিয়ে ওকালতি পড় না, তারপরেও তো এসব ব্যবস্থা হতে পার্‌বে—তার মধ্যে হয় তো সকলেরই মন মেজাজ ভাল হ'তে পারে।" বলিয়া বড়দাদা মাথায় তেল ঘসিতে লাগিলেন।

মেজদা মাথা না তুলিয়া কহিলেন, "আর কলেজে পড়ব না। পোষ্টঅফিসে চাকরীর দরখাস্ত করেছি। বড় বাবু আশা দিয়েছেন কাল পরশুর মধ্যেই নিয়োগ-পত্র আস্‌বে।"

বড়দা অকস্মাৎ একটা বিস্ময়ের আভা সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন, "এখুনি চাকুরী কর্‌বে?"

"তা ছাড়া তো কোন উপায় দেখ্‌ছি না। যা'হো'ক, তা'হ'লে আজই সব ব্যবস্থা করে নিই?" বলিয়া মেজদা দাঁড়াইয়া গমনোদ্যত হইলেন।

বড়দা গম্ভীর চিন্তিত মুখে হুঁ বলিয়া স্তব্ধ আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। মেজদা প্রফুল্লমুখে বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বড়দার মুখের উপর দিয়া যে কি এক খণ্ড

কৃষ্ণ যবনিকা বহিয়া গেল তাহার আবেশ লইয়া আমি উঠিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময় মা আমার ঘরে আসিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিলেন, "যোগীন কি সত্যি সত্যি আলাদা হয়ে যাবে মনু? বউও ছেলে মানুষ, ও তো সংসারের কিছু বোঝে না। তুই একটীবার তোর মেজদাকে বলে কয়ে বুঝিয়ে বল। আমি মা হয়ে কেমন করে এবাড়ীতে দুই হাঁড়ি দেখ্‌ব?"

আমি নিঃশব্দে বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। মায়ের প্রাণ পুত্রের ক্ষুদ্রতম সুবিধার জন্য যে অকৃত্রিম বেদনা বহন করিয়া চলে, তাহা যে পুত্র বোঝে না তাহাকে আমি কি উপদেশ দিব? কিন্তু মা পুনরায় কহিলেন, "কোলে কাঁখে করে মানুষ করেছি মনু, ছেলে হ'লে এ দুঃখ বুঝ্‌তে পার্‌বি। তুই তাকে নিষেধ কর্" বলিয়া উদ্বেলিত অশ্রুজল রোধ করিতে করিতে মা চলিয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী অপ্রকাশ্য ক্রন্দনের মুহুর্মুহু লীলা, আমার সমস্ত অন্তরের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া, গাঢ় যন্ত্রণায় অভিভূত ব্যথাবিষ্ট হইয়া বিছানার সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। মায়ের মুখে যে কথাটী ব্যক্ত হয় তাহার পশ্চাতে যে ভাষাসমুদ্র পদে পদে করুণার স্রোতে আবর্ত্তিত হইয়া অব্যক্ত প্রশান্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায় তাহা কি কোন কালেই বাহির হইবার পথ পাইবে না! মানুষ কি এই অবরুদ্ধ ক্রন্দন কোন কালেই শান্ত করিবার মত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না? তবে মায়ের সহিত পুত্রের এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব সম্বন্ধের তাৎপর্য্য কি, পরিপূর্ণতার

পথ কোথায়? আমার বুকের সমস্ত ভাব দিয়াও মায়ের এই গূঢ় অশ্রুসম্পাতের পরিমাপ করিতে না পারিয়া এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবেগে অভিষিক্ত হইতে লাগিলাম।

পরদিন সকাল বেলা মেজদাকে ব্যস্তভাবে সম্মুখে পাইয়াই বলিলাম, "এসব কি আরম্ভ করেছেন মেজদা। আমাদের ভায়েদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেই তো সব ঠিক হয়ে যায়? মার সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে? আমাদের মায়ের মত মা ক'জনের মেলে।"

মেজদা হঠাৎ আমার মুখ হইতে এতগুলি উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত পদে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমার কাছে এসব পরামর্শ নিতে আসিনি। মা হিসাবে আমাদের মায়ের তুলনা নেই একথা তোমাকে বলে দিতে হবে না। তবে ভাল মা হলেই যে ভাল শাশুড়ী হবেন তার কোন মানে নাই।"

মায়ের বিরুদ্ধে এই অপমানকর উক্তি শুনিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি ফস্ করিয়া বলিলাম, "আপনার মাথার ঠিক নেই মেজদা। মেজবৌদির ভালর জন্তেই তিনি উপদেশ দেন।"

আগুনের ভিতর ধুনা ছিটাইলে যেমন শিখাটা দপ করিয়া উঠে, মেজদা তেমনি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যা বোঝনা তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নাই," বলিয়াই মেজদা চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলাম, "আমি নির্ব্বোধ হয়েই চিরকাল থাক্‌ব, তবু যেন আপনার মত বুদ্ধিমান না হই। মেজদা আমার কথাগুলি শুনিলেন কি

না বুঝিলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, জন-মজুর আনিয়া উঠানের মধ্যে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিবার জন্য বড়দার সঙ্গে জায়গা লইয়া মাপজোপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

উঠানের মাঝখানে বেড়া উঠিল। বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার বিশাল সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অংশের জন্য মানুষের এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখিয়া বোধ হয় হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "মানুষ, তুমি তোমার অজ্ঞানতাদ্বারা, পৃথিবীকে যতদিন খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুপরমানুতে ভুলিয়া থাকিবে, যতদিন তুমি আপনার বাহিরে, বিরাট মানবসমাজের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য অহঙ্কারের প্রাচীর তুলিয়া, আপনাকে কঠিন আবেষ্টনে ঘিরিয়া রাখিবে, যতদিন তোমার প্রেমালিঙ্গন দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রতিবেসীকে সমজ্ঞানে হৃদয়যুক্ত করিতে না শিখিবে, ততদিন তোমার দশদিক আনন্দ-ঘন-সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইবে না, সমগ্র সৃষ্টির ভাবমূর্ত্তি আমাকে না দেখিয়া দিকভ্রান্ত পথিকের মত, সৌন্দর্য্যের সার সংসার, মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, তোমার সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম হোমের শিখায় কল্যাণের দিকে প্রধাবিত হইবে না। তুমি তোমার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া, পরম মঙ্গলনিদান আমার অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত থাকিবে ও চতুর্দ্দিকে আমার বিচিত্র প্রকাশ, তোমার অনুভবের অতীত হইয়া, বন্যাপ্লাবিত ব্যক্তির ন্যায়, মলিন জল-সিন্ধুতে বাস করিয়াও একবিন্দু স্বচ্ছ পানীয় জলের জন্য তৃষ্ণায় বক্ষ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তৃষ্ণাহত তুমি চিরকাল শুধু এই ক্লেদাক্ত-

বারি পান করিয়া সকল সৌন্দর্য্যভূষিত এই সংসারের প্রতি তোমার বীতরাগ জন্মিবে।”

কিন্তু মানুষ ভগবানের এই বাণী এই আক্ষেপ যে, সুপ্তির মধ্য দিয়া স্বপ্নের মত পরিত্যাগ করে, তাহা প্রমাণ করিয়া মেজদা একই বাড়ীতে দুই হাঁড়ি বসাইলেন। পরদিন শুনিলাম মেজদা পোষ্টাপিসে ত্রিশটাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ফেলুদার সঙ্গে অনেক দিন দেশোদ্ধারের তর্কে বিতর্কে মেজদা বিদেশীয়ের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রচার করিতেন, কেরাণীগিরির প্রতি যে কটাক্ষপাত করিতেন, সেদিনও কালেক্টার সাহেবের পত্নীকে জল হইতে তুলিবার কালে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহারই সমস্ত দেশব্রতের স্বপ্ন, পাষাণমূলে আছাড় খাইয়া এমন ভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা আর কেহ বিশ্বাস করুক, আমার প্রথমটা সমস্তই ছায়াবাজীর মত মনে হইল। ইচ্ছা হইল, তিনি যে বড় গলা করিয়া ফেলুদাকে অপদস্থ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেছিলেন, সমাজের অকল্যাণকামীর প্রতি কুটিল নিন্দাবাদ করিয়া কর্ণমূল লাল করিয়াছিলেন, তিনিও কি আজ, সমাজের কথা তো ছার, সমগ্র দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া শুধু তাঁহার সামান্য দুইটা উদর-পরিপূর্ত্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য, পরের দাসত্ব করিতে একটুও লজ্জা অনুভব করিতেছেন না। ফেলুদা একটা আদর্শের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিলেন, মেজদা সেই আদর্শকে, দাসমনোবৃত্তির উপর দাঁড়াইয়া, বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে দাদামহাশয়ের বাৎসরিক সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে

আমাদের বাড়ীতে কয়েকজন ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হইল। আমি বড় বৌদির নিকট হইতে ফর্দ্দ ও টাকা লইয়া একটু সকালেই বাজারে চলিয়া গেলাম। আসিবার কালে আমার সম্মুখবর্ত্তী মেজদাকে একটা থলে হাতে বাজার হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম। তিনি হন হন করিয়া ছুটিতেছিলেন। এই জিনিষপত্র লইয়া যাওয়ার পর রান্না হইবে,—তাহা নাকে মুখে গুঁজিয়া তিনি বড়বাবুর চোখরাঙ্গানি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আপিসে যাইবেন। হায়, মেজদা! তুমিই না বাজারে যাইতে হইলে আমাকে সাধাসাধি করিতে? প্রাণের মধ্যে এইরূপ তুমুল আলোড়ন লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। মেজদা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

দ্বিপ্রহরের সময় মা মেজবৌদিকে বেড়ার ফাঁক দিয়া বলিলেন, "মেজ বৌমা, একটীবার এসে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে যাও। মেজবৌদি বেড়ার মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ পথখানির মধ্য দিয়া আসিতেই, মা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তার পর তাঁহাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইলেন ও অনেক হা হুতাশ করিয়া মেজদার জন্য ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য থালায় সাজাইয়া দিলেন। মেজবৌদি কম্পিত পদে সে সমস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া পাষাণও বোধ হয় গলিয়া যায়। বিশ্ব চরাচরের মহত্তমবিকাশ এই মাতৃত্ব,—গভীর নীলিমার সকল দূরত্ব লইয়া, প্রশান্ত সমুদ্রের সমস্ত গভীরতা লইয়া, ধরিত্রীর সকল বেদনা লইয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহিমা লইয়া অনুপম। মাতৃত্বের সীমা নাই,

ইহাতে এমন রূপ আছে রস আছে গন্ধ আছে, যাহার কাছে সতীর সতীত্ব, প্রণয়ীর আকুলতা, শিশুর সরলতা, রমণীর সৌন্দর্য্য, সন্ন্যাসীর ত্যাগ, সমস্তই নিস্প্রভ। পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নাই যাহা মাতৃত্বের গঙ্গোত্রীধারায় নিষ্কলুষ পবিত্র হইয়া না যায়। আমি মায়ের এই আত্মভোলা স্নেহের আনন্দসরোবরে অবগাহন করিয়া যদি মরিয়াও যাই তথাপি নিজেকে ধন্য মনে করি। এই ভাবে আপ্লুতচিত্তে, পৃথিবীর সকল ত্রুটির কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া, এক অভাবনীয় নিষ্কাম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেলাম।

১৩

প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝার পর প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল। পরমেশ্বরের সৃষ্টি একই নিয়মে গ্রন্থীবদ্ধ, তাই আমাদের সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা শেষ হইয়া মেজদার সহিত আমাদের সমস্ত সমস্যা বিদুরিত হইল। মেজদা পৃথক থাকিয়া আমাদের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলেন, মায়ের আনন্দ ক্ষণেক্ষণে তেমনিভাবে অশ্রুজলে আপ্লুত হইতে লাগিল। মেজদা পোষ্টাল ক্লাবের সেক্রেটারী হইয়া একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। এই "সঙ্ঘ" নামক মাসিকপত্র লইয়া সাহিত্যচর্চ্চার আলোচনায়, মেজদার সহিত আমার যোগসূত্র পূর্ব্ববৎ স্থাপিত হইল। ক্রমান্বয়ে প্রায় বৎসরখানেক অতীত হইবার পর মেজদা একদিন রবিবার সকাল বেলায়, তাঁহার নব প্রকাশিত "সঙ্ঘখানা" আনিয়া আমার সম্মুখে

বসিলেন। শীতকালের দিনে সকাল বেলায় রৌদ্রে বসিয়া লেখা পড়া করা, ও তৎসঙ্গে মুড়ি খাওয়া আমাদের প্রচলিত রীতিস্বরূপ ছিল। আমাদের বহিঃপ্রাঙ্গনে একটী শীতলপাটী পাতিয়া আমি বসিয়াছিলাম। মেজদা তাহারই এক কোণ অধিকার করিয়া বলিলেন, "একতার অভাবে আমরা কোন বড় কাজ কর্‌তে পারি না। আমি এবার তাই 'একতা' নামে যে কবিতাটী লিখেছি তা' দেখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পর্য্যন্ত আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে তারিফ্ করেছেন।"

মেজদা গর্ব্বদীপ্ত মুখে কথাগুলি শেষ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কবিতাটী পড়িতে পড়িতে আমার মুখখানা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইহার মূল বক্তব্যটী যে দাসসুলভ মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভাসিত, সে বিষয়ে কোন সংশয় রহিল না। "আমরা অধম আমরা পতিত, আমরা জগতের মধ্যে ঘৃণ্য। আমরা ইউরোপীয় জাতীর তুলনায় বর্ব্বর, কারণ আমরা কোন কাজই সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিতে পারি না। আমাদের মধ্যে একতা নাই বলিয়া আমরা প্রভুর কার্য্য সফলপূর্ব্বক পদোন্নতি লাভ করিয়া, জগতের মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারি না; আমাদের মধ্যে ডিসিপ্লিন নাই বলিয়া সমরক্ষেত্রে সৈন্যের ন্যায় অমিতবিক্রমে ও নত মস্তকে সেনাপতির আদেশ পালন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি না। সুতরাং আরও একতাবদ্ধ হইয়া আমাদের উচ্চপদস্থ মাননীয় সাহেবের আদেশ পালন করিতে হইবে। আত্মস্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সদাশয় প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া আমাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতে হইবে

এবং ধাপে ধাপে উন্নতির চরম সীমায় অধিরোহন করিয়া প্রত্যেককেই জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী আখ্যা লইতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সর্ব্বশেষে লেখা আছে, হে আমাদের পরম ভক্তিভাজন অন্নদাতা, তুমি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া দাও! আমরা অন্ধ, আমরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে অতি হীন, তুমি আমাদিগকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরণীর কর্ণধারস্বরূপ, মিলন-সমুদ্রের পথে পরিচালিত কর, ভগবান তোমার দীর্ঘজীবন ও অক্ষয় সুখ প্রদান করিবেন।"

কবিতাটী পাঠ করিয়া আমার সর্ব্বশরীরে একটা বৃশ্চিক সঞ্চালন অনুভব হইল এবং ঘৃণায় বিজাতীয় বিদ্বেষে স্তম্ভিত আড়ষ্ট হইয়া, ত্রিশ টাকা মাহিনার সদাশয় প্রভুভক্ত মেজদার প্রতি কটাক্ষ-পাত করিয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি আমাকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া বলিলেন, "উঠে যাচ্ছ যে, কিছু বল্‌লেনা?"

আমি বইগুলি গুছাইয়া বলিলাম, "মেজদা আমাকে মাপ করুন, আমি আপনাদের একতার পায়ে গড় কর্‌ছি। আমার কথা শুনে সম্ভবতঃ আপনি সুখী হবেন না।"

মেজদা বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একতা আমাদের নাই সত্যি কথা কিন্তু আমরা পুনরায় ইহা স্থাপন কর্‌বার দিকে লক্ষ্য করি না, ইহাই আমাদের মারাত্মক ভুল।"

আমি ভাবিলাম, মেজদা সহজে ছাড়িবেন না। তিনি হয়তো সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নিরলস ভাবে এই সাহিত্য-সমুদ্রমথিত

অমৃতবিন্দু আহরণ করিয়াছেন। আমি বলিলাম, "এ সমস্ত কথা আপিসের কেরাণীকুল যত সহজে মেনে নেবে, আমাদের ন্যায় হত-ভাগ্যেরা তা পার্‌বে না, কারণ আমরা তো আর সাহেবের কৃপা-কণার অধিকারী হই নাই! আর এখানে যে একতার কথা লিখেছেন তা' যদি আমাদের দেশবাসী গ্রহণ করে তবে, কাল থেকে ভারতবর্ষ দাসজাতি বলে সম্মানিত হবে! কাজেই আমার একটা অনুরোধ মেজদা, আপনাদের প্রভুভক্তির গদগদ ভাব ছড়িয়ে, পবিত্র সাহিত্যের মন্দির কলুষিত কর্‌বেন না।"

মেজদা আমার দিকে চাহিয়া সত্ত্বখানা তুলিয়া কবিতাটীর স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "তুমি বোধ হয় ভাল করে পড়নি তাই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।" বলিয়া তিনি পত্রিকাটী আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

আমি তাঁহার হাত ঠেলিয়া কহিলাম, "আগে জান্‌লে স্পর্শই কর্‌তাম না। বুঝি আর না বুঝি, ইংরাজের অবহেলা-প্রদত্ত অন্নের যে গুণ আছে তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আপনি যে, একতার জন্য বইয়ের পাতায় এত কান্না কাঁদেন, তবুও তো আমাদের সঙ্গেই একতা রাখ্‌তে পার্‌লেন না।"

তিনি বোধ হয় আমার মুখ হইতে ব্যক্তিগত আক্রমণ আশা করেন নাই। প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া তাহা দমন করিয়া কহিলেন, "সাহেবরাও ঘরে সকলেই পৃথকভাবে থাকে কিন্তু জাতীয়তার জন্যে তা'রা সকলেই এক।"

আমি বলিলাম, "সাহেবদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। সাহেব যে স্থলে হাজার টাকা মাইনে পায়, আপনি সেখানে মোটে

ত্রিশ টাকা পান কাজেই তাদের আদর্শ, আমাদের আদর্শ হতে পারে না।"

"ওদের ক্ষমতা আছে বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে তাই এরা—"

মেজদাকে অবশিষ্ট কথা বলিতে না দিয়া আমি বলিলাম, "তাই এরা একপাল মেষশাবককে চালিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু হাঁড়ির খবর নিতে পার্‌লে দেখ্‌বেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তা'রা অনেকেই আমাদের চেয়ে কোন অংশে বেশী নয়। শুধু জাতীয় ভাষা ইংরাজী বলে আর আমাদের ন্যায় আত্মনিন্দুক ঝগড়াটে গোলামের জাত বলেই, তা'রা অক্লেশে তর্জ্জনীহেলনে আমাদিগকে দাবিয়ে রাখে, আমরাও তাদের দাসত্ব পেলে জীবন সার্থক মনে করি।"

মেজদা আরক্তমুখে বলিলেন, "নিন্দে করাটা আমাদের স্বভাব। গুণের মর্য্যাদা ভারতবাসী কোন দিনই জানে না। বলি, এই দাসত্ব না কর্‌লে ভাত জুট্‌বে কি ক'রে!"

আমার সর্ব্বশরীরে মেজদার এই ক্লীব ঔদ্ধত্য, আগুনের হলকা ছড়াইয়া দিল। আমি কুঞ্চিত অধরে দন্ত দংশন করিয়া কহিলাম, "চাষবাস করে মুটে মজুরের মত খেটে খুটে যদি অন্ন না মেলে, তবে, উপোষ করে সব মরে যাক্‌, তবু এই ঘৃণার অন্নের জন্য যেন মাথা বিক্রয় না করে।"

"শিক্ষিত লোক চাষবাস করে খাবে, তো লেখা পড়া করে কোন ফল নাই। তা ছাড়া সাহেবদের কাছে ডিসিপ্লিন শেখার জন্যেও তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে হ'বে।" বলিয়া মেজদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "পরাধীন জাত হয়ে রাজার জাতের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করাতে কোন বাহাদুরী নাই। হাজার হাজার বৎসর আগে

থেকে তা'রা যে বীরত্ব দেখিয়ে আস্‌ছে সেজন্য তাদের প্রতি সহজেই শ্রদ্ধা হয়। আলেকজাণ্ডার থেকে ইংরাজ পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়গণ যে ভাবে ধৈর্য্যের সহিত ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বীরত্ব দেখিয়েছে তাহার তুলনা নাই। যা'রা এত আধিপত্য দেখিয়ে ভারত অধিকার করে রাজ্য স্থাপন করেছে তাদের কর্ম্মকুশলতা ও শৃঙ্খলা অনুকরণ করবার বিষয়। আজ কাল আমরা যেরূপ শান্তিতে বাস করছি এই শান্তি রক্ষার ব্যাপারে আমাদেরও সাহায্য করা উচিত।"

আমি বলিলাম, "তাদের, যে সমস্ত গুণ আছে তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ইতিহাস চিরদিন পরিবর্ত্তনশীল। ভারতের উপর যে জাতি পশুবল দেখিয়ে দস্যুবৃত্তি করেছিল তা'রা, তাদের কাছে বীর হতে পারে কিন্তু ভারতবাসী, এই দস্যুতা লুণ্ঠন প্রভৃতি চিরকালই ঘৃণার চক্ষেই দেখে আস্‌ছে এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা পেয়েই সমগ্র পৃথিবীতে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বুদ্ধভক্তদেশ এখনও তার সাক্ষী। ঘটনাচক্রে আমরা পরাধীন হয়েছি বলে যে, পুনরায় স্বাধীন হয়ে, আধ্যাত্মিক ভাবের উপর অধিকার স্থাপন করতে পারব না, তা'র কোনই কারণ নাই। জড়বাদী সভ্যতার ফলে এ দেশের লোক পশুবৃত্তির পূজা করতে আরম্ভ করেছে কিন্তু তা শীঘ্রই অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। তখন ভারতের শান্তির পথে সকলকেই আসতে হবে। এখন আমরা যে শান্তির মধ্যে আছি তা' মৃত্যুর ন্যায় শীতল। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জাতি সহজেই এই শান্তির আশ্রয়ে মুগ্ধ হতে পারে, কিন্তু কোন আত্মসম্মানী জাতি

তা স্বীকার কর্‌বে না, তা'রা ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকতে দাবী কর্‌বে। আর যতদিন পর্য্যন্ত এই দাবী প্রতিষ্ঠিত না হ'বে ততদিন কাপুরুষ থেকে, শক্তিমানকে সাহায্য করা উচিত নয়। ভারতবাসী ইংরাজকে তাড়াতে বলে না, তা'কে ভাইয়ের মত, বন্ধুর মত পেতে চায়—প্রভুর মত পূজা কর্‌তে চায় না।”

“শক্তিমানকে চিরকালই পূজা কর্‌তে হবে” বলিয়া মেজদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম, আত্মশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন বলেই আপনারা পূজা কর্‌তে যাবেন। আমার তো মনে হয় ক্ষমতা বুঝাতে পার্‌লে, যা'রা প্রকৃত বীর তা'রা কখনও তা'র অসম্মান কর্‌বে না। আমরা নিজেরা পরস্পরের প্রতি উপেক্ষা রাখ্‌তে পারি কিন্তু যা'রা বীর তা'রা কখনও বীরের অমর্য্যাদা কর্‌তে পারে না। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পুরুর প্রতি ব্যবহারেই তা প্রতিপন্ন হয়েছে। জন্মভূমির স্বাধীনতার উপর সকলেরই জন্মগত অধিকার আছে, তা' কুড়িয়ে নিতে হয়,—ভিক্ষে ক'রে বা পুজো ক'রে তা' পাওয়া যায় না।”

মেজদা যাইতে যাইতে বলিলেন, “এসব এখনও বহুদিনের কথা। আগে নিজেদের মধ্যে একতাবোধ আসুক, তারপরে স্বাধীনতা আস্‌বে।”

মেজদাকে বাজারে যাইতে হইবে তাই তিনি উঠিয়া গেলেন। আমার উত্তেজিত মন আর লেখাপড়ায় বসাইতে পারিলাম না। ইংরাজ স্বাধীন জাতি; কিন্তু তাহারা যতই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন থাকুন, তাঁহাদের অধীনে চাকুরী করিয়া ভারতবাসী যে কেন এত সহজেই দাসত্ব স্বীকার করিয়া লয়, তাহার কোথাও কোন গূঢ় কারণ

আছে কি না ভাবিতে লাগিলাম। আমি যে মেজদাকে ঘিরিয়া, দেশ-প্রাণতার সু-উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যটীকে অধিকতর প্রতিভাত দেখিতাম, তিনিই যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্ধ-ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলেন তখন, চাকুরীর মোহ সম্বন্ধে আমার আর কোন সংশয় রহিল না। স্বাধীন দেশের ইংরাজ যে, তাঁহাদের বিজিত রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিবার জন্য মানুষের মনোবৃত্তির মধ্যে অমৃত ঢালিবেন না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। তাঁহারা প্রত্যেক কাজকর্ম্মেই এমন একটী নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, যাহার আবেষ্টনে একবার প্রবেশ করিলে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাদের আড়ম্বরে মুগ্ধ না হইয়া পারিবে না। অবশ্য তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে যে তাঁহারা সকল সাধনা আপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়। এই জাতির বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমার যেরূপ শ্রদ্ধা হইল তেমনি দেশবাসীর দাস-মনোবৃত্তির উপর ঘৃণার ঢেউ ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল।

এই প্রকারের আন্দোলনে আমার মন বিষাদসাগরে ডুবিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফেলুদার শান্ত সুন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া আমার সমস্ত বিদ্বেষ-বিরোধের ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। ফেলুদা আমাকে বলিয়াছিল, ঈশ্বরের দিক থেকে বিচার ক'রে দেখো সব জাতিই এক। ভাইয়ের প্রতি যেমন তোমার কোন অভিমান নাই, কোন জাতির প্রতিও তোমার, তেমনি কোন বিদ্বেষ নাই। মানুষ যখন ভগবানকে রাজা স্বীকার ক'রে জগতের কল্যাণে আত্মদান করবে, তখনই মানুষ সকল অশান্তির হাত এড়াতে পারবে—সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে, স্বার্থের ঠেলাঠেলি গিয়ে, একজাত অপর জাতের বাহু বেষ্টন

করে অগ্রসর হ'বে। এই আদর্শ ঠিক রেখে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করতে চেষ্টা করবে আবার তোমার জন্মগত দাবী 'স্বাধীনতার' জন্যও অকাতরে দেহপাত করবে। এই পথ থেকে এক পা হেলতে যা'বে যখন তখনই, জেতা-বিজেতা বিবাদ, রাজা-প্রজায় শত্রুতা, প্রভু দাস সম্বন্ধ এসে তোমার সকল মহৎ অনুষ্ঠান ব্যর্থ করে যে, শুধু তোমার স্বাধীনতার পথ বন্ধ করবে তা নয়, মানুষের উপর মানুষের যে আধিপত্যের কোন অধিকার নেই একথা জগত মেনে নেবে না, আর যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ এই ধ্রুব সত্য অনুভব করতে না পারবে ততদিন এইরূপ অন্ধকারে লড়াই ক'রে মরতে হবে। এই জন্যেই বলি হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম, স্বার্থান্বেষণের পরিবর্ত্তে ত্যাগ-যজ্ঞে আত্মাহুতিই শ্রেষ্ঠ পন্থা।'

ফেলুদার কথাগুলি আমার মনের মধ্যে অনাবিল অভিনব আনন্দ লইয়া, আমার সমস্ত বিপর্য্যস্ত অন্তরের উপর, প্রেমের আলোকে মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। এই প্রেম এই ত্যাগ এই অলৌকিক মহাপ্রাণতা যেন আমাকে খানিকক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিয়া, সমস্ত বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে শান্তিসমালোকিত গুহাভিমুখে ফিরাইয়া আনিল। ফেলুদা আরও বলিয়াছিল, "আমি যদি কাহারও কাছে আত্মবিক্রয়ের জন্য না যাই তবে কাহারও সাধ্য নাই যে জোর ক'রে আমাকে নিয়ে যায়; এজন্য যেখানে আত্মসম্মান বজায় থাকে না সেস্থানে আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন, যেন শত দুঃখ নির্য্যাতনের মধ্যেও না হয়।"

কথাটা যে কতদূর সত্য, তাহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই কিন্তু আজ যেন তাহা, নানারূপ ডালপালা পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া

আমার কাছে বিরাট মহীরূহের মত, আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হইয়া দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিয়া দিল। আমার মনের সমস্ত ধারণা, এক নিমেষে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আমি যে স্কুলে পড়িয়া এই দাস মনোবৃত্তির পরিপোষণে নিযুক্ত আছি তাহার তো কোনই প্রয়োজন নাই; জ্ঞানের পিপাসা মিটাইবার জন্য আমার দেশের গ্রন্থাবলীই যথেষ্ট। সুতরাং আমি স্কুলে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া বড়দার নিকটে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার জন্য মন ঠিক করিয়া লইলাম। সকলেই আমার এই অদ্ভুত আকস্মিক আচরণে আমার মস্তক বিকৃতির কারণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাকে উপদেশ আদেশে নাকাল করিবার উপক্রম করিল কিন্তু আমার মন আর স্কুলে যাইতে সায় দিল না।

১৪

যে কথা সেই কাজ। বাড়ীতে বসিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করিবার জন্য তারস্বরে চীৎকার করিয়া পাড়া গরম করিলাম। কিন্তু আমার এই একাগ্র পরিশ্রমটার উপরও যে প্রতিকূল মন্তব্যসমূহ আসিয়া উৎপাতের সৃষ্টি করিবে তাহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের মধ্যে আমার এই শাস্ত্র-পিপাসা যে সমাদৃত হইবে এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলাম কিন্তু সংসারের সমস্তই আমার মনের মত নয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া, গ্রামের সকলেই আমার ভবিষ্যৎ অকর্ম্মণ্যতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইংরাজী লেখা পড়া না শিখিলে আজকাল কোন লাইন ধরা যায় না, শুধু সংস্কৃত

পড়িলে আর ভাত মিলিবে না, এই সমস্ত যুক্তিপূর্ণ কথা শুধু বাহিরের লোক কেন, বড়দার মুখ দিয়াও অনর্গল বাহির হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকের গায়েপড়া উপদেশসকল শ্রাবণের ধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতে আমার একটা উপকার এই হইল যে, আমি তাহাদিগকে খুসী করিবার জন্য একটা লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া গ্রামের ছোট লোকদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইলাম। সংসারে ছোটজাতের শুধু গায়ের খাটুনি ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্য্যার কোন উপায়ই নাই। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের অছিস্বরূপে ইহাদের লেখাপড়ার সমস্ত বালাই ঘাড়ে লইয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং তাহারা কোন ধর্ম্মগ্রন্থের অধিকারী তো নয়ই আর, সারাজীবন এই ধর্ম্মমন্দিরে মাথা কুটিয়াও যে শাস্ত্রকথার এক কোণও অধিকার করিতে পারিবে না এ কথাটা, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাণীর মতই তাহারা অবলীলাক্রমে স্বীকার করিত। কিন্তু আমি এই দিক্‌টার কোন যথার্থ যৌক্তিকতা স্বীকার না করিয়া লাইব্রেরীর সঙ্গে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম ও তাহাদিগকে গীতা পড়াইবার ভার গ্রহণ করিয়া গ্রামের মধ্যে একটা ছুঁচোবাজী ছাড়িয়া দিলাম আর আমার সাহিত্যচর্চ্চা পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের দল জোট বাঁধিয়া আমার এই অশাস্ত্রীয় আচরণে আমাকে বর্জ্জিত করিবার জন্য ভীষণ প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, "ছোট জাতের অধিকার নাই" ছাড়া কোন যুক্তি তাহারা দেখাইতে পারিলেন না, অথচ কেন যে অধিকার নেই এই প্রশ্ন করাতে আমাকে সকলেই গো-ব্রাহ্মণ বিরোধী কালাপাহাড়

আখ্যা দানে, আমার সমাজচ্যুতির ভয় দেখাইয়া, বড়দার নিকটে ইহার বিচার প্রার্থণা করিলেন।

আমি বলিলাম, "ব্রাহ্মণের ছেলে সাহেবের চাকরি ক'রেও যদি শাস্ত্রের অধিকারী হয় তবে, চাষা-ভূষোরা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করে কেন বঞ্চিত হ'বে?"

বড়দা বলিলেন, "জন্মভেদেই বামুন কায়েত ভেদ হয়। ছোট জাত হয়ে জন্মানোর মধ্যে কি কোন কারণ নাই বলতে চাও?"

আমি বলিলাম, "ছোট জাত বড় জাত তো মানুষের কাজ কর্ম্ম দিয়েই ঠিক হয়। ব্রাহ্মণ কোনদিন পরের গোলামী করে না, সুদ খায় না, সংসারে বসে মামলা মোকদ্দমা করে না। এসব যারা করে তারাও যদি বামুন হতে পারে তবে তাদের চেয়ে সহস্র গুণে ভাল ছোট জাত—যাদের মনে কোন কুটিলতা নেই, পরের অনিষ্ট চিন্তা নেই, স্বাধীন জীবিকা; তা'রা কেন গুণ থেকেও বামুন হ'তে পারে না?"

"বামুন হ'লে তা'রা বামুনের ঘরে নিশ্চয়ই জন্মাত। তা'রা পূর্ব্ব জন্মে এমন কোন পাপ নিশ্চয়ই করেছে, যে কারণে ছোট ঘরে জন্ম নিয়েছে।"

"তাদের এই পাপ কি কোন কালেই শেষ হবে না?"

"হলে তারাও বামুনের ঘরেই জন্মাবে।"

"সে কবে হবে?"

"কার কখন হবে, তার কি কিছু ঠিক আছে? এজন্মের পাপ পুণ্যই পর জন্মে বিচার হ'বে।"

"তাদের ছেলেপুলে তা'হলে চিরকালই বংশ ধরে এই ভাবে

পতিত হয়েই থাক্‌বে। আর বামুনের ছেলেরা চিরকালই বামুন থাক্‌বে। তা'হলে তো পাপ পুণ্যের কোন দরকারই হয় না। জন্মগত দাবিটাই এখন বিচারের মাপকাটি। কিন্তু এ ভাবে জন্মের উপর বিচারে ছোট জাত কোন কালেই বড় হ'তে পার্‌বে না।"

"পার্‌বে কি না কেউ কি তা বল্‌তে পারে? মরণের পরে কবে কি হয় তা' কি কেউ জানে?"

"কিন্তু ইহজন্মের পাপ পুণ্য যদি মানুষের বর্ণ সৃষ্টি করে তবে ছোট জাত আমাদের চেয়ে শত গুণে ভাল সুতরাং তাদের ছেলেপুলে যা'তে শাস্ত্রের অধিকারী হয় আমি তাই কর্‌বো।"

"সমাজে বসে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর্‌তে পার কিন্তু তার ফল ভোগ কর্‌তে বেশী দিন দেরী হবে না। তোমার য.দ কোন দুরবস্থা হয় তা'হলে এই ছোট জাত কোন দিনই তোমাকে সাহায্য কর্‌তে আস্‌বে না তাও দেখে নিও।"

"দুরবস্থায় পড়লে আমাদের জ্ঞাতি ভাইও কেউ বোধ হয় কোন সাহায্য কর্‌তে আস্‌বে না।"

ইহার বিরুদ্ধে বড়দাদা আরও প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি আমার উদ্ধত আচরণের সম্মুখে নিজেকে হাল্‌কা করিতে চাহিলেন না। বড়দা গম্ভীরপ্রকৃতি অল্পভাষী, তাঁহার উদারতা গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণের তুলনায় অনেক ব্যাপক, এই পরিচয়টা, তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলীর মধ্য দিয়া পূর্ব্বেই আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল। কিন্তু

আজ কেন তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শান্ত আবরণের অন্তরালে, একটা কঠোরতা আমাকে ঘিরিয়া আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। এইটুকুর জন্তে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার সকল কর্ম্ম তিনি নীরবে স্বীকার করিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন একথাটা, আমি আমার অস্তিত্বের মতই বিশ্বাস করিতাম কিন্তু হঠাৎ আমার মধ্যে এই প্রকার দ্বিভাব বিস্তৃত হইলেও, আমি আর তাঁহার সহিত তর্ক না করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

মাস ছয়েক পরে আমার নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কমিতে কমিতে এমন সংখ্যায় আসিয়া দাঁড়াইল যে, তাহাদিগের সংখ্যা গণনা করিতে আমার এক হাতের আঙ্গুলই যথেষ্ট। যাহারা স্কুল ছাড়িয়া গেল তাহাদের সহিত আমার এমন বিসদৃশ সম্বন্ধ সৃষ্ট হইল যে, তাহারা আমাকে মুখ দেখাইতেও লজ্জানুভব করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও আমাকে দেখিতে পাইলে তাহারা মুখ লুকাইয়া প্রস্থান করে; মুখোমুখি পড়িয়া গেলে একটা অদ্ভুত ওজর দেখায় ও তাহাদের স্কুলে আসার বাধা বর্ণনা করিয়া, তাহাদের স্বজাতের কিছু হইবে না, চাষাভূষার লেখাপড়ার প্রয়োজন নাই, এসমস্ত চিরাচরিত যুক্তি প্রদর্শন করিতে একবিন্দুও সঙ্কোচ অনুভব করিত না; সুতরাং আমার মনে ধিক্কার হইতে লাগিল। যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এমনভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ, তাহাদিগের কাছে বিদ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা বিড়ম্বনা মাত্র; ক্ষোভে অপমানে আমার সমস্ত চিত্ত আত্মগ্লানির আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

এই ভাবে আরও ছয় মাস গতে স্কুলের অবশিষ্ট ছাত্র হইতে আরও কয়েকটী সরিয়া পড়িল।

ইহার কিছুদিন পরে মা বলিলেন, "মনু তুই কি এভাবে বসেই থাক্‌বি, যা'হয় একটা চাক্‌রীবাক্‌রী যোগাড় কর। চাক্‌রী না করিস্‌ তো কোন একটা ব্যবসা কর। একটা কিছু তো কর্‌তে হবে? বসে থাক্‌লে অলস হয়ে যাবি, আর কোনদিন কিছু কর্‌তে পার্‌বি না।"

আমি হাঁ না কোন উত্তর দিলাম না। মা আমার দিকে চাহিয়া পুনরায় কাতরস্বরে বলিলেন, "যখন যা ইচ্ছে হবে তাই কর্‌বে? তোমার কি জমিদারী আছে যে যখন যা মনে আস্‌বে তাই কর্‌বে? নিজের পেটের অন্ন যোগাতে পার না আবার এসব ছোট লোকের জন্যে কান্নাকাটি কেন?"

আমার অক্ষমতার ইঙ্গিত মায়ের মুখ হইতে তীরের মত আসিয়া বুকে বিঁধিল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া সর্ব্বশরীরে বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতেছিলাম তাই আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলাম।

ইতিমধ্যে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে রাক্ষসীরূপে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ঘরে ঘরে শয্যাগত রোগীর আর্ত্তনাদ —চারিদিকে চিতানল প্রজ্জলিত, রোগীর শুশ্রূষা করিবার লোক বিরল, তৃষ্ণায় জল দিবার জন্য আর একটি রোগীর সাহায্য লইতে হয়; অথচ গ্রামে ডাক্তার নাই, হাতুড়ে বৈদ্য চিকিৎসা করেন, কিন্তু শতে নিরানব্বইটি রোগী অদৃষ্টের দোষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি মনে মনে ডাক্তারী শিখিবার আশায়

কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। হাজারীবাগ ষ্টেশনে মাসিমার কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কলিকাতায় যেন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উঠি।

কিন্তু বাড়ীতে কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিলাম না; মায়ের উপর একটা রুষ্ট অভিমান স্ফীত হইয়া উঠিল। আমি যে একটী মহান্ আদর্শ সম্মুখে লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি আমার পেটের যোগাড়ের অক্ষমতার কথা বলিয়া আমাকে যেভাবে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহাতে আমার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সংসারে স্নেহের সম্বন্ধ যতক্ষণ দেনা পাওনার পরপারে থাকে ততক্ষণ তাহার তুলনা নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহার মধ্যে স্বার্থের ছায়া পতিত হয় তখনই বুঝি এই বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলাম না বলিয়াই বোধ হয়, একটা সংসারবৈরাগ্য আসিয়া আমাকে মুক্তি লইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাসমাগমে মানুষের ছায়ালোপের ন্যায় আমার ছাত্রকয়টী অন্তর্ধান করিয়া আমাকে শূন্য মাদুরের উপর ঝিমাইবার অবকাশ দিয়া গেল। এই আদি-অন্তহীন চিন্তাসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া কেবলি মনে হইল, এই স্বার্থদুষ্ট সংসারে মানুষ কি শান্তিতে বাস করে,—যেখানে ভাই ভাইকে বিশ্বাস করে না, বন্ধু বন্ধুকে অক্লেশে ত্যাগ করে, কার্য্যক্ষেত্রে মায়ের অশ্রুজল ব্যর্থ হইয়া যায়, এমন সংসারে মানুষ কোন্ মহিমায়, দিন রাত্রি দ্বন্দদ্বেষে মারামারি কাটাকাটি করিয়া আপন স্বত্ব ভোগ করিতে চায়?

ইহার কিছুদিন পরে এক রোগীর শুশ্রূষা করিবার জন্য ডাক

পড়িল। সমস্ত রাত্রি রোগীর শিয়রে কাটাইয়া পরদিন ভোর বেলায় বাড়ী ফিরিয়া বেলা বারোটা পর্য্যন্ত ঘুমাইলাম। অপরাহ্নে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। আমি ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় বসিয়া তেল নুন দিয়া মুড়ি খাইতেছিলাম। মা আমার সম্মুখে বসিয়া বলিলেন, "মনু, তোর বড়দার সঙ্গে পরামর্শ করেছি, সে বলেছে কিছু টাকা দেবে বাড়ীতে বসে কিছু ব্যবসা কর।" আমি মুড়ি মুখে রাখিয়া জড়িতস্বরে বলিলাম, "আমার জন্যে তোমাদের এত ভাব্‌তে হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব।"

"ভাব্‌তে তো হবে না কিন্তু এই চার বচ্ছরের মধ্যে কিছু উদ্যোগ কর্‌বার দিকে তো লক্ষ্য দেখ্‌ছি না। আর রাতে বিকেলে যেখানে সেখানে যাতায়াত কর্‌ছিস। শেষকালে কি ফেলুর মত একটা যা তা ক'রে বস্‌বি? একটা কাজে হাত দিলে পরে, তোর বিয়েটা দেবার ইচ্ছা আছে। যেখানে সেখানে যাওয়া আসা বন্ধ করে দে।"

বলিয়াই মা এমন আতঙ্কিত চক্ষে চাহিলেন যেন তাঁহার মনের সংশয়টি মুখের মধ্যে জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

"অবিশ্বাস তো ফেলুকেও করা যেতনা; এখনও কথাটা বিশ্বাস হয় না তবুও সে একটা বিচ্ছিরি কাজ ক'রে বসেছে। কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে মানুষের মতি গতি স্থির থাকে না। না হয় গিয়ে পড়া আরম্ভ কর!"

মা কথাটা শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন। আমি আস্তে আস্তে মুড়ি খাইয়া বাহির বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু

মায়ের কথাগুলি আমার ভক্তির উপকূলে এমন ভয়াবহ মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপপুণ্য, সমস্ত বিচার বিতর্কের অতীত আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়, ঐ নূতন ছবির সম্মুখে, স্তম্ভিতবেশে সমস্ত বাড়ী ভরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া, স্থির অচঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই বাড়ীর মধ্যে যেখানে নির্ভর করিয়া পা ফেলিব সেখানেই যেন নর্দ্দমার কীট কিলবিল করিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে।

যে সংসারে মাও সন্দেহ করিতে পারিলেন সেখানে থাকা আর অরণ্যে বাস করা এক; সুতরাং তাহার পরে আর বাড়ীতে বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে।

আষাঢ়ের ঘন কৃষ্ণ রাত্রে নৌকার গতি দুরন্ত বাতাসে ঠিক রাখা অসম্ভব তবু লগি ঠেলিয়া ডিঙ্গিখানি আনিয়া কাটোয়ার ঘাটে রাখিয়া কলিকাতার গাড়ী ধরিলাম। আসিবার কালে আমার অনির্দ্দেশ্য যাত্রার ঠিকানা গোপন রাখিয়া, শুধু নৌকাটি ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য এক পত্র বালিশের তলায় রাখিয়া আসিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া মা যে, তাঁহার সমস্ত হতাশার উপরেও আমার অভাবে বুকভাঙ্গা ক্রন্দনে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিবেন তাহাতে কোন সংশয় নাই; তথাপি মন বাঁধিয়া কলিকাতার টিকিট কাটিলাম।

১৫

সমস্ত রাত্রি গাড়ীর ঝাঁকানীর মধ্যে তন্দ্রা ও চিন্তার আবেশ মিশিয়া এমন একটা অবসন্নতা আমার উপরে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, কেমন করিয়া রাত্রি কাটিল তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে এক একটা যেন চিরদিনই জীবন্ত থাকে, যখনই মনে হয় তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি অংশ পর্য্যন্ত মনের মানযন্ত্রে ধরা পড়িয়া যায়। আমার গৃহত্যাগের সহিত ফেলুদার স্মৃতিটা যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশাইয়া আছে। যে লোকটা তাঁহার সকল সাধনলিপ্সা লইয়া গ্রামের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, সে যে কেন করুণা-দিদির কাছে এমনভাবে ধরা দিয়াছে ইহা ধারণা করা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধির সাধ্যাতীত; অথচ ইহাই বোধ হয় প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। নীরস দুর্ভেদ্য প্রাচীরের গায়ে যেখানে বোমা মারিলেও ছিদ্র করা দুঃসাধ্য, সেখানেই যখন একটা বট গাছ গজাইয়া উঠে তখন ইহাকে দেখিয়া অঘটনঘটনকারী কোন মহাশক্তির রসিকতা অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকে না। তাই মনে হয় পৃথিবীর সম্মুখে দিনরাত্রি এই অপূর্ব্ব সৃজনের লীলা দেখিয়াও যা'রা মানুষের দৈনন্দিন কর্ম্মধারাটী এক ছাঁচে ঢালিয়া দিতে চায়, তা'রা ঠিক বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করে। বাঁধা পুকুরের জল যদি একটা ছিদ্র দিয়া হুহু করিয়া

বাহির হইবার জন্য পা'ড় ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহাতে জলের অপরাধ কিছুই নাই বরং যা'রা ইহাকে আটক করিতে যায় তাদের মিথ্যা-প্রীতিটাই নগ্নভাবে ধরা পড়ে। ফেলুদার কাজটা লোকচক্ষুতে ছন্দহীন হইলেও ইহা যে প্রকৃতির সৃষ্টিযন্ত্রের তারে বাঁধা আছে এ কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলাম না।

এই ভাবে ফেলুদার কথাটা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিল। ইহার পরে যখন সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম তখন আমার চিত্তটা যেন বহুদূরের দিক্‌রেখা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এমন ভাবে আকাশকে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই বিরাট নভোমূর্ত্তি যেন মেঘের পাখা মেলিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে এক চন্দ্রাতপের তলে মিলাইয়া রাখিয়াছে; কোথাও কোন ছেদ নাই, কেবল এক অনন্ত মিলনের সুর অনাহত ভাবে বাজিতেছে। আমার সমস্ত অন্তরটা যেন ঐ অন্তহীন ব্যোমের দিকে ধাবিত হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের মধ্যে মিশিয়া আছে। এই উদারতা, এই শান্তি, এই মহত্ত্ব, এই সন্তোষ যেন স্বপ্রতিষ্ঠ, সুবিন্যস্ত; ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, অনুপরমাণুর মধ্যে বিভক্ত হওয়ার মধ্যে শুধু বিচ্ছেদ আছে, অখণ্ড সত্ত্বার সহিত যোগ-ক্ষমতা নাই; অন্তরের মধ্যে এইভাবে ডুব দিয়া আমি ধন্য হইলাম।

কিন্তু এই বিরাটত্ব ধরিয়া রাখা মানুষের পক্ষে কত কঠিন তাহা বুঝিতে বেশীক্ষণ অতীত হইল না। পরক্ষণেই চতুর্দ্দিকে কোলাহলরত যাত্রীর মধ্যে পড়িয়া আমার সমস্ত কথা মনে হইতে লাগিল। অসময়ে গৃহত্যাগ করার মধ্যে যে কারণটা আমাকে খোঁচাইতে লাগিল তাহার ফাঁকে মায়ের সন্দেহদৃষ্টিটা জাগিয়া

উঠিয়া আমাকে ব্যথাবিষ্ট করিয়া তুলিল। মায়ের উপর অভিমান করাতে পুত্রের কোন অপরাধ হয় না, কিন্তু মাকে অহিতকামা মনে করিয়া আমি যে পাপ করিয়াছি তাহা মুছিয়া ফেলিবার কোন উপায় দেখি না। ছেলেবেলায় একদিন দুধ খাওয়াইতে বসিয়া মা আমাকে একটা চড় মারিয়াছিলেন বলিয়া আমি দুধের বাটিটা মায়ের কপালের উপরে ছুঁড়িয়াছিলাম; ইহাতে মায়ের কপাল ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল। মা তাড়াতাড়ি কপালে ভিজা গামছা বাঁধিয়া পুনরায় দুধের বাটি আনিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সময়কার চোখের জলের মধ্যে যে স্নেহের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা যেন পুড়িয়া গিয়াছিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম মায়ের উপর আর রাগ করিব না। মায়ের সেই ঘা শুকাইতে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়াছিল; কিন্তু এই দুই মাস আমার দিন রাত্রি যে অশান্তি উদ্বেগের মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল তাহার বেদনাটা যেন আমার সর্ব্ব শরীরে নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিল। অথচ এই সর্ব্বংসহা জননীর বুদ্ধিভ্রমের কল্পনা করিয়া আজ আমি তাহার পদতল ত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু মনে হয় আমার এই দুর্ভাগ্যের সময়ে মায়ের কোলে বসিয়া তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণা বহন করা সাধ্যাতীত। কাজেই পুনঃপুনঃ মনটা কাঁদিতে থাকিলেও আর ফিরিবার মত প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিত্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। আমার মাও তো সংসারে একজন মানুষ, তাঁহার সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা অন্যান্য মানুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নাই। আমি তাঁহাকে

শুধু স্বর্গের দেবী কল্পনা করিয়া তাঁহার মানবত্বের একটুকু দুর্ব্বলতার উপর অবিচার করিয়াছি বলিয়া অনুশোচনার তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। একান্নবর্ত্তী পরিবারে বেকার যুবকের প্রতি কাহারও সহানুভূতি থাকিতে পারে না কিন্তু তাই বলিয়া কি মায়েরও নাই? মা যে, আমাকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্যই এই ভাবে আঁতে ঘা দিয়াছেন তাহা কেন বুঝিলাম না!

এমন সময় আমাদের গাড়ীর মধ্যে পশ্চাত দিকে যেখানে কয়েকটী ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন সে দিক হইতে কোলাহল শুনিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে, আপাততঃ মায়ের কথা চাপা পড়িয়া গেল। কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া স্তম্ভিত চক্ষে একটা তাঁতীর সহিত ব্রাহ্মণদের বচসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাত্ত্বিক শরীরের বিকৃত সঞ্চালন দেখিতে লাগিলাম। দোষের মধ্যে এই যে, লোকটা তাঁহাদের পার্শ্বে বিছানা পাতিয়াছিল কিন্তু একটা কাপড়ের ছেঁড়া পাড় তাঁহাদিগের বিছানার সহিত লাগিয়া আছে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা সকলেই তাহাকে ছাতি লাঠি তুলিয়া, তাহার মাথা খ্যাসারী ডালে পরিণত করিয়া ফেলিবেন বলিয়া শাসাইতেছিলেন। লোকটা বলিল, "আপনাদের পায়ের তলায় যে মুসলমানটী ঘুমিয়ে আছে তার বিছানার একটা কোণও তো আপনাদের বিছানায় লেগে আছে! আমার এটা না হয় গুটিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু ওই কোণটা কি আপনার বিছানায় লেগে নাই?"

একজন যজ্ঞোপবীতধারী, নিদ্রিত মুসলমানটার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ও এখন ঘুমোচ্ছে না হ'লে ওকেও আচ্ছা করে জব্দ কর্‌তাম!"

—লোকটি বলিল, "তা হ'লে ওটাও সরিয়ে দিন!"

—ব্রাহ্মণটি চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ব্যাটার আক্কেল দেখ না, আমি কি ওটা ছুঁয়ে আমার জাত হারাব নাকি, আহাম্মুক!"

লোকটার সাহস দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সে পুনরায় বলিল, "আপনি ছুঁ'লেই জাত যাবে! কিন্তু ওটা যে আপনার বিছানাটা ছুঁয়ে আছে তাতেই বা আপনার জাতটা থাক্‌লো কোথায়?"

ব্রাহ্মণ তিনটী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ব্যাটার আবার জাতের বিচার, আঁচালে মুখের ভাত যায় না! আমরা হ'লাম নৈকস্য কুলীন, আমাদের জাত নেই কি তোর বাবার আছে, চুপ কর হারামজাদা", বলিয়া তাঁহারা তিন জনেই একসঙ্গে বেতের লাঠি তুলিলেন। সেই লোকটার মুখ পাংশুটে হইয়া গেল, সে পশ্চাতে হটিয়া চুপ করিয়া করুণ নেত্রে চাহিয়া বোধ হয় কৌলিন্যের মহিমা পরিমাপ করিতে লাগিল। একদল মুসলমান ব্রাহ্মণদের আস্ফালন ও তাঁহাদের ছোঁয়াছুঁয়ির অপূর্ব্ব যুক্তি দেখিয়া বোধ হয় ঐ বিছানার কোণ্‌টার সংযোগস্থল লক্ষ্য করিল ও তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের আপোষ হইয়া গেল বলিয়া গর্ব্বের হাসিতে মুখখানা প্রফুল্ল করিয়া সহানুভূতির চক্ষে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু যে লোকটার প্রতি তাঁহারা এই জাত্যাভিমানের পবিত্র ক্রোধ উজাড় করিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কাছে গিয়া আমি জানিতে পারিলাম, সে তাঁতি, কাপড় বুনে খায়, দাঁতের চিকিৎসার জন্যে কলিকাতায় যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজে কোন কালেই তাহাদের জল চল্‌ নহে।

কিন্তু তবুও সে হিন্দু বলিয়া গর্ব্বানুভব করে। অথচ যে ব্রাহ্মণ, মুসলমানকে ম্লেচ্ছ মুরগীখাদক বলিয়া ছায়া মাড়াইলে স্নান করিয়া ঘরে আসে, তাঁহারাই, মুসলমানের বিছানার কোণ্‌টা তাঁহাদের বিছানা হইতে জাতি মরিবার ভয়ে সরাইতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রকারান্তরে যে তাঁহারা এই বিছানাটার উপরেই বসিয়া একটা নিরীহ লোকের প্রতি, যে নাকি তাঁহাদের সন্মান করে শ্রদ্ধা করে, তাহার উপর কৌলিন্য প্রচার করিবার জন্য ইতরতা প্রদর্শন করিতে একবিন্দুও সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। ইহা দেখিয়া যে কোন লোকের ব্রাহ্মণ-ভক্তি যে তৎক্ষণাৎ শিকায় উঠিয়া যাইবে তাহা কি কোন মানুষ অস্বীকার করিতে পারে? যা' হো'ক বিষয়টা এখানেই চাপা পড়িয়া গেল; কিন্তু মুসলমানরা জাগিয়া বিছানার উপরে সানকী পাতিয়া যখন আহার করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ-শক্তির অপার মহিমার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না, তখন একটি ব্রাহ্মণ বিছানা ঝাড়িবার অজুহাতে তাহার দিকটা গুটাইয়া জাতি রক্ষা করিলেন।

এই প্রকার নানা গোলমালের মধ্যে ট্রেনখানা হাওড়ার ষ্টেশনে আসিবামাত্র আমি যেন সদ্য মায়ের পেট হইতে বাহির হইয়া অবাক হইলাম। একদল কুলি ঠেলাঠেলি করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইল। আমি প্রথমটা থতমত খাইয়া মনে করিলাম বুঝি লুট করিবার জন্য ডাকাতের দল আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার বেতের বাক্সটার উপরে বসিয়া, যদি কেহ টানাটানি করে এই ভয়ে আস্তিন গুটাইয়া রহিলাম। কিন্তু ভয়ের সমস্ত কারণ দূর করিয়া দিয়া সেই বর্গীর দল চলিয়া গেল। পার্ব্বত্য

নদীর উপর বর্ষাকালীন অদম্য জল স্রোত দেখিলে যেমন লোকে বন্যার ভয়ে ভীত হইয়া থাকে অথচ নদীর কানায় কানায় জল উঠিয়াই তাহার গোলা নামিয়া যায়, সেইরূপ প্রচণ্ড বিক্রমে যাহারা আসিয়াছিল মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা দিগ্বিজয়ীর ন্যায় ফিরিয়া গেল। আমি আবার নামিয়া সতরঞ্চিখানা পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর ওই উন্মত্ত সৈনিক দল হুড় মুড় করিয়া আসিয়া পুনরায় কামরায় ঢুকিয়াই কয়েকটা মোট আঁকড়াইয়া ধরিল ও যাত্রীর নিকটে দুই টাকা হাঁকিয়া সকলেরই পিলে চমকাইয়া তুলিল। আমি কেবলি ভাবিলাম মানুষ সামান্য উপার্জ্জনের জন্য এত দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাইতেছে কেন? কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য গাড়ীতে উঠিয়াই পার্শ্বোপবিষ্ট একটী ভদ্রলোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে মানুষকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে গেলে এইরূপ ভাবেই মারামারি করিতে হয়। বাঙ্গালা দেশের লোক অত্যন্ত অলস কিন্তু অন্যান্য জাত এই কারণেই বাঙ্গালার বুকে বসিয়া লোটাকম্বল সম্বল করিয়া শুধু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে কাড়াকাড়ি করিয়া টাকা লুটিয়া লইতেছে; আর বাঙ্গালী তার চাকুরী লইয়া ব্যস্ত, বাবুয়ানার গায়ে ফুঁ দিয়া চলে, কাপড় জামায় বাবু হইয়া দিনদিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি! ভদ্রলোকটী এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া আমাকে পাড়াগাঁয়ের লোক বুঝিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ের লোক এখনও এত বাবু হয় নাই; খেটে খুটে যা আনে তাই দিয়ে তাদের দিন গুজরান বেশ ভাল ভাবেই চলে এই জন্তেই আমরা সহরে লোক এখনও ভাত পাই। তবু যদি তা'রা পাটের চাষটা ছেড়ে কাঁচা পয়সায় মোহ দূর কর্‌তে পার্‌ত তা' হলে

আবার সোণার বাংলায় সত্যি সত্যি সোণা ফল্‌তো।” বলিয়া তিনি চুপ করিলেন। আমি তাঁহার কথাগুলি তখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি নাই সত্য বটে কিন্তু পরে আমি দেখিয়াছি যে তাঁহার কথাগুলি একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

ষ্টেশনের লোকজনের জীবনসংগ্রাম এইরূপ অদম্য দেখিয়া আমার মন দমিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অবশেষে একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া শোভাবাজারে মাসিমার বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

ষ্টেশন ছাড়িয়া আমার ছ্যাঁকড়া গাড়ী যখন হাওড়া সেতুর উপর পৌছিল তখন কিছুক্ষণ উত্তাল তরঙ্গাবলীর শুভ্র সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এই ভাগীরথী এখন যেভাবে শান্ত-মহিমায় অতিক্রমনীয়, তাঁহার ভীষণ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মুর্ত্তি দেখিয়া কি এই অসংখ্য জনবাহিনী সেতুটা ডুবিয়া যাইবে? না সে এই তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার প্রাক্‌কালেও কাঁপিয়া কাঁপিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দর মাতৃবক্ষে বাঁচিবার আশায় জুঝিতে থাকিবে, ডুবিয়া গেলেও সে নিশ্চয়ই হঠাৎ উঠিবে না; আমারও উচিত ছিল মায়ের সম্মুখে সংসারের শ্রেষ্ট বন্ধন মাতৃবক্ষে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রকার অনুশোচনা ও আত্মধিক্কারের মধ্যে আমার এই যাত্রাটার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুই চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মনে পড়িয়া গেল গৃহত্যাগের সময় একটা ‘বৌকথাকও’ পাখী আমাদের কাঁটাল গাছটার উপর বসিয়া আমাকে যেন চিরবিচ্ছেদানলের ইঙ্গিত দিয়া চুপ করিয়াছিল; তাহার সেই সুরের সমস্ত বেদনা আসিয়া আমার বুকের

সমস্ত শূন্য কক্ষ অধিকার করিয়া আমাকে কাতর করিয়া তুলিল; কথাটাকে নানাভাবে নানাভাষায় মনের মধ্যে শান্ত করিবার সহস্র চেষ্টাও বিফল হইয়া যাইতে লাগিল। রাজপথের উল্টাপাল্টা গাড়ী ঘোড়ার মত, আমার সমস্ত রক্ত চপল নৃত্যে দাপাদাপি করিতেছিল, তাহারই সমস্ত সংগ্রাম, জীবনসংগ্রামের পূর্ব্বাভাস বুঝিয়া, মাসিমার বাড়ীতে ক্ষণিক বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হইয়া চলিলাম।

১৬

মেসো মশায়ের বাড়ীর লোহার বেড়া পার হইয়াই আমার চেয়ে ছোট একটী ছেলেকে পাইয়া জানিতে পারিলাম যে সে এই বাড়ীর সরকার; তাহাকে দিয়া উপরে খবর পাঠাইতেই বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া মাসিমা আমাকে উপরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। আমি সিঁড়ি বাহিয়া লম্বা হল ঘরটী পার হইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলাম। মাসিমা মেঝের উপর বসিয়া বলিলেন, "বাবা, এতদিনেও কি একখানা চিঠিও দিতে নাই, আগে জান্‌লে তো ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যেত, তোমার বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছে?"

উত্তর দিতে গিয়া আশ্চর্য্য চক্ষে তাঁহার কপালে নাকে মাটির ত্রিপুণ্ড্রক এবং গলায় এক গাছা কণ্ঠির হার বিলম্বিত দেখিয়া তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলাম, "মেসোমশায় কোথায় মাসিমা!"

"তিনি বোধ হয় এখনও ফেরেননি। কলেজ স্কোয়ারে ডাক্তার-দের একটা বাৎসরিক সভায় গেছেন", বলিয়া মাসিমা দেওয়ালের

বড় ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আস্‌বেন। তোমার হাত পা ধুয়ে নাও,—সমস্ত দিন বোধ হয় খাওয়া হয়নি, যা' হো'ক আগে একটু জিরিয়ে নাও"।

কিছুক্ষণ পর পাখার সুইচটা টিপিয়া মাসিমা সরকার অবনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওকে কল ঘরটা দেখিয়ে দাও তো অবনী।"

আমি জামাটা খুলিয়া জুতাটা এক পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া দিলাম ও অবনীর অনুসরণ করিয়া কলঘরে যথাকর্ত্তব্য শেষ করিয়া মাসিমার সহিত খাবার ঘরে গিয়া একটা পাতা পিঁড়িতে বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুর অন্নব্যঞ্জন আনিয়া পরিবেশন করিল। মাসিমা সুমুখে বসিয়া আদর করাতে একটু বেশী পরিমাণেই খাইয়া ফেলিলাম। আমার জন্য একটা ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে এবং পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রায় ঘুমটা একান্ত দরকার হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মেসোমশায় না আসা পর্য্যন্ত, মাসিমার সঙ্গে বসিয়া তাঁহাদের পারিবারিক কথা, আমাদের কথা লইয়া অনেক আলাপ আলোচনার পরে মোসোমশায় ফিরিয়া আসিলেন। মেসোমশায় প্রসন্ন মুখে নানা প্রশ্নোত্তরে আদর আপ্যায়নে আমাকে তৃপ্ত করিয়া ঘুমাইবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি হাত পা ছড়াইয়া চীৎপাত হইয়া রাস্তার মোটরের শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিবস হইতে আমিও এ বাড়ীর একজন কর্ত্তাব্যক্তির মত ব্যবহার পাইতে লাগিলাম। সরকার অবনীকে "অবনী" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম, সেও যথাসাধ্য প্রয়োজন অপ্রয়োজনে যেমন আমায় মন যোগাইতে ব্যস্ততা প্রকাশ করিল, তালপাতার সেপাই

হইয়াও ঠাকুর ভীম তাহার আভিজাত্য প্রচার করিয়া আমার মুখে হাসি বাহির না করিয়া ছাড়িল না। সাহেবীকেতায় অভ্যস্ত মেদিনীপুর নিবাসী ভৃত্য মহেন্দ্রও ইদানীং মাঠাকুরাণীর অতি বৈষ্ণবী—আচার-ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, আবার প্রাণ খুলিয়া আমার প্রশংসা করিয়া আমাকে হাত করিবার চেষ্টা করিল। মাসিমার প্রতি তাহার আক্রোশের যে কারণটা আমি আবিষ্কার করিলাম তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পাঠকবর্গকে দিলেই মাসিমার সাংসারিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসটুকু জানা যাইবে।

মেসোমহাশয়ের পিতা ৺পূর্ণেন্দু সিংহ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সওদাগরী আপিসে মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বেশ দু' পয়সা কামাইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে মেসোমহাশয়ের চাকুরি হয়, তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া সিভিলসার্জ্জেনী পরীক্ষা পাশ করাইতে যেমন মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তেমনি বর্দ্ধমানের এক উকিলের মেয়ের সহিত খুব ঘটা করিয়া তাঁহার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বনিয়াদী ঘর বলিয়া তাঁহারা হাটখোলাতেই প্রকাণ্ড দুইতলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, দরদালান, সদর, অন্দর, বৈঠকখানা, আপিসঘর প্রভৃতি দ্বারা বাড়ীটাকে বিভক্ত করিয়া সম্মুখে একটা ছোট খাট বাগান, লোহার বেড়া দিয়া ঘেরাও করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে মেসোমশায় চাকুরী উপলক্ষে মফঃস্বলে থাকিতেন বলিয়া বাগানের লতা, গুল্ম, ফুলের গাছ, যত্নাভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পেন্সেন্ লইয়া আসার পর হইতে মেসোমশায় বাগানটাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহার গাড়ীর রাস্তায় একটী বৃত্ত তৈয়ার করিয়া মধ্যস্থলে

কয়েকটী সুদৃশ্য বিলাতি ফুলের চারা পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। বিলাত ফেরত মেসোমশায় ঢাকায় অবস্থানকালে বিলাতী আচার ব্যবহারে এত অধিক আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এই বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া বালীগঞ্জে বাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য জায়গা খরিদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই পুরাতন বাড়ীটাকে দালালের অধীনে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মাসিমা তাঁহার এই সঙ্কল্পের সম্মুখে অচল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকিয়া ও পৈতৃক ভিটার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তর্কে বিতর্কে ঝকড়াঝাঁটিতে, মেশোমহাশয়কে এই পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। পারিবারিক কলহে সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের জয় সুতরাং এস্থলে মাসিমা বিজয়লক্ষ্মীর অঙ্কে স্থান লাভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের একমাত্র পুত্র বিমলেন্দু যখন পিতার একান্ত বাধ্য হইয়া, হুবাহু সাহেবী ছাঁটে তাহার মায়ের সকল সংস্কার ভাঙ্গিয়া বালীগঞ্জের বাড়ীর দিকে কাঁটা ঘুরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তখনই, মাসিমা ও মেসোমহাশয়ের সকল দ্বন্দ, তাঁহাদের দেশী বিলাতীর সকল সংস্কার, আমূল কাটিয়া সে ইহধাম হইতে অকালে স্বর্গে চলিয়া গেল! সেই হইতে পুত্রবিয়োগাহত মাতা, অত্যধিক ঈশ্বরভক্তির প্রভাবে, বৈষ্ণবের ধর্ম্মাচার পালন করিবার জন্য নবদ্বীপের এক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কুঁড়োজালি হইতে রসকলির বাহুল্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মেসোমহাশয় ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না এমন কি সে বিষয়ে মতামত দেওয়ারও কোন প্রয়োজন মনে না করিয়া তাহার শোক-সন্তপ্ত মনটাকে

দেশের কাজে আবদ্ধ রাখিবার জন্ম সভাসমিতি ও বক্তৃতায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাদের বিলাতী আচার যখন পুরামাত্রায় চলিয়াছিল তখন হইতে ভৃত্য মহেন্দ্র সাহেবী অনুকরণে অভ্যস্ত। সুতরাং তাহার পক্ষে মাসিমার অত্যধিক নিয়ম সংযম বারব্রত, তিথিনক্ষত্রের প্রতি মর্য্যাদাটা বাহুল্য প্রতীত হইতেছিল। তবে মাসিমার সদাহাস্যময়ী মূর্ত্তির কাছে তাহার এ বিক্ষোভ, বেত্রাহত ছাত্রের মত নির্ব্বাকভাবে থাকিয়া ও ভিতরে ভিতরে খাল কাটিয়া আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা করিতেছিল, তাই আমাকে দেখিয়া সে এত অল্পসময়েই তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহিল। কিন্তু আমার নিকট হইতে হাঁ না কোন উত্তর না পাইয়াও সে বেশ সন্তুষ্ট হইল বুঝিলাম।

অবনী ছেলেটা বেশ সরল সুচতুর অথচ বিনয়ী। তাহার মুখের মধ্যে দারিদ্র্যের একটা স্বচ্ছ ছাপ, এমনিভাবে করুণার প্রত্যাশী হইয়া চাহিয়া থাকিত যে, তাহা দেখিলে যে কোন লোকের তাহাকে স্নেহ করিবার ইচ্ছা হইত। সে অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে তাহার রসিকতা-গুণের কাছে আত্মসমর্পণ করাইল। তাহার শত অভাব অনাটনের স্পষ্ট ছায়ার উপরেও তাহার জিহ্বা এমন সব রসাল কথার অবতারণা করিত যাহা আমাকে সহজেই তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার সকল দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলিবার মত ভাগ্যবান লোক আমাকেই কেন সে ঠিক করিয়া লইয়াছিল তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সে যখন আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিয়া আমার তুচ্ছ সুখ-সুবিধার

প্রতি খরদৃষ্টি দিতে লাগিল তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, ইহা তাহারই সরলতার ফল।

কয়েকদিন পর মাসিমা সহরের অন্ত প্রান্তে রামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলেন; মেসোমশায় নীচে এক ডাক্তার-বন্ধুকে লইয়া গল্পগুজব চা পানে ব্যস্ত। আমি আমার ঘরখানিতে বসিয়া, কতকগুলি মাসিকপত্রের আপিস হইতে প্রত্যাগত আমার কয়েকটী প্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে সম্পাদকের দুঃখপ্রকাশক পত্র পাঠ করিতেছিলাম। আমার রচনা ভাল, লিখনভঙ্গী সহজ, কালে আমার লেখা লোকসমাজে আদৃত হইবে ইত্যাদি লিখিয়া সর্ব্বশেষে লিখিয়াছে যে, এই প্রবন্ধটার মধ্যে এখনও কাঁচা হাতের যথেষ্ট ছাপ রহিয়াছে, লেখাগুলি লিখিয়াই সম্পাদকের দপ্তরে না পাঠাইয়া, বৎসরান্তে তাহা সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠাইলে কোন দোষ থাকিবে না; এবং কাহার পুস্তকে এই জাতীয় প্রবন্ধ আছে, তাহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিব,—ইত্যাদিপ্রকার উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া ও সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া বিনীতভাবে ক্রটী স্বীকার-পূর্ব্বক আমার প্রবন্ধাবলী ফেরৎ পাঠাইতে অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন। আমি সম্পাদকের লম্বা ফিরিস্তি পাঠ করিয়া হাসিব কি কাঁদিব তাহা তখনও স্থির করিতে পারি নাই, কিন্তু আমি প্রবন্ধগুলি দেশলাই জ্বালিয়া অগ্নিগর্ভে বিশুদ্ধ হইবার অবকাশ দিলাম, ও মনে মনে ভাবিলাম, লেখাপড়া ছাড়িয়া তরিতরকারি বা মাছ বিক্রয় করিয়াই জীবনের গতি স্থির করিব, এমন সময় অবনী একখানা পোষ্টকার্ড হাতে লইয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার পত্রখানা লিখে দিন।"

আমি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। এত বড় ছেলে চিঠি লিখিতে অপরকে অনুরোধ করে? সে আমার মনের কথাটা টের পাইয়া বলিল, "আমার হাতের লেখা ভাল নয়। বাবার কাছে চিঠি লিখ্‌ব। আপনি লিখে দিন যে, আমি এখন বাড়ী যেতে পার্‌ব না, রাঙ্গাদার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'লে, আপনিই আস্‌বেন; আমি কয়েকদিন গিয়ে তাঁর দেখা পাইনি।"

বলিয়াই আমাকে চিন্তার কোন অবকাশ না দিয়া, কার্ডখানি দোয়াতদানির সুমুখে রাখিয়া দিল; আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া পত্রখানি ঠিকানাসমেত লিখিয়া তাহার সাম্‌নে রাখিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলাম। বাঙ্গালীর ঘরের আঠার উনিশ বছরের ছেলে, বাঙ্গালায় চিঠি লিখিতে হাতের লেখার দোহাই পাড়ে কেন? বিশেষতঃ কলিকাতা সহরের পক্ষে ইহা কলঙ্কস্বরূপ। আমার এই নীরব অসহায় অবস্থাটা অনুভব করিয়া অবনী বলিল, "দাদা, আপনার কাছে বল্‌তে লজ্জা নেই,—আমার বিদ্যে এইট্‌থ্ ক্লাশ অব্দি। শুধু জমা খরচটা লিখ্‌তে পারি। ইংরাজী ফাষ্টবুকটা কোন মতে ধার ধোর করে শিখেছিলাম—তারপরেই ইস্তফা।"

আমি মাথাটা হেলাইয়া চেয়ারে পিঠ রাখিয়া বলিলাম, "লেখাপড়া শিখ্‌লে না কেন?"

"সে অনেক কথা দাদা? আমাদের মত দুর্ভাগার কথা কি কেউ শোনে?" বলিয়াই অবনী তাহার জামার হাতায় চোখটা মুছিয়া কহিল, "দাদা এই সংসারে শুনেছি, অনেক দয়ালু ধনী আছেন, এই সহরেও অনেকেই আছেন। গো মহিষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেও নাকি একটা কোম্পানী আছে, কিন্তু আমি যখন দেশের

ম্যালেরিয়া নিয়ে কলকাতার ফুটপাথে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় একটুকু সাহায্যের আশায়, পথিকের করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম তখন আমার মত দরিদ্রের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেই কোন মহৎ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাইনি, কাজেই লেখাপড়ার জন্য যে আমার প্রতি কা'রও লক্ষ্য থাক্‌বে না এটা আমি বেশ বুঝেছিলাম। হুগলী জেলার বৈদ্যবাটি গ্রামে আমার বাড়ী, বাবা চাক্‌রী কর্‌তেন কাঁকনাড়া চট কলে। চল্লিশ টাকা বেতনে সুরু করে আশীটাকা পর্য্যন্ত মাইনে পেয়ে, তিনি এক কলমে ত্রিশটী বছর কাটিয়েছেন, এখন বাতে পঙ্গু হয়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন তাই চাক্‌রী কর্‌তে পারেন না; কাঁকনাড়াতেই কোন মতে চেয়েচিন্তে দিন কাটাচ্ছেন। বৈদ্যবাটিতে আমাদের কয়েক বিঘা জমি ছিল,—তা বিক্রয় করে বাবা আমার ছয়টী বোনের বিয়ে দিয়েছেন, আর যা নগদ টাকা মাহিনা পেতেন তাতে আমাদের পাঁচ ভায়ের খাওয়া-পরার খরচ জুগিয়ে অবশিষ্ট কিছুই থাক্‌ত না; কাজেই আমাদের লেখাপড়া সকলেরই এইট্‌থ্ ক্লাস, সিক্স্‌থ্ ক্লাস অব্দি হয়েছে। তবে রাঙ্গাদা আমাদের মধ্যে একটু অধিক বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী। তিনি বাল্যকাল হ'তেই গৃহত্যাগ ক'রে এসে কলকাতায় দর্জ্জিহাটার টাক্‌শালে ছ' পয়সা রোজে কাজ কর্‌তেন; কিন্তু পরে যখন তাঁর দৈনিক আয় দশ পয়সায় উঠ্‌ল, তখনই টাকা গিলে ফেলার দায়ে পড়ে চাক্‌রী তো গেলই, পুলিশের লোকে তাঁকে রেড়ীর তেল খাইয়ে টাকা বার ক'রে, তার জন্য ছয় মাস জেল ব্যবস্থা করে দিলেন। হয় তো কিছু টাকা খরচ কর্‌তে পার্‌লে তাঁর জেল হ'ত না। কিন্তু তখন বাবা সর্ব্বস্বান্ত,—কে টাকা দেয়! জেল থেকে

বেরিয়ে এসে, তাঁর চালাকি বুদ্ধির জোরে তিনি বড়বাজারে এক বেনিয়ানের কাছে খাতাপত্র লেখার কাজ নিয়েছিলেন। তা'দের স্থতোর কারবার বিলাতের আপিসের সঙ্গে যোগ ছিল। দাদা আস্তে আস্তে বেনিয়ানের কারবারের জরুরী চিঠিপত্র পাঠ ক'রে, ব্যবসার সমস্ত রহস্য বুঝে নিয়েছিলেন। এই ভাবে একদিকে যেমন তিনি বেনিয়ানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠ্‌লেন, অপর দিকে তাঁর দুর্ব্বুদ্ধি তাঁকে নষ্টামির দিকে নিয়ে গেল। মালিকের চেক বই তাঁর কাছেই দেরাজের মধ্যে থাক্‌ত। তিনি যে মেসে থাক্‌তেন সেই ঠিকানায় নিজের নামে এক চালান স্থতোর অর্ডার দিলেন। কিন্তু আগাম দেওয়ার টাকা পাবেন কোথায়? বেনিয়ানের চেক বইটাতে জাল সই দিয়ে একখানা সাত হাজার টাকার চেক, ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাতে গিয়ে সই মিল্‌ল না, অবশেষে যতদূর নাজেহাল হ'বার তাতো হ'লই, পুরো একটা বৎসর সশ্রম কারাভোগ ক'রে তবে নিষ্কৃতি। যা'হোক তবু তিনি দম্‌বার ছেলে নন্‌, তিনি পুনরায় জেল থেকে এসেই বাগবাজারে পাটের দালালী কর্‌তে লেগে গেলেন। ঐ যে বল্‌লাম, উদ্যোগী কর্ম্মঠ, কথাবার্ত্তায় কেথাদুরস্ত, এই সব গুণে, এখানেও বেশ দু' পয়সা রোজগার কর্‌তেন; কিন্তু এখান থেকেই তাঁর কতকগুলি বদ অভ্যাস, কাঁচা পয়সা এলে যা হয়, এসে জুটলো। তিনিতো কোন কালেই বাড়ীর দিকে বেশী ঘেসেন নাই, তা যাক্‌, তবু আমাদের আশা ছিল,—যদি রোজগার কর্‌তে পারেন তা'হলে কালে আমরাও এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পাব, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ! তিনি তখন থেকেই মদ ধর্‌লেন, মেয়েমানুষ রাখলেন, কলকাতার বাজারে

কাপ্তেন নাম কেনবার জন্যে জলের মত টাকা ছড়িয়ে যেতে লাগ্‌লেন, কিন্তু এ পথে খরচের তো শেষ নাই? কয়েকদিনের মধ্যে সঞ্চিত টাকা সব উড়ে গেল, তারপরে আবার তাঁর সাবেক স্বভাব চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। মফঃস্বলে পাট কেনবার জন্য কোম্পানী চার হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে পাঠালেন পূর্ব্ববঙ্গে; কিন্তু কে যায়? চেক্‌খানা ভাঙিয়ে সেই যে বস্‌লেন, আর মদের ভাটী বসিয়ে বেশ্যা বাড়ীতে ক্রমাগত ছুটি মাস কাটবার পর, পুলিস এসে যখন হাতকড়া দিয়ে নিয়ে গেল তখনই বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেল। এই অপরাধে শুধু তিনি একা নন্‌,—বাড়ীশুদ্ধ সকলে জেলে যাবার যোগাড়, বাবা স্পষ্ট করে বলে দিলেন, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। বাবা দায়ে পড়েই কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু রাঙাদা তিনটী বছর প্রতারণার দায়ে জেল খেটে এসে সেই যে বাবার প্রতি বিরূপ হয়েছেন, আর তাঁর মনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখন অবশ্য কিছুই করেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি কিম্বা বাবা গেলে, বিশ পঁচিশ যখন যা থাকে দিয়ে বিদায় ক'রে দেন। রাঙাদা তবু যা'হোক্‌ কিছু পয়সার মুখ দেখেছেন, আমরা আর পাঁচটি ভাই এই অভাবের মধ্যে বানের জলে ভেসে গেলাম। কেউ মুদির দোকানে দাঁড়িপাল্লা ধ'রে চাক্‌রী করেন, কেউ বিদেশে নিখুঁজি হয়েছেন, কেউ বা কাঁচড়াপাড়ায় লোহা পিটে কোন মতে পেটের সংস্থান কর্‌ছেন। কিন্তু আমি শুধু বুড়ো বাবা ও বুড়ো মার কাছে অন্ধের লাঠির মত কাম্‌ড়ে পড়ে, এখানে এসে দশটাকা বেতন, আর উপরিস্বরূপ খোরাকটা পাই। এতেই আমাদের তিন্‌টে পেট চলে। কাজেই রাঙাদার কাছে

বাবাকে আস্‌তে লিখেই দি,—যদি কিছু পাওয়া যায়। একটা গুণ তাঁর দেখ্‌ছি, চাক্‌রীর তো নামই শুন্‌তে পারেন না; কিন্তু যদিও বেকার তবু কোনদিন খালি হাতে ফেরৎ আস্‌তে দেখিনি। আজ যদি তিনি কোন কাজ করেন তবে কাল থেকেই আমাদের দিন ফেরে, কিন্তু তাতো তিনি কর্‌বেন না! আচ্ছা দাদা, আপনি একটু বলে দেখ্‌বেন? তিনি সকলের সঙ্গেই প্রাণ খুলে কথা বলেন, আপনাকে নিশ্চয়ই খুব খাতির কর্‌বেন।"

তাহাদের পারিবারিক কঠিন দৈবপীড়ার ইতিহাসের মধ্যে রাঙ্গাদার ভীষণ চরিত্রের কথাটা আমাকে শুধু আশ্চর্য্য নহে কৌতূহলে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। সংসারে এতবড় পাষণ্ডও যে, তাহার সকল কদর্য্য কার্য্যাবলীর পরেও গুণের অধিকার পায় একথাটা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া স্তব্ধ মূঢ়ের মত বিষণ্ণ মুখে বসিয়া রহিলাম। অবনী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি মনে কর্‌বেন না, তিনি আপনাকে সম্মান দেখাবেন না, বরং আপনি যে,—ওঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হবেন, একথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।"

আমি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার বাবা আসুন, তাঁর সঙ্গে যাওয়া যাবে।" অবনী আর আমার দিকে না চাহিয়া পত্রখানা ডাকবাক্সে ফেলিতে চলিয়া গেল। তাহার কথাগুলি যেন আমার ঘরের সর্ব্বদ্রব্য কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমাকে ক্লান্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু এদিকে মাসিমার দয়ার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমার মনের মধ্যে আশার আলো ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এখানে মাসীমার বাড়ীতে থাকিয়া

ডাক্তার হইয়া বাড়ী ফিরিলে গরীব দুঃখীদের সেবা করিতে পাইব, এই আশাটা, আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে চির উজ্জ্বল, চির সুন্দর বেশে নৃত্য করিতে লাগিল। এতদিনের মধ্যে আজই আমার সবচেয়ে ভাল ঘুম হইল।

পরদিন সকাল বেলায় একাকী বসিয়া দৈনিক কাগজখানা শেষ করিয়া, বারান্দায় আরামকেদারার হাতায়, পা দুইখানি তুলিয়া, বাহিরে মেঘাবৃত আকাশের দিকে চাহিতেই বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। উঠিয়া মায়ের নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম,—আমার জন্ত চিন্তা না করিয়া, আমার উন্নতি-সহায়ক আশীর্ব্বাদ চাহিয়া মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। উঠিয়া আবার আরাম কেদারায় বসিবার পুর্ব্বেই মহেন্দ্র জলখাবার লইয়া আসিল। আমি চা খাইনা, তাই, হালুয়া লুচির সঙ্গে দুধ পানে চায়ের অভাব পূর্ণ করিয়া উঠিবামাত্র অবনী আসিয়া ডাকিল। তাহার পিতা এইমাত্র ষ্টেশন হইতে আসিয়াছেন আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরিয়া যাইবেন। সুতরাং বৃথা কালব্যয় না করিয়া আমি তাহার সঙ্গে নীচে আসিয়া তাহার পিতার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। অবনীর পিতা মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স আন্দাজ ষাটের কাছাকাছি। মাথার পলিত কেশ আর একমুখ সাদা দাড়ি না থাকিলে তাঁহার বয়স অনুপাতে তাঁহাকে আরও অল্প বয়স্ক বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিবার মত শারীরিক দৃঢ়তা ও চক্ষুদুটির ঔজ্জ্বল্য এখনও বিদ্যমান। আস্তে আস্তে কথা বলেন, মনে হয় যেন সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছেন। মুখের চারিদিকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কঠোরতার ছাপ

তাঁহার অন্তরের তুমুল সংগ্রাম, পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে চক্ষুর তারকাদুটি যেন বিরাট ব্যর্থতার আক্রোশে জ্বলিয়া উঠে।

আমাদের বাসা হইতে অবনীর রাঙ্গাদা ভবানীশঙ্করের বাসা, সিকি মাইলের বেশী দূরে নয়। অবনী অগ্রণীরূপে, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটের উপরেই একটা মদের দোকানের গা ঘেঁসিয়া একটা বাই-লেনে আমাদিগকে লইয়া গেল। গলির মোড়ে গ্যাস পোষ্টের খুঁটি ছাড়া গলিটার মধ্যে যে বড় একটা, মিউনিসিপ্যালিটির নজর নাই তার সাক্ষীস্বরূপ, গলিটার সঙ্কীর্ণ পথের উপরেই তরিতরকারির খোসা, নোংরা কাপড় চোপড় কিম্বা দুই একটী ভাঙ্গা মাটীর বাসন, ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্মথবাবু নাকে কাপড় দিয়া ও শুচিতা রক্ষাহেতু লাফাইয়া চলিয়া, পুত্রের কাছে দুঃখের নালিশ পৌছাইবার জন্য নির্ব্বাক ভাবে অগ্রসর হইলেন। আমি অবনীর গায়ে হাত দিয়া আস্তে কহিলাম, "কোথায় যাচ্ছ অবনী, এ পথে কি মানুষ চলাফেরা করে?"

অবনী আমার কথার প্রত্যুত্তরে আমার হাতটা চাপিল মাত্র। তাহার মুখের একটু হাসির আভা এই অন্ধকারের মধ্যে বেশ স্পষ্ট-ভাবেই পথখানিকে ভীষণ করিয়া তুলিল। বাড়ীর সুমুখে আসিবামাত্র, তাহার হাসির দৃঢ় স্মরণটা আমার সম্মুখে যম-পুরীর অন্ধকাররূপে দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল; রাস্তার জীর্ণতা যে, বাড়ীটার ভীষণতার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ তাহাই বোধ হয় ঐ একটুখানি হাসির মধ্য দিয়া সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। সদর দরজা খোলা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে,—কেননা কোন দরজাই সেখানে

নাই; চৌকাঠ পার হইবার জন্ত আমরা তিন জনেই বারান্দায় পা দিয়া ভয়ে পা তুলিয়া লইলাম। বারান্দার উপরে এক হাঁটু জল জমিয়া রহিয়াছে, বোধ হয় বাড়ীর নালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এদিকে গৃহস্থের কোন তাড়াহুড়া নাই। যা' হো'ক, বাহিরে দাঁড়াইয়া অবনী রাঙ্গাদা রাঙ্গাদা বলিয়া ডাকিল, কিন্তু উপরের ঘর হইতে কোন সাড়া আসিল না। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পরে একটা হিন্দুস্থানী চাকর, একবাটি গরম বার্লি হাতে লইয়া আমাদের সাম্‌নে জলের উপর দিয়াই সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল। অবনী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভবানীবাবু বাসায় আছেন ?" লোকটা বোধহয় বহুদিনযাবৎ কলিকাতায় বাস করে, তাই কথাবার্ত্তা আধা হিন্দি আধা বাঙ্‌লা মিশ্রিত। সে দোতলার সিঁড়িতে উঠিয়া বলিল, "আছে, বাবুর জ্বর"।

বলিয়াই সে, কোন ঘরে প্রবেশ করিল তাহা বুঝিলাম না। অবনী মন্মথবাবুর মুখের দিকে উৎসুক নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল। তিনি বলিলেন, "আমি আর এই নোংরা জল মাড়িয়ে ওপরে যা'ব না, তুমি গিয়ে দেখে এস, যদি কিছু দেয় তবে নিয়ে এস,—ইচ্ছে করে না দিলে, চেয়ো না; আমি একটুখানি দূরে সরে দাঁড়াচ্ছি।" আমিও অবনীর সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যেই পা বাড়াইয়া বলিলাম, "তোমার বাবা গেলে ভাল হ'ত। যদিই তোমার ভায়ের কাছে পয়সা কড়ি কিছু না থাকে তবে তো অসুখের মধ্যে কষ্ট পাবেন, ঔষধ পথ্যের জন্ত সত্যিই তো কিছু দরকার হবে !"

আমি প্রসারিত চক্ষে একটিবার তাহার ব্যথাক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গে একটা করুণার ধারা অনুভব করিয়া,

অবনীর সঙ্গে উপরে উঠিয়া গেলাম! ভাঙ্গাচোরা দেওয়ালে ঘেরা অপ্রশস্ত কক্ষের এক কোণে, একটা বিছানার উপরে, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ভবানীশঙ্কর ঘুমাইতেছিলেন। হিন্দুস্থানী চাকর কুলুঙ্গির উপরে বার্লির বাটিটা রাখিয়া, কুঁজা হইতে একটা কাঁচের গ্লাসে জল গড়াইয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিল। ভবানীশঙ্কর উঠিয়াই অবনীকে দেখিয়া, রোগক্লান্ত মুখের মধ্যে ক্ষীণ হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, "আয় এখানে উঠে বোস্,—উনি কে?" বলিয়াই তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটা নমস্কার করিলেন ও চাকরের হাত হইতে বার্লির বাটিটা লইয়া একটা চুমুকে অর্দ্ধেক খাইয়া বাটিটা ফিরাইয়া দিলেন।

অবনী ততক্ষণে আমাকে পরিচিত করাইয়া বাড়ীর কথা সুরু করিয়াছে। হাঁ না জবাব দিয়া, ভবানীশঙ্কর বালিসের তলা হইতে ছুইটা চুরুট বাহির করিলেন দেখিয়া, আমি এ বিষয়ের অনভ্যস্ততা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি ব্যস্ত হইয়া একটা চুরুট ধরাইয়া হিন্দুস্থানী বেয়ারা জগুকে ডাকিয়া তামাক দিবার কথা বলিলেন,—জগু গুড়গুড়িটা সাজাইয়া, গোল টুলটার উপর রাখিয়া গেল।

একবার ইচ্ছা হইল বলি যে, তাহার বাবাকে দরোজায় দাঁড় করাইয়া এখানে বিলম্ব করা অনুচিত। কিন্তু মন্মথবাবুর নিষেধ মনে পড়িয়া গেল, নীরবে তামাক খাইতে লাগিলাম। অবনী অনেক কথা তুলিয়া, অবশ্য সবই মা বাবা ভাইদের দুঃখের কথায় ভরা, উপসংহারে বলিল, "রাঙ্গাদা যদি বাড়ী থেকে যাতায়াত কর তবে, চাক্ষুস বাবার দুঃখ দেখ্‌লে কোন উপায় হ'ত। বাবা বুড়ো হয়েছেন, আর কত সহ্য কর্‌বেন?"

ভবানীশঙ্কর রুক্ষমুখে আমার দিকে চাহিয়া, বালিশের তলা হইতে দুইটা টাকা বাহির করিলেন। অবনীর সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "আজ এগার দিনের জ্বরেই শরীরটা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এই ক'দিনে পাঁচ টাকা খরচ হয়ে গেছে, আর যা ছিল, এই নাও দিলাম। হ্যাঁরে আমাদের ইন্দু কেমন আছেরে!"

অবনী টাকা দুটি তুলিয়া পকেটে ফেলিয়া বলিল, "তার দুঃখের অন্ত নেই। তুমি তো তার মা বাপ মরার কথা শুনেছ; আর তার মাস আষ্টেক পরেই তার দাদা একটা সাঁওতালী স্ত্রীলোক নিয়ে কোথায় যে গেছেন,—আজ পর্য্যন্ত তাঁর কোন পাত্তাই নেই। ইন্দু তখন তার ছোট বোন কমলার বাড়ী, সেই যা'রা অগ্রদ্বীপের বেশ অবস্থাশালী, সেখানে গিয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ময়লা ছেঁড়া বেশভূষা দেখে দারোয়ান তাকে দূর করে দিয়েছিল। তারপর ওর কি কষ্ট! ও সেই দশ বারো মাইল পথ দুপুর রোদের মধ্যে হেঁটে বাড়ী ফিরে এল। তা'র এক কাকা হাওড়ার মাল গুদামের হেড ক্লার্ক; তিনি দয়া করে তাঁরই আপিসে একটা চাকরী দেবার পরে থেকে ইন্দু কলকাতাতেই মেসে থাকৃত। বাড়ীতে বুঝি ভাগের ঠাকুর ছিল, কিন্তু সে তো বাড়ীতে যায় না। তা'র কাকা একদিন তা'কে বললে, তুমি তো বাড়ী যাবে না, কাজেই ঠাকুর পূজোর পালাটা সম্পূর্ণ আমাদের ঘাড়েই পড়্‌ছে। তবে এক কাজ কর না, বাড়ীর মধ্যে তো ভিটেখানা ছাড়া আর দুই তিন কাঠা জমি আছে, তাই আমাদের নামে লেখাপড়া ক'রে দাও, আমরা এই দিয়ে তোমার ভাগের পূজোটা শেষ করব'খন।

তুমি ফিরে এলে তোমারই সব। ইন্দু তো কত সরল, তুমি জান রাঙ্গাদা! সে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে রেজিষ্টারী আপিসে গিয়ে লেখা পড়া করে দিলে। রেজিষ্টারী আপিসের একটা কেরাণী ইন্দুর ভুলটা ধরিয়ে বল্‌লে, "মশাই আপনার সতের আঠার বৎসর বয়স হল—আপনি কি পাগল মশাই! সমস্ত স্বত্বই লিখে দিলেন—ভাব্‌ছেন কাকারা ফেরৎ দেবে—তা কি কেউ দেয় মশায়! আহাহা আপনি সোণা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে গেছেন?" ইন্দু অবশ্য মুখ বুঁজে সেখান থেকে চলে এল, কিছু বল্‌লে না, কিন্তু তা'র কাকার কি অন্যায় বল দেখি!"

শুনিতে শুনিতে ইন্দু নামক দৈবাহত যুবকটীর বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখখানা আমার মনে পড়িয়া গেল। ঐ বুকের মধ্যে না জানি কত ব্যথা জমাট বাঁধিয়া তাহার এত বড় সর্ব্বনাশের মধ্যেও হাহাকারের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রকার সহানুভূতির সঙ্গে আমার অন্তরে কি একপ্রকার অবস্থা হইল তাহা বুঝিলাম না। ভবানীশঙ্কর আমার ব্যথাটাকে যেন উপহাস করিয়াই বলিলেন, "ভালই হয়েছে, না হলে ঐ কয়েক কাঠা জমি আর পৈতৃক ভিটেটার আশায় হয় তো ইন্দুকে বাড়ী ফির্‌তে হ'ত; বিয়ে করে সংসারী হ'তে হ'ত, আবার তারও ছেলেপুলে হ'ত, আর বংশ বংশ ধরে তাদের এই দারিদ্রটাও চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকৃত! যারা পিতার কর্ত্তব্য জানে না, তারা বিয়ে কর্‌তে চায় কেন? এক পয়সা উপায়ের পথ নেই, কিন্তু ছেলেপুলের ভাত জোগাতে হবে,—তাতে কি দেশে মানুষ সৃষ্টি হয়? কতকগুলি হাবাতে ছেলেপুলে রেখে, কুকুর বেড়ালের মত ফেলে কি, কোন পিতা স্বর্গে যায়? যা'রা

পুত্রকে মানুষ কর্‌তে না পার্‌বে তা'দের 'বিয়ে' আইন করে বন্ধ করা উচিত।"

উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে ভবানীশঙ্করের মুখখানা বেগুনের মত রঙ ধরিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হ'লে দেখ্‌ছি আপনার মতে, গরীবের বংশ লোপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" ভবানীশঙ্কর, আনমনে কণ্ঠস্বরে তিক্ত শ্লেষ ঢালিয়া বলিলেন, "এই পুণ্য কাজে আমিও রাজি নই। কিন্তু দরিদ্রের তো দোষ নেই, দোষ হচ্ছে দারিদ্র্যের। এই জিনিষটী মানুষের অন্ন কুড়িয়ে নেবার ন্যায্য সাহস পর্য্যন্ত লোপ করে দেয়; না হলে চোখের সুমুখে বড়লোক জুড়ি হাঁকিয়ে পয়সার দেমাকে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে যায়! গরীবদের ঘরে একবেলা অন্ন জোটে না, কিন্তু একজন ধনী পাঁচ হাজার গরীবের খোরাক ঘরে ঢুকিয়ে রাখে কোন্ সাহসে? গরীব যদি তার সঙ্গে ভাগাভাগি কর্‌তে পার্‌ত তবে, সেও মানুষ হয়ে উঠ্‌ত। তা'তো পার্‌বে না,—এতই হীন হয়ে পড়েছে এদের মন যে, খাওয়াতে যে সকলের সমান অধিকার আছে,—এ স্বীকৃতির সাহস পর্য্যন্ত নেই।"

তিনি চুপ করিলে, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অবনীর কথায় বাধা পাইলাম। অবনী দাঁড়াইয়া বলিল, "চল মনুদা, আর দেরী কর্‌লে ডাক্তার বাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে যে!"

আমি উঠিয়া ভবানীশঙ্করের নমস্কারের পরিবর্ত্তে নমস্কার করিয়া কহিলাম, "এ নিয়ে আর একদিন তর্ক কর্‌ব।" তিনি একটু হাসিয়া আমাকে পুনরায় আসিবার অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন।

পরদিন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। দুই দিন পরে সূর্য্যদেব যেন তাঁহার ন্যায্য দাবী কড়ায় গণ্ডায় উশুল করিবার জন্য তীক্ষ্ণ রশ্মি

বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিকালবেলা ব্যারিষ্টার সাহেবের পরামর্শ টা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মেশোবাবুর নিকট হইতে আদেশ লইয়া পরদিবস হইতে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

সমস্তদিন শুধু ভবানীশঙ্করের কথাগুলি, আমার মনের মধ্যে, নদীর জলের পাক খাওয়া তৃণের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। মন্মথবাবু টাকা প্রাপ্তিমাত্রেই বিদায় হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই যে রুগ্ন, সহায়সম্বলহীন লোকটী, বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কোন ক্রোধও প্রকাশ করিলেন না, বরং শেষ সম্বল দুইটী টাকা কোনও সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া অবনীর হাতে দিয়া দিলেন, তাঁহার নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য আমাকে খোঁচাইতে লাগিল। পিতা হওয়ার দায়ীত্ব বিচার করিয়া যে নির্ব্বান্ধব লোকটি, বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পিতৃজাতির বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন, তাহার মধ্যে যে একটা অস্পষ্ট বেদনার বাষ্প, তাঁহার বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল তাহা কি উপেক্ষার বিষয়? কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল দেহের সকল অচলতা লইয়াও তিনি কাহাকেও শুশ্রূষা করিবার দাবী জানাইলেন না, যেন, তাঁহার উপর বিধাতার সকল দুর্দ্দৈব, তিনি একাকী বহন করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প! এখন এই অপরাহ্নের শান্ত প্রকৃতির মধ্যেও হয়তো তিনি দুরপনেয় ক্লান্তিভরে বিছানায় পড়িয়া, তাঁহার একান্ত অনাত্মীয়তা দ্বারা পৃথিবীর সকল স্নেহ মমতা হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। হয়তো বা জ্বর বাড়িয়াছে, অথচ হিন্দুস্থানী ঠিকে চাকর অন্যত্র অবস্থান করিতেছে। তিনি হয়তো জল খাইবার জন্য নিজেই শিথিল শরীর-টাকে কম্পিত পদবিক্ষেপে কুজোর কাছে ঠেলিয়া লইয়া জল পান

করিতেছেন। আমার মধ্যে এই সমস্ত দুশ্চিন্তা লইয়া মন্মথবাবুর গত কল্যকার 'কুলাঙ্গার পুত্রের চেয়ে অপুত্রক থাকা ভাল' এই কথাটাকে কোন মতেই আমল দিতে পারিলাম না।

আমি আজ তদুত্তরে বলিলাম, "তিনি তো আপনার বিরুদ্ধে কোনই দুর্ণাম করেননি, বরং টাকা দুটী দিয়ে দিলেন, কোন দোষারোপ পর্য্যন্ত করলেন না; আর এখন তাহার এই অসুখের মধ্যে মা বাপ থেকেও যে একঘটি জলের সাহায্য পান না, তা নিয়ে অনেক কথাই তো তুলতে পারতেন।"

মন্মথবাবু আমাকে তাঁহার ভক্ত মনে করিয়া বলিলেন, "অস্থানে পড়ে থাকবার সময় তো কখনো মনে হয় নাই যে, অসুখ হ'লে মা বাপকেই দেখতে হবে।"

আমি বুঝিলাম, পিতা পুত্রের সম্বন্ধটা এখন হিসাব নিকাশ ছাড়া এক পাও অগ্রসর হইবার মত অবস্থা আর নাই; কাজেই এ প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম, "যত দোষই তিনি করে থাকেন, এ সময়ে ওঁকে ক্ষমা করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া আপনাদেরই আগে উচিত।" মন্মথবাবু দুই চক্ষু ফুলাইয়া কহিলেন, "আমি নিয়ে যাব কেন? ইচ্ছে হয় গিয়ে পড়ে থাকলেই পারে, আর বাড়ীতে বসে খাবে কি?"

একবার ইচ্ছা হইল ব'লি যে, 'আপনারা সর্ব্বসময় তো এই অভিযোগটা লক্ষ্য করেন না,' কিন্তু তাঁহার মনে আঘাত দিতে প্রবৃত্তি হইল না; তাই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে, এই মান অভিমানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আজ যেন ভবানীশঙ্করের নিঃসহায় অবস্থাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

১৮

উপরে আসিয়া ভবানীশঙ্করের খাটের উপরে উপবিষ্টা, বাইশ তেইশ বৎসরের একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া, আমি চৌকাঠ পার হইতে ইতস্ততঃ করিতেছি বুঝিয়া, স্ত্রীলোকটী উঠিয়া ডাকিলেন "আসুন না, ঘরে এসে বসুন, আজ ওঁর অসুখটা একটু কমেছে।" বলিয়াই তিনি আমার নমস্কারের পরিবর্ত্তে নমস্কার জানাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি আস্তে আস্তে ভবানীশঙ্করের পার্শ্বে বসিয়া ঘরের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। ঘরের সমস্ত বিচ্ছিন্ন জিনিষপত্র স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় নূতন হইয়া উঠিয়াছে, যে মশারিটা আমরা পূর্ব্বদিন ঝুলানো দেখিয়াছিলাম, সেটা গুটান অবস্থায় দেওয়ালের দড়িতে রাখা হইয়াছে। ভবানীশঙ্কর বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলেন, স্ত্রীলোকটীর স্পর্শে জাগিয়াই ডাকিলেন, "রেবা, সন্ধ্যা হ'তে আর দেরী নাই বোধ হয়, তুমি ফিরে যাও।"

আমি বুঝিলাম স্ত্রীলোকটীর নাম রেবা। কিন্তু ভবানীশঙ্করের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ কল্পনা করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইলাম। ভবানীশঙ্কর হাত দুটি কপালে ঠেকাইয়া একটু-খানি হাসিয়া বলিলেন, "মানবেন্দ্রবাবু যে, এসেছেন ভালই হল। অবনী ভাল আছে?"

"হাঁ ভালই আছে। আপনার শরীরটা কেমন", বলিয়াই আমি স্ত্রীলোকটীর পানে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

বস্তুতঃ ঘরের মধ্যে বসিবার মত খাট আর ছোট টুল ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ছিল না। তিনি একটা খবরের কাগজ পাতিয়া মেঝেতে বসিয়া বলিলেন, "আমি বল্‌ছিলুম এত বড় অসুখটা হয়ে গেছে, কয়েকদিন আমার কাছে থাক্‌লে সেবা ক'রে সারিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারি। শুধু পুরুষ মানুষে কি সংসার চলে?"

ভবানীশঙ্কর আস্তে আস্তে উঠিয়া বলিলেন, "তোমার পরিচয়টা দিলে, মানবেন্দ্র বাবু হয় তো আর এখানে বস্‌তেই চাইবেন না। তোমার সেবা নিয়েই আজ আমি মা বাপের চক্ষুশূল, কাজেই সংসারে আমার আপন বল্‌তে আর কেউ রইল না।"

আমি উভয়ের কথার রহস্য বুঝিতে পারিলাম না; স্ত্রীলোকটীর নাক চোখ ভুরুর উপর দিয়া যে একটি নির্ভীক সরলতা বিরাজ করিতেছিল,তাহারই দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম। রেবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আপনিই বলুন তো মানবেন্দ্র বাবু, সংসারে একঘরে ক'রে কে কাকে রাখ্‌তে পারে? আমার মনের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, তার জন্যে কারু কাছে জবাবদিহি কর্‌তে হবে না, কিন্তু তোমার হৃদয়ের কাছে যা নিষ্কলুষ ঠেকে, শুধু মানুষের কথার দ্বারাই কি তার উল্টো বিচার হতে পারে? লোকে আমাকে যে যাই বলুক না, তুমিও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

ভবানীশঙ্কর তাহার দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "অবিশ্বাস যে কর্‌তে পারিনা তার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু

বিশ্বাস করবার মত মনের জোরও তো পাচ্ছিনে রেবা, তুমি মিছামিছি আমার পেছনে ছুটাছুটি কোরো না।”

রেবা একটা ম্লান হাসি টানিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, “যতদিন কর্ম্ম ভোগ আছে ছুটোছুটি করবো, তারপর থাকবে শুধু কপালটা।”

“তাতো বটেই, তোমার এই পাতাচাপা কপালটার জোরে তোমার লোকের অভাব হবে না রেবা, কিন্তু আমার শেষকালে শুধু পাথরচাপা কপাল ঠোকাই সার হবে!” বলিয়াই ভবানীশঙ্কর একটু উত্তেজনার রশ্মি সংযত করিয়া লইলেন।

রেবা বলিলেন, “আর পাঁচজনের মত কি আমাকেও ভাবছ নাকি? পৃথিবীর লোকে আমার সম্বন্ধে এ নিয়ে যতই অপমান করুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তুমিও কি ভাবতে পার আমি এর পরে আর কারও কাছে ভালবাসা ভিক্ষে চাইতে পারি?”

“কি জানি তোমাদের মনের কথা বুঝতে পারি এমন সাহস আজ পর্য্যন্ত আমার হয় নাই”, বলিয়াই তিনি কথাটার গতি ফিরাইবার জন্য বলিলেন, “জগুও তো নাই, একটু তামাক দিতে পারলে,—”

অবশিষ্ট কথা বলিবার পূর্ব্বেই রেবা আঁচলে চক্ষু মুছিয়া, আলবোলাতে তামাক চাপাবার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, “তুমি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প কর, আমি জগুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি”।

“তা এস, সাজ গুজ করতে হবে তো?” বলিয়াই ভবানীশঙ্কর একটু বিদ্রূপের হাসি গোপন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রেবা

একটা রুষ্ট কটাক্ষে তাঁহার হাসিটাকে যেন একটা চাবুক মারিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

আমি স্তব্ধদেহে বসিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলাম। ভবানীশঙ্কর দেওয়ালে ঠেস দিয়া পা দুটা সম্মুখের দিকে ছড়াইয়া বলিলেন, "বেয়াদপি মাফ কর্‌বেন, পা না ছড়ালে আর বস্‌তে পার্‌ছিনে।"

আমি সবিনয়ে বলিলাম, "তাতে আর কি হয়েছে, আপনার রুগ্ন শরীরে একটু আরাম পাবার চেষ্টা করাই উচিত।"

"যা বলেছেন, এই বিশ্বসংসারে শরীরটার উপরই যা আধিপত্য, একে, যে ভাবে ইচ্ছে খাটিয়ে নেওয়া যায়। না হলে বলুনতো কোন্ কাজটা পরের সমালোচনা এড়িয়ে চল্‌তে পারে? কিন্তু সংসারে যে যাকে দেখ্‌তে পারে না, তার আর কোন দোষ না পা'ক্, চলনটার উপরও মন্তব্য দিতে ছাড়ে না, তা জানেন তো?"

"তা যা বলেছেন। এ জিনিষটা বোধ হয় আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। প্রতি ক্ষেত্রেই নিষেধের বেড়া না দিলে যেন পৃথিবী কোন ফাঁকে রসাতলে চলে যাবে! সৃষ্টিরক্ষার ব্যাপারে যেন বিধাতার চেয়ে মানুষের ভাবনাটাই বেশী হয়ে উঠে,—অথচ 'এসেছ ন্যাংটা যাবেও সেই ন্যাংটা'। যেখানে জীবনের সহজ স্বচ্ছ ধারাটাকে এমন ভাবে নিষেধের দুর্গে আবদ্ধ করার মত প্রবঞ্চনা, সেখানে মানুষ স্বাধীন হবে কোন প্রাণে!"

আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি,এমন সময় তিনি পুনরায় বলিলেন, "প্রবঞ্চনা ছাড়া আমি অন্য কিছু বুঝ্‌ছিনা। আচ্ছা বলুন তো, আগুন কি ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায়?"

তাঁহার কথাগুলি আমার কাণে হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছিল। আমি চিন্তিত মুখে অধোবদনে চাহিয়া উত্তরের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় একটা ঠোঙ্গাভরা খাবার লইয়া জগু ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দিদিঠাকরুন পাঠিয়ে দিয়েছেন, নূতন বাবুকে খাওয়াবার জন্য এসব," বলিয়াই জগু গোল টুলটা কাছে আনিয়া খাবার রাখিয়া এক গ্লাস জল আনিতে চলিয়া গেল।

আমি রেবার এই অদ্ভুত আচরণের কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বলিলাম, "এসময়ে আমি কিছু খাব না ভবানীবাবু, ওঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাপ চেয়ে নিলেই যথেষ্ট মনে করবো।"

ভবানীশঙ্কর ততক্ষণে শালপাতায় মোড়া কয়েকটা সন্দেশ, কয়েকটা নোনতা খাবার খুলিয়া জগুর হাত হইতে জলের গ্লাসটি লইয়া আলো জ্বালাইবার আদেশ দিয়া বলিলেন, "এ কৈফিয়ৎ দেবার ইচ্ছে হ'লে অন্য আর একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আস্‌বেন। আজ তো আমি এ হুকুম অমান্য কর্‌তে পারিনে,—এ যে হাকিমের হুকুম।"

বলিয়াই তিনি বালিশটা কোলে তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি পুনরায় অসম্মতি জ্ঞাপনের জন্য মুখ খুলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আপনার কোন বাছবিচার থাকেত বলুন তাকে ডাকিয়ে আনি। সে এলে কিন্তু আর পালাবার কোন পথ থাক্‌বে না, হাতে ধরে খাইয়ে দেবে।"

অগত্যা আমাকে বাধ্য হইয়াই কিছু খাইতে হইল। জগু পানটা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "বাবুকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনি কি খাবেন, পরোটা করে দেব? আটা নিয়ে এসেছি।"

ভবানীশঙ্কর সম্মতি দিতেই জগু চলিয়া গেল। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "এমন অভিভাবক থাকতে আপনি এখানে পড়ে আছেন।"

"চিরকাল শিশু হয়ে থাকার পক্ষপাতী আমি নই, অভিভাবকের হাত এড়িয়ে, একটু মুক্ত হাওয়ায় ঘুরবার জন্যেই এই বিরাগ। বাড়ীর অভিভাবকদের কাছ থেকে এসে যদি আবার নূতন একটা শেকল জড়িয়েই থাকতে হয়, তাহলে আমার অবস্থাটা ঠিক ঢেঁকির মতই হবে। জানেন তো ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নিস্তার নাই।"

"তিনি আপনাকে যেরূপ ভালবাসেন তাতে আপনার তো শেকল পরবার মত ভাবনা দেখি না।"

ভবানীশঙ্কর আবার দেওয়ালে কাৎ হইয়া হুকার নলটা মুখে লাগাইয়া বলিলেন, "তিনি ভালবাসেন কিনা তিনিই জানেন, তবে তিনি যে খুব ভাল ভাবে ভাসতে পারেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই! এইখানটাতেই আমার ভয়; ভাসতে ভাসতে যখন তীরে এসে ঠেকবেন তখন হয় তো আমার ন্যায় তৃণটাকে ফেলে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হবে না।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "তা'হলে এই ফাঁকির মধ্যে থেকে তো আপনার কোনই লাভ নাই দেখ্‌ছি!"

"লাভ লোক্‌সান খতিয়ে সংসারে ব্যবসা চলে সত্য, কিন্তু হৃদয় নিয়ে বাস করা চলে না। ফাঁকি যে নেই তা আমি মনে প্রাণেই জানি, কিন্তু ফাঁক যে আছে তা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিনে,—ঝড়টা যে পর্য্যন্ত এসে না পৌছায় ততক্ষণ মেঘ দেখে কি কেউ আঁত্‌কে ওঠে? কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর ওলোট-পালোট

আস্‌বার পূর্ব্বেই যে সাবধানতা দরকার, সেটুকু অবলম্বন কর্‌তে গেলেও নাকি আর একটা ফাঁকে পড়্‌তে হয়,—রেবার এই মত। জীবনের একটা দিনের সূর্য্যালোক নাকি পর দিনের মেঘের তলে গেলেও, ঐ সূর্য্যালোকটাই সত্য। একদিনের আনন্দটাকে নাকি আর একদিনের নিরানন্দের কাছে হেঁট কর্‌তে যাওয়ার মধ্যে, নিছক ভুল নিয়ে বাস করাই সম্বল হয়। এক একবার মনে হয় কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়! আমাদের আদর্শ মানুষেরা বলেন সংসার মিথ্যে। তা হ'লে, এই মিথ্যে অন্ধকার ঘরের মধ্যে যদি কোন ফাঁকে একটুও চাঁদের আলো আসে, তাকে অবহেলা ক'রে কি কোন সার্থকতা আছে? কাঁটা বনের মধ্যে ফুল ফুট্‌লেও কি আমরা কাঁটাটাকেই সত্য বলে ফুলের অনাদর করি? বরং ফুলটিকেই সমাদরে গ্রহণ করি, শুকিয়ে গেলেও তার অনাবিল স্মৃতির সৌন্দর্য্য আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।"

"উনি তা'হলে জীবনের কোন দুঃখকেই স্বীকার করেন না। যেখানে যেটুকু আনন্দ আছে, তা কুড়িয়ে নিয়েই মালা গাঁথার আয়োজন। কিন্তু সংসারে, আনন্দের যেখানে উদ্ভব,—সেই নিরানন্দসাগরে আগে নাম্‌লে তবে তো আনন্দটুকু আহরণ কর্‌তে পার্‌বেন! কাঁটার খোঁচা খেয়েই যে কমল তুল্‌তে হবে, সে জ্ঞানটাকে অস্বীকার কর্‌লে তো একতরফা বিচারই হবে!"

"এইখানটাতে তাঁর সঙ্গে আমারও মেলে না, আমি জীবনটাকে এতদূর হাল্‌কা এখনও কর্‌তে পারিনি, যার জোরে পাথরের চাপ পড়্‌লেও পিষে যাবার ভয় থাক্‌বে না। যা হোক্, তার কথা না শুন্‌লে আপনিও তাকে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন না; আমি যে কি

ব্যথা নিয়ে বাস করছি তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন, এখন মনে হয় মানুষের মধ্যে প্রচুর শক্তি না থাকলে বুঝি, ভালবাসতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভালবাসাটা যে ছেলে খেলা নয় একথাটা রেবা আমাকে প্রতিদিনই বুঝিয়ে দিচ্ছে। যতটুকু জোরে আকর্ষণ ক'রে নাড়ীভুড়ি বার করে নিতে জানে, আবার ততটুকু ঔদাসীন্য দিয়ে সরিয়ে রাখতে একবারও দ্বিধা করবে না। এই শূন্যময় অবস্থায় কি মানুষ বাস করতে পারে? যাক্‌গে, শরীরটা ভাল হোক্‌, আপনাকে যখন নিমন্ত্রণ করবার হুকুম পাঠিয়েছে, আমাকে তা পালন করতেই হবে। যাবেন তো?"

"ভাল হয়ে উঠুন তারপর দেখা যাবে। কাল অবনীকে একবার খবর নিতে পাঠিয়ে দেব; আজ তা হলে উঠি, দুর্ব্বল শরীরে আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম মাপ করবেন।"

"চারিদিক থেকে না দেখলে তো মাপতে পারব না। যদি মাপ দেবার ইচ্ছেই থাকে তা'হলে ঘন ঘন আসতে ভুলবেন না, অসুখ সত্ত্বেও খলিফার কাজে কোন ত্রুটি হবে না।"

আমি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলাম, "আপনার কাছে অসুখটা শুধু বিদ্রূপ পেয়েই যাবে। একটুও তার খাতির করে মন খারাপ করছেন না দেখছি, নমস্কার।"

"নমস্কার" বলিয়া ভবানীশঙ্কর বিছানা হইতে নামিয়া দোরগোড়া পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন। জগু লণ্ঠন লইয়া আমাকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। বাসায় আসিয়া খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় পড়িয়া, কেবলি আলো-হাওয়ার মত নির্ব্বিকার, স্বচ্ছ চঞ্চল ঝরণার মত সর্ব্বপ্রকার বন্ধনহীন রেবার কথাগুলির

প্রতিধ্বনি, ভবানীশঙ্করের মুখ দিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে শুনিয়া, আশ্চর্য্য অভিভূতের মত মনে হইতে লাগিল। সংসারে এমন অনুভূতিও আছে যাহার মধ্যে কোন ভয় নাই, বিকারের গ্লানি নাই, অশান্তির বাহুল্য নাই, কোন নিরাশা নাই, সমস্ত জলের মধ্য হইতে শুধু দুধটুকু তুলিয়া লইবার মন্ত্রটাকেই পরম সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছে। জলটাকে ঘোলাইতে চায় না, কোন বৈশিষ্ট্য দিয়া হতাশার ছায়া ডাকিয়া আনিতেও চায় না, একটু জল গায়ে লাগিলেও তাকে লক্ষ্য করিয়া আপনাকে ভ্রান্তির মধ্যে ডুবাইতে পরাঙ্মুখ। এই নিত্য সত্য, শাশ্বত জ্ঞানের অধিকারিণীটির সম্যক পরিচয়-লালসায় আমার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিল।

১৯

বাড়ী আসিবামাত্র মাসিমা বলিলেন, "মানবেন্দ্র, একটু জলটল খেয়ে নাও, আজ খেতে রাত হবে, ভীম ক্ষেপেছে!" ভীম ক্ষেপিলে যে কি অবস্থা হয় তা আমার জানিতে বাকী নাই, সুতরাং মাসিমার কথামত দক্ষিণহস্তের কার্য্যের অগ্রিম স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলাম না। বামুনঠাকুর ভীম এবাড়ীর অন্নদাতা, কাজেই তাকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া কাহারও দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। মহেন্দ্রের আচার-বিচারের শৈথিল্য, ভীমের কাছে তাহাকে ম্লেচ্ছ করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং মহেন্দ্র যে, রান্নাঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ লাভ করিবে, ভীম এই অনাচার কিছুতেই বরদাস্ত করে না, উপরন্তু উনান ছুঁইয়া মহেন্দ্র যে মহাপাতকের ভাগী হইয়াছে, তাহার জন্ত

ভীমের নিকট সংস্কৃত বুলি যা শুনিবার তাহার তো কোন ব্যত্যয় হয় নাই সে কথা ঠিক, তদুপরি সমস্ত হাঁড়ি কুড়ি তাহাকে মাজিয়া দিতে হইতেছে। কিন্তু ভীম ক্ষেপিলে তাহার ধনুকের মত শরীরটা যে কিরূপ ভঙ্গীধারণ করে তাহা চাক্ষুষ না দেখিলে কাহারও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা নাই! রান্না করিয়া, ভাত পরিবেশন করিয়া অথবা বয়সের জ্যা কোন দিন মুক্ত হইবার সম্ভাবনা বিরল বলিয়াই হোক্ তাহার ক্রোধ-কম্পিত কোমরের অর্দ্ধচন্দ্রাকার অবস্থা দেখিলে সকলেরই তাহাকে খাতির করিতে ইচ্ছা হইত। তাহার এই ধনুকের মত শরীরে কোন দিন সোজা হইবার মত বয়স আছে কি না জানিবার কোন উপায় ছিল না—ভীম এ বিষয়ে নীরব। চল্লিশের নীচে বয়সের সংখ্যা পর্য্যন্ত তাহার নীরবতা দ্বারা প্রমাণিত হইত, কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু এ কথা লইয়া মীমাংসা করিবার কোন উপায় ছিল না; কারণ ভীম চল্লিশের পর হইতে যে কোন সংখ্যার নির্দ্ধারণের সময় কাজের ছুতায় বাহিরে চলিয়া যাইত। কাঁচা বয়সের বলিলে সে যেরূপ খুসী হইত তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, বয়স-অল্পতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অন্যান্য বৃদ্ধের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। মহেন্দ্র তাহাকে বায়াত্তুরে বুড়ো বলাতে যে, ভীম যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছে তাহা অবধারিত। কিন্তু মাসিমা তাহাকে অনেক করিয়া বাপ বাছা বলিয়া শান্ত করিয়াছেন, কাজেই রাত্রিতে আমাদের আহারের উপায় হইল।

পর দিবস রবিবার বলিয়া বাড়ীর বাহির হই নাই, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া কাটাইলাম। একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইব ভাবিতেছি, এমন সময় অবনী আসিয়া বলিল, "রাঙাদা এসেছেন।"

আমি তাঁহার কাছে যাইতেই, তিনি নমস্কার করিয়া কহিলেন, "বাঃ বেশ লোক তো আপনি, ডাক্তারী শিখ্‌তে গেলে বুঝি বন্ধু-বান্ধবকে ভুল্‌তে হয়।"

নমস্কার করিয়া তাঁহার সুমুখের চেয়ারটাতে বসিয়া বলিলাম, "একটু ঝঞ্ঝাটে পড়ে আপনাদের ওখানে যাওয়া হয় নাই। আপনি আজ না এলে দুই একদিনের মধ্যেই আমি যেতাম।"

আমাদের কথার মাঝখানে অবনী একটা চুরুট ও দুই দোনা পান লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অবনী গরীব হইলেও তাহার রাঙাদার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। তাই সে তাহার সাধ্যমত অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। ভবানীবাবু বলিলেন, "কয়েক দিন ধ'রে লোহার বাজারে হাঁটাহাঁটি কর্‌ছি, দেখি যদি একটা বড় কোম্পানীর সোল ব্রোকার হ'তে পারি। তা'ও কি হ'বার জো আছে? যে দিকে পা বাড়াবেন কর্ত্তাদের মুখ হাঁ ক'রে আছে! দেখুন না দালালগুলো 'কন্‌টিনেন্‌ট্যাল গুড্‌সের' ওপর দুপয়সা ক'রে খাচ্ছে, তাতেও নাকি ডিউটী বসিয়ে দেবে শুন্‌ছি। যাক্‌গে, আমার ইচ্ছা ছিল, কিছু টাকা কামিয়ে গরীব দুঃখীদের জন্য একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল্‌ব; দেশের বড়লোকেরা এ সব কাজে টাকা দিতে চায়না মোটে, তবে নিজের ট্যাঁক ভারী থাক্‌লে, আর দুয়েকটা কাজ দেখাতে পার্‌লে তবু কিছু পাওয়ার আশা হো'ত। দেখা যাক্‌ কি হয়!"

আমি বলিলাম, "আপনার দ্বারা অসম্ভব কিছু নেই।"

ভবানীশঙ্কর বলিলেন, "আত্মশক্তির উপর ভরসা না থাক্‌লে কেউই উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে না। আমার শুধু ইচ্ছা গরীবদের

কোনমতে বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর একজন ধনীলোকের সঙ্গে, অন্নের উপর, তা'রও সমান অধিকার। গরীবের সবদিকেই বিপদ মানবেন্দ্রবাবু, এ কাজটাতেও কর্ত্তাদের রক্তচক্ষুর হাত এড়ানো যাবে না। কিন্তু যারা গরীব, তারা এই চেতনা জাগাবার জন্তে ব্রত নেবে, দেহপাত কর্‌বে। গরীবের পক্ষে বেঁচে থাকাও বিড়ম্বনা। তবু যদি কয়েকজনের ত্যাগে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার হয় তাই দেখ্‌তে হ'বে;—ভাল কথা," বলিয়াই ভবানীশঙ্কর অকস্মাৎ গাম্ভীর্য্যের ছায়াতে মুখখানা কঠোর করিয়া কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, "ওই যা! আমি যে পরোয়ানা নিয়ে এসেছি! নিমন্ত্রণের কথাটা মনে আছে তো! চলুন গাড়ী নিয়ে এসেছি।"

"আজ্‌কেই!" বলিয়া কৌতুকদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে, তিনি উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "চলুন আগে তো যাওয়া যাক্, তারপরে আপনার আপত্তি তোল্‌বার দেশকাল পাত্র স্থির হবে।"

বলিয়াই তিনি প্রায় টানিতে টানিতে আমাকে আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া বলিলেন, "আমিও সময় পাই না, রেবা শুধু আমার হাড় কখানা রেখেছে, রোজই জপ্‌ছে 'মানবেন্দ্রবাবুকে নিয়ে এলে না!' কি চোখে যে আপনাকে দেখেছে, ওই জানে। আমাকে পথে বসাবেন না মানবেন্দ্রবাবু!" বলিয়াই তিনি অট্টহাস্তে চলন্ত গাড়ী কাঁপাইয়া তুলিলেন। "আমি তাঁহার কলহাস্তের ফাঁকে ফাঁকে বলিলাম, "আমি দেবেন্দ্র নই, নগেন্দ্র; কুন্দকে নিয়ে যাবার কন্দী আমার পেট চিরলেও বেরোবে না। ইতর জন মিষ্টান্ন পেলেই সন্তুষ্ট হবে!"

হাসিতে হাসিতে ভবানীশঙ্কর আমার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,"এই রকমই একটি মনের মানুষ এতদিন খুঁজছিলাম। তুমিই পার্‌বে নরক গুলজার কর্‌তে, এই যা, ভদ্রতার দড়ি ছিঁড়ে গেল, আপনি আপনি বলে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, আর একটু কাছে এস মানবেন্দ্র !"

"কাছেই আছি, যেভাবে ইচ্ছা সম্বোধন করুন; আপনি সহজেই মানুষ হাত কর্‌তে জানেন।" বলিয়া আমি বাহিরে দৃষ্টি-পাত করিলাম।

ভবানীশঙ্কর আমাকে ছাড়িয়া চক্ষু দুইটা মুছিয়া বলিলেন, "সংসারে গরীব বলেই মানুষকে আপনার করে নিতে চাই। এ সম্পদটিও যদি না থাকৃত তবে এ গরীব বাঁচত কি নিয়ে বলতো ! ধনী লোকের মুখে বিশ্বপ্রেমের কথা শুন্‌লে আমার মনে হয়, এরা প্রেম জিনিষটার উপর অত্যাচার কর্‌ছে। যা'রা দুঃখ কি বস্তু জানেনা তা'রা, দুঃখীর প্রাণের খবর কোন দিনই পায় না। তা'রা তা'দের ধনের অপব্যয়ের মত, এ জিনিষটাকেও ব্যবহার কর্‌তে চায়, ইহা কি কম ধৃষ্টতার কথা ! যে ধনী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এসে দরিদ্রের পর্ণ কুটীরের পার্শ্বে ঘর বাঁধ্‌তে না পারে, তা'রা যখন প্রেম বিতরণ কর্‌তে চায়, তখন দরিদ্র যে ভাবে অপমানিত হয়, সে লাঞ্ছনা দারিদ্র্যের চেয়েও কঠোর। এই কারণেই ধনীর মুখে বিশ্বপ্রেমের কথা শুন্‌লে, তার কপটতা এসে আমার বুকে শেলের মত বেঁধে। ধনীর বিশ্বপ্রেম বিলাসেরই একটা খেয়াল,—মানুষ যেন কোনদিনই এই ছলনায় না ভোলে।"

ভবানীশঙ্কর একঝলক উত্তেজনার রশ্মি মুখে চোখে পরিব্যাপ্ত

করিয়া চুপ করিলেন। আমি তাঁহার সরল সুস্পষ্ট কথার অন্তরালের করুণার আনন্দটি অনুভব করিয়া মুগ্ধ সমাহিতের মত গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলাম। রেবার বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী আসিবামাত্র নামিয়া পড়িলাম। ভবানীশঙ্কর ভাড়া চুকাইয়া আমাকে উপরে লইয়া গেলেন।

২০

রেবার বাড়ীখানি তিনতলা বটে, কিন্তু বিশেষ বড়ও নয়। ঘরের মধ্যে দুইটা দেওয়ালগিরি, আয়না, একটা ড্রেসিং টেবিল একটা বুককেশ ও তিনখানা স্প্রীংয়ের কৌচ। মেঝেতে ঢালাই গদির উপর ধব্‌ধবে সাদা চাদর ঢাকা তোষক; কয়েকটা বালিশ সাদা ওয়ার পরিয়া বিছানার কোমলতা প্রচার করিতেছে। ভবানীশঙ্কর আমাকে একটা কৌচ দেখাইয়া স্বয়ং আর একটাতে বসিয়া বলিলেন, "রেবা বোধ হয় আহ্নিক করছে, বসো আমি ডেকে নিয়ে আসি।" ভবানীশঙ্কর কতগুলি আদি অন্তহীন চিন্তা পশ্চাতে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি এতক্ষণে দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা নিমাই-সন্ন্যাস, যুগলমিলন, নৌকাবিলাসের ছবি দেখিয়া শেষ করিয়াছি। ভবানীশঙ্করের পশ্চাতে, রেবা ঘরে আসিয়াই আমাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "গরীবের বাড়ীতে হাতীর পা পড়্‌ল দেখ্‌ছি, কেমন আছেন!"

প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলাম, "ভাল আছি বলেই ঐরাবত আখ্যা পেলাম।" রেবা হাসিতে হাসিতে ঢালা বিছানাটার এককোণে বসিয়া

বলিলেন, "মেয়েদের কাছে আমাদের দেশের সব পুরুষই একেকটি ঐরাবত। কিন্তু নদীর স্রোত কি ঐরাবতে কোনদিন আট্‌কাতে পারে? কোনদিনই পারে না, তবুও পুরুষের নিষ্ফল অভিমান তা'রা মেয়েদের বেঁধে রাখ্‌বেই। আমরাও কতদূর আহাম্মুক দেখুন, পুরুষদের কাছ থেকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনে স্বর্গে যাওয়ার লোভে সমস্ত জীবনটাকে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহ-সংসারের দাবী-দাওয়ার হাত থেকে মুক্ত করে নেবার জন্য পুরুষের এই বজ্র আঁটুনিতে ফাঁস লাগিয়ে বসি। কিন্তু এ যতই শক্ত বাঁধন হোক্ এ যে ফস্কাগেরো তা' এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

"আমিও যে একজন পুরুষ তা ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু; পুরুষজাতির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আমার গায়েও এসে লাগে; আপনার মত যা'দের সমাজের কোন দায়ীত্ব নেই তা'দের কোন সমাজের বিরুদ্ধে নালিস কর্‌লেও অনধিকার চর্চ্চা করা হয়!"

আমি আর একটা কথা বলিবার পূর্ব্বেই রেবা উঠিয়া বলিলেন, "দাঁড়ান একটু জলখাবার করে দিই, খালিমুখে বকালে অতিথির অসম্মান করা হবে। এসো না গো, রান্নাঘরে বসেই গল্প করা যাবে। ততক্ষণ আমি লুচি কখানা ভেজে নেব।"

ভবানীশঙ্কর তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ইনি মিষ্টান্ন খেতে এসেছেন, ইতর লোকের নাকি তাই প্রাপ্য!"

রেবা স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানি আলোকিত করিয়া কহিলেন, "তা বটে। যারা ইতরও নয় ভদ্রও নয় তাদের পক্ষে পটল ভাজা আর লুচিই বরাদ্দ।"

রেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার রান্নাঘরে গিয়া তুইখানা

আসনে বসিলাম। তিনি এক গামলা ময়দা ও একটা পিতলের বড় বাটি দিয়া কহিলেন, "দেখা যাক্ কারিগর কেমন, ময়দা ডলে দিতে পারবেন তো ?"

ভবানীশঙ্কর ময়দা ডলিয়া তাল পাকাইয়া আমার কাছে দেখিবার জন্য দিলেন। এ বিষয়ে যে তিনি অপারগ তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমিও যে একজন ওস্তাদ তাহা অল্পক্ষণেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। লুচি চক্রাকার না হইয়া বহুকোণাকার হইয়া যাইতে লাগিল। রেবা আমার সম্মান রক্ষার জন্য ঐ লুচিই কিছুক্ষণ ভাজিয়া বলিলেন, "নিন্ বসুন, যা পারবেন তাই করুন। ঢুলির কর্ম্ম কি লুচি বেলা ? আর দিতে হবে না, বাকি ক'টা আমিই সেরে নেব। আপনারা ততক্ষণ অভ্যস্ত কাজে মনোনিবেশ করুন।"

বলিয়াই তিনি দুই গ্লাস জল গড়াইয়া বলিলেন, "পুরুষগুলো এত অকর্ম্মণ্য বলেই মেয়েছেলেগুলোকে বাজে কথায় বাহবা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে, আর শিশুদের মত মেয়েরাও চুষি কাঠি মুখে দিয়েই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু আমি বলি, মেয়েদের ভালমন্দের ভারটা একটীবার মেয়েদের ভুলচুকের হাতে ছেড়ে দিয়েই দেখনা। তোমরা পরামর্শ দেবার স্পর্দ্ধাটা একটু নিঃস্বত্ব করেই দেখ,—মেয়েরা কত কাজের হয়ে উঠে।"

"এবিষয়ে তো আপনাদের কেউ বারণ করে না," বলিয়া আমি ভবানীশঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি মিটিমিটি হাসিতেছেন। পুনশ্চ বলিলাম "মানুষের সব কাজেরই একটা শৃঙ্খলা আছে ; এই শৃঙ্খলা রাখ্‌তে হ'লে সকলকেই একটু আধটু বন্ধনে পড়্‌তেই হবে।"

"বন্ধনে পড়্‌তে হবে তা মানি, কিন্তু সমাজের জন্যই তো আর মানুষ নয়; মানুষের জন্যেই সমাজের সৃষ্টি। মনুষ্যত্ব যেখানে পদে পদে নিগৃহীত হয়, সেখানে সমাজের কোন কল্যাণ কোন কালে হয় না, ইতিহাস তার সাক্ষী। তা ছাড়া আমাদের সমাজের যে দিকে তাকাবেন, শুধু পুরুষের পূজার সহস্রদিক খোলা; আর নারীর পক্ষে একমাত্র পুরুষের আদেশগুলি খোলা আছে। এর ফলে মেয়েরা তাদের শক্তির মহিমা ভুলেছে,যৌবন হারিয়ে কর্ম্ম প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আর কেবল কাঠের পুতুলের মত পুরুষের হীনতার খেয়ালে ওঠে বসে। এর ফলে আমরা বিশ বৎসর বয়সেই বুড়ী,—সকল আনন্দ ঘুচে গিয়ে থাকে শুধু পুরুষের ভোগের বস্তুর মত বাকী দিনগুলো কাটানো।"

আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখখানি সুউজ্জ্বল কান্তিতে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে—অন্তরের উত্তেজনা লইয়া ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছে। বলিলাম, "আমাদের দেশের পক্ষে যা উপযোগী, সেই প্রণালীতেই এতদিন সমাজ বেঁচে আছে, সমাজ ব্যবস্থা ভাল বলেই, বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় সমাজ এখনও টিঁকে আছে।"

রেবার চক্ষুদুটী বিজলী আলোকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, "পাহাড় পর্ব্বতের প্রাচীনত্ব কোন কালেই সমাজের গৌরবের বিষয় নয়। যে গাছে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, সে আবহমান কাল বেঁচে থাক্‌লেও তার আদর নাই। মানুষের সমাজে যেখানে নূতনত্ব নাই, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ প্রাণের চাঞ্চল্য নেই, হৃদয়ের মুক্ত স্রোত, জাহ্নবী ধারার মত সকল গ্লানি বক্ষে নিয়েও, মনুষ্যত্বের সাগরে মিশ্‌তে না পারে,—সেই

বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে মুক্তির সাহসতো নেই-ই, বৃহতের কল্পনাও কোন কালে জাগে না। জল-কূপ হয় তো বহু বহু বর্ষ ধরে জলদান কর্‌তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে যারা বাস করে, তারা কি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকারী বল্‌তে চান? নারীর পক্ষে হৃদয়ের বড় কিছুই নাই; কিন্তু এই হৃদয়ের স্নেহ মায়া মমতা পুরুষের স্বার্থের কোন বিঘ্ন আনে না, তাই এই সবের উপর কোন শাসন নাই, কিন্তু হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ভালবাসার উপর আইন ক'রে দিয়ে, পুরুষ কি তার চূড়ান্ত সঙ্কীর্ণতা প্রচার করে নাই? পুরুষ যেরূপ স্বেচ্ছামত ভালবাসতে পারে, নারীরও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, একটা ঘটা ক'রে অনুষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখ্‌তে, মনের আনন্দ পিষে ফেল্‌তে হবে, এ নিয়ম মানুষের কোন শাস্ত্রে লেখে না।"

"এ নিয়ম না রাখ্‌লে সমাজে যে, অনাচার আরম্ভ হবে তাকে রোধ কর্‌বে কে? হৃদয়কে তার ইচ্ছামত পথ ছেড়ে দিলে, মানুষের সমাজ বলে কোন বস্তুই থাক্‌বে না।"

"যে অনাচারটা আপনাদের গায়ে লাগে সেটাই আপনারা লক্ষ্য করেন, কিন্তু যে অনাচারটা স্বামীসর্ব্বস্ব রমণীরা ইহকাল পরকাল ভুলে, সহ্য করে করে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছে তা আপনারা কোন কালেই দেখ্‌বার প্রয়োজন মনে করেন না, ভবিষ্যতেও কর্‌বেন না— কর্‌লে যে আপনাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হবে; এই ভয়টা আপনাদের খুবই আছে। অধঃপতনের চরম পরিণতি এইখানেই নগ্নবেশে ধরা দিয়েছে মানবেন্দ্রবাবু, সত্যটাকে স্বীকার কর্‌বার মত সাহস আর নাই। তুচ্ছ অহঙ্কার ভুলে, সত্যকে বুক দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে আজ এই মরা সমাজে

বান ডেকে যেত, এই হিন্দুর ধর্ম্মের সংসারে তার আপন আসনটা খুঁজে পেতে বিলম্ব হ'ত না।"

আমি বলিলাম, "দেশাচার ভুলে সত্য স্বীকার করা হয় না। হিন্দুর সমস্ত আচার বিচার ধর্ম্মের অনুগামী। আচার বিচার উপেক্ষা কর্‌লে ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় বলেই ভালবাসারও বিধি প্রচলিত আছে। মুক্তপক্ষ স্বাধীন বিহঙ্গমের মত মানুষ চলাফেরা কর্‌লে, তার মানবত্বের বিকাশ কোনকালেই হবে না। সংযমের ফলেই বিরাট মানব সমাজ আজ দেবত্ব লাভের আশায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই সংযম না থাক্‌লে মানুষে পশুতে কি কোন প্রভেদ থাকৃত ?"

"কোনকালেই না। আমি ও বলিনে যে, প্রকৃত মানুষ সংযমের শক্তি কোনকালেই হারাবে। সংযম আর স্বাধীনতা দুইই মানবের শক্তির দুই পিঠ। কিন্তু আমাদের দেশে পুরাকালে হয় তো দুই দিকেই স্বাধীনতা চলেছিল; কিন্তু যখন হ'তে স্বাধীনতার সাহস লোপ পেয়েছে, সেদিন থেকে সংযম ও হারিয়েছে—পড়ে আছে শুধু তার খোলসটা। তারই ফলে দেশাচার, লোকাচার, জনাচার, মনাচার, যা ইচ্ছে নাম দিন না কেন, আচার কোন কালেই মানুষের সংযমের পরিচয় দেয় না। • আপনাদের ধারণা, মেয়েদের ছেড়ে দিলেই অসংযমী হবে। ভালবাসাটাকে খেলার বস্তু মনে করেন ? যারা সমাজে অসতী বলে ঘৃণিত হয়, তাদের মধ্যেও এমন নারী অসম্ভব নয় যাঁরা একটী লক্ষ্যের জন্য বড় বড় লোভ বিসর্জ্জন দিতে পারেন। আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমাদের এই বাড়ীতেই একটী ভাড়াটে আছেন, তিনি

সম্মুখে সহস্র প্রলোভন রেখেও একটী অদৃশ্য মানুষের জন্য সমস্ত ভোগ বিলাস উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। তিনি যে সতীর চেয়েও সতী এ কথা আমি বড় গলা করে বল্‌তে পারি।"

মহিমার গৌরবে রেবা চক্ষু দুটী উজ্জ্বল করিয়া আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেই, ভবানীশঙ্কর বলিলেন, "লোপামুদ্রার কথা বল্‌ছ রেবা! অসামান্যা স্ত্রীলোক। কিন্তু যাঁরা তার কাছে আসে, তাঁদের মুখে ওর হৃদয়টা পাষাণ বলে বর্ণিত হয়।"

"এই আক্রোশ অস্বাভাবিক কিছু নয়। যাঁরা সমাজের মধ্যে নাম কিন্‌তে চান, অথচ গোপনে গোপনে এই পতিতাদের বৃদ্ধি দেখ্‌লে খুসী হন, তাঁরা ওর নিষ্ঠার তেজটাকে স্বীকার করতে পারেন না মোটে। কিন্তু এতে এই অনাচারীদের মানসিক ক্লেদই ধরা পড়ে,—লোপার কিছু যায় আসে না। আর তার ভয় কি? ফিল্মের এত বড় একজন অভিনেত্রীর কোনদিন অন্নের অভাব হবে না। তিনি যদি তাঁর হৃদয়ের দেবতার প্রতি অটুট শ্রদ্ধা পোষণ করে যেতে পারেন, তা'হলে অপরের দোষারোপ নিন্দা বিদ্রূপে শুধু তাদের স্বার্থটাই লজ্জিত হবে, ওঁর কোন ক্ষতি কর্‌বে না। জানেন মানবেন্দ্রবাবু, লোপামুদ্রার জীবনটা সমাজের দুর্ব্বলতার ফলেই এইখানে এসে ভিড়েছে। না হলে তাঁর মাকে মুসলমানের হাত হতে বাঁচাতে গিয়ে, যে ব্রাহ্মণ তাঁকে নষ্ট করে-ছিলেন, তাঁর উচিত ছিল এই গুণবতী রমণীর মাকে নিজের ঘরে স্থান দেওয়া। আস্‌তে পারেন, তাঁর হাতে খেতে পারেন, তাঁর সঙ্গে বসবাস কর্‌তে পারেন, কিন্তু ঘরে তুল্‌তে গেলেই সমাজের চাপে পিষে যাবার ভয়। যে সমাজের মধ্যে এত লুকোচুরি তার

মধ্যে আবার এত সতী অসতীর বাহুল্য কেন? না, কেবল মেয়েদের প্রাণটা পুরুষের ছিনিমিনি খেলার জিনিষ বলেই এতবড় অপমান করেও সংসারে সেই পুরুষের বিচার নাই!”

রেবার উত্তেজনা, সহানুভূতি, সহৃদয়তাভরা ঝাঁঝালো কথা-গুলির মধ্যে আমার প্রাণটা অপরিসীম কৌতূহলে ব্যথিত হইয়া উঠিল। আমি স্তব্ধ নিঃসার ভাবে বসিয়া, বাতায়নপথের চন্দ্র-কিরণের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া, পুরাতন একটা ছবি বহু দিনের স্মৃতির ধূলা বালি হইতে তুলিয়া, রেবার কাহিনীর সহিত তুলনা করিয়া নির্ব্বাকভাবে আড়ষ্ট হইয়া রহিলাম। আমার বিষণ্ণ চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া ভবানীশঙ্কর বলিলেন, “এ সমস্ত পুরানো কথা ঘেঁটে কোন ফল নেই রেবা! বর্ত্তমানের নিঃস্বার্থ ত্যাগ দিয়েই ভবিষ্যতের সৃষ্টিকে সফল কর্‌তে হবে। অতীতের অবজ্ঞা প্রকাশে, অনর্থক কাজের শৈথিল্য আস্‌বে, প্রাণের দ্যোতনা জাগ্‌বে না।”

রেবা আমার দিকে যেভাবে স্থির নিস্পন্দ পলকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, তেমনি ভাবে থাকিয়া কহিলেন, “অতীতকে অবহেলা করার ইচ্ছে, আমার মোটেই নাই। আমি শুধু এমন একটা যুক্তির পথ খুঁজতে চাই যা’ দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ করা চলে। বিচার ছাড়া এখন এক পাও মেয়েরা অগ্রসর হবে না এ কথাটাই আমার বক্তব্য। ওকি মানবেন্দ্রবাবু, হঠাৎ এত চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন যে, আমার কথা কি আপনার সংস্কারে আঘাত দিয়েছে?”

কুয়াসার মধ্যে আগন্তুককে চিনিবার মত চক্ষুতে চাহিয়া আমি

চমকিত ভাবে বলিলাম, "না, কিছু না। লোপামুদ্রার কথাটা আমার মনটা যেন কেমন করে দিয়েছে।"

ভবানীশঙ্কর লাফাইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব-রাগ হয়েছে রেবা! না দেখেই ভালবেসে ফেলেছেন নাকি?"

রেবা ভবানীশঙ্করের হাসিতে যোগ দিয়া কহিলেন, "বৃথা দগ্ধ হবেন কিন্তু, শেষকালে আমাকে দোষবেন না যেন। লোপা-মুদ্রার নামে যেমন মোহ আছে, তার উপস্থিতিতে তেমনি মাদকতা আছে, শক্তির বোধ হয় এমনি মহিমা!"

তাঁহারা দুইজনেই এমন অপ্রতিভ মুখে আমার দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহাদের অনুভূতিটা আমাকে বিদ্রূপ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদের উপর ফিরিয়া গিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। আমি তাঁহাদের দুই জনকে মুক্তি দিয়া কহিলাম, "তা নয়! দুঃখের ইতিহাস শুনে আমার সহানুভূতি আস্‌বে না, এত পাষাণ আমি এখনও হইনি! মেয়েদের কথা শুন্‌লেই আমার পূর্ব্বরাগ হবে, এত বড় দুর্ব্বলতা আস্‌বার সুযোগ আমি কোন মেয়েকে দেখেই পাইনি। আমি যে কয়েকটী রমণীকে দেখ্‌তে পেয়েছি তাঁরা সকলেই আপনার মহত্বের সুরে ঝঙ্কার তুল্‌তে পার্‌বেন বলেই আমার ধারণা।"

"যাক্, আমার মনে পড়েছে, আজ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর আগে লোপামুদ্রার মত না হোক্ তাঁর মায়ের মত একটী স্ত্রীলোকের দেখা পেয়েছিলাম। ঘটনাটার মধ্যে যে কোন তফাৎ নেই এ কথাটাই আপনাদের বোঝাতে চাই। কিন্তু তাঁরও একটী মেয়ে ছিল, তার নাম ছিল কনক।"

"কনক!" বলিয়াই রেবা এমন উচ্চৈস্বরে শব্দটা শেষ করিলেন যে, ঘরের কাঁসার বাসনগুলি পর্য্যন্ত বাজিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া উপরে গিয়াই নীচে আসিয়া বলিলেন, "দুর্ভাগ্য আমার তিনি কোথায় বেরিয়ে গেছেন!" বলিয়া রেবা হাঁপাইয়া বিছানাটার উপরে ধপ্ করিয়া বসিয়া, নিজের চাঞ্চল্যটার অহেতুকতা অনুভব করিয়া লজ্জিতভাবে আমার দিকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, যেন চক্ষু ফিরাইলেই কেহ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিবে।

ভবানীশঙ্কর রেবার এই ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচিত লোককে দেখে যতটা আশ্চর্য্যান্বিত না হয়, মধ্যবর্ত্তী কেহ পরিচিত করিয়ে দিতে যেন ততোধিক আশ্চর্য্যযুক্ত হয়ে যায়। চলহে মানবেন্দ্র, তোমাকে এখানে আর আমি ফেলে রেখে যেতে পারিনে! অতিথিকে অভ্যর্থনা করে এনেছিলুম আবার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে একটু পুণ্য অর্জ্জন করে নিই।"

আমি বলিলাম, "চলুন রাত হচ্ছে।"

রেবা যেন এতক্ষণে একটা জেলখানা হইতে বাহির হইয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আর একদিন আস্‌বেন, নিমন্ত্রণটা এখনি করে রাখ্‌ছি। বাহনটী পেয়েছেন ভাল, কি গো ধরে নিয়ে আস্‌বে তো?"

"আস্‌বো বৈকি? একটু মায়ের চরণামৃতের ব্যবস্থা কর্‌বে তো?" বলিয়াই ভবানীশঙ্কর তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কথাটা শেষ করিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইলেন।

রেবা আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাও, স্বভাবটা আর ছাড়্‌তে পার্‌ছ না। কিন্তু আমার এখানে সে সব মাতলামো হ'তে পার্‌বে না বলে দিচ্ছি।"

তারপরে আর কোন কথা আমদের কানে আসিল না। কারণ আমরা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বাহিরের গেট পার হইয়া আসিলাম।

২১

ইহার পর আমার যে কয়টা দিন কাটিল, তাহাদের একদিকে বিষাদ অপরদিকে আনন্দ, একস্থানে বারিপাত অপর স্থানে সূর্য্যোদয়, স্মৃতি-প্রবাহিণীর এপারে অনন্ত সৌধমালাবেষ্টিত মহানগরী, ওপারে পুরাতন জীর্ণ গোলপাতার ভগ্ন কুটীর, উপর হইতে শ্রাবনের ঘনধারা অবিরাম ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু সুদিনের আশা এই দৈবপীড়ন উপেক্ষা করিয়া বহুদূর দূরান্তের মৃগতৃষ্ণিকার পানে প্রধাবিত। প্রত্যেকটী উষা একটী দিনের মৃত্যু সংবাদ দিয়া, নবীন দিনের আনন্দ উৎসব জাগাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে শুধু মৃত কনকের আত্মা লোপামুদ্রার মধ্যে মুক্তির পথ পাইয়া ভাল মন্দের কোন তরণীতে যাত্রা করিয়াছে তা'রই বিচার বিতর্ক। সন্দেহ আসে, যদি সেই কনক না হয় তবে আমার এই গুরু ভারাক্রান্ত চিন্তাটাকে আর মাথা তুলিবার অবকাশ দিব না। তথাপি কেমন যেন একটা অস্বস্তি, কোথা দিয়া আসে যেন একটা করুণার প্রবাহ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিন মাসের মধ্যেও ভবানীশঙ্করের টিকি দেখিলাম না। মনে হইল, বোধ হয় সত্যই কনক আমার পরিচয় পাইয়া লজ্জাবশতঃ আমাকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছে।

এদিকে শারদীয় আকাশে সোণার আলো আসিয়া প্রবাসীকে ঘরে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। কলিকাতার ধনী লোকের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের আশা জাগিয়া উঠিল, কাজে কর্ম্মে ছুটির আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে দিন মেসোমশায়ের এক ডাক্তারবন্ধু তাঁহার স্ত্রীর শরীর দুর্ব্বল হওয়ায়, নষ্টস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তাঁহাকে লইয়া বেনারস যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং মেসো মশায়কে ও মাসীমাকে তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য তাঁহাদিগকে একান্ত অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখন মেসোমশায়ের হাতে কতকগুলি জরুরী কাজ থাকায়, তিনি, তাঁহার বন্ধু-পরিবারের সঙ্গী হইবার জন্য আমার মত চাহিলেন, কিন্তু আমার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নীচে হইতে আমার ডাক পড়িল।

এতদিন পরে ভবানীশঙ্করের মনে পড়িয়াছে, তাই আমাকে নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য আগামীকল্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "যেমন ডুমুরের ফুল হয়েছেন তা'তে এই নেমন্তন্নে পরম আপ্যায়িত হলাম।"

ভবানীশঙ্কর ত্রস্তভাবে যাইবার জন্য উঠিয়া বলিলেন, "খিদিরপুরে কুলিদের ধর্ম্মঘটে আবদ্ধ ছিলুম, তাই আস্‌তে পারিনি। মানুষ-গুলোকে পশুর মত খাটিয়ে নেয় অথচ খোরাকীটাও দিতে চায় না,—এ অন্যায় কি সহ্য করা যায়? কয়েকদিন খুব আন্দোলন করে তবু কিছু কাজ হয়েছে। যা' হোক্ লিলুয়ায় রেবার বাগান

বাড়ীতে চড়িভাতের আয়োজন হয়েছে। কাল সকালেই আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। ঠিক থেকো, হ্যাঁ, রেবা এতদিন তোমার খবর নিতে পারেনি বলে দুঃখিত।"

"তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন।" বলিতেই তিনি বাহির হইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, লোপামুদ্রার রহস্যটী উদ্‌ঘাটিত হইবে, কিন্তু তাহার কোন সূচনা না পাইয়া মনটা দমিয়া গেল।

পরদিবস ভবানীশঙ্কর আমাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া রেবার বাগান-বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। বাগানখানি কাঁচা গাঁথুনীর ইঁটের প্রাচীরে ঘেরা। মাঝখানে একটী একতলা হলদে বাড়ী, পশ্চাতেই ছোট একটী পুকুর, তার একটি পার নানাপ্রকার তরু লতায় ঢাকা। বাড়ীর সম্মুখে চক্রাকার ছোট বাগানে রঙ বেরঙের ফুল মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই নমস্কার করিয়া রেবা এতদিনের অসাক্ষাতের জন্য আমাকে দায়ী করিয়া কহিলেন, "আজ আমার জন্মদিন, তাই পায়ের ধুলো দিতে বলেছি। আসুন ওঘরে আরও কয়েকজন অতিথি আছেন, তাঁদের সঙ্গে বসে গল্প করুন,—আমি ততক্ষণ রান্না বান্নার কাজটা দেখি।"

একটা সবুজ পর্দ্দা সরাইয়া রেবার পশ্চাতে আমি ও ভবানী-শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নানা আকারের ছবি ও ফটোতে সজ্জিত কক্ষটী দিব্য সুপ্রশস্ত। এতক্ষণ বোধ হয় অতিথিদের মধ্যে কি একটা বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক হইতেছিল, আমাকে দেখিয়াই তাঁহারা সম্মিলিত ভাবে শতরঞ্চি হইতে উঠিয়া নমস্কার করিলেন। আমি নমস্কারে তাহার উত্তর দিয়া তাঁদের

সঙ্গে ঢালা বিছানার এক কোণ অধিকার করিয়া লইলাম। অল্পক্ষণ নানা হাস্য রহস্যের পরেই তাঁহারা পূর্ব্বের তর্কটী তুলিয়া হাল্লা বাঁধাইয়া দিলেন। ক্রমে যতই শুনিলাম, ততই বিষয়টা আমার নিকট দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। তর্কটা সঙ্গীত লইয়া। কোন রাগিনীতে সপ্ত সুরের কোন কোন সুর বর্জ্জিত, কোন রাগিনীর মধ্যে একটা সুর লাগাইলেই আর একটা রাগিনী হয়, ধ্রুপদ কেন মরিল, লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী কেন মানুষের এত প্রিয় হইয়াছে, কোনটার সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্টতা বেশী ; আবার কোন আসরে কোন ওস্তাদ ভুলপর্দ্দা লাগাইয়া অপমানিত হইয়াছে, অমুক বড় গায়ক কিন্তু গলার স্বর ভালনা, অমুক মোটেই গায়ক নয়, লোকে মিছামিছি তাহার তারিফ করে ইত্যাদি সব কথাই আমার বুদ্ধির সীমার বাহিরে। সুতরাং আমি হংসমধ্যে বক যথা হইয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তর্কের শেষে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক যখন তবলার সহিত গান গাহিয়া কানে মধু বর্ষণ করিলেন, তখন আমার আর বুঝিবার কিছুই বাকী রহিলনা। গান যদি প্রাণের ঘুমন্ত আত্মাটিকে জাগাইয়া তোলে তবেই গানের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়,—তর্কে শুধু বিচার জন্মে। অবশেষে আহারের ডাক পড়িল। সকলেই হট্টগোলের মধ্যে আহার শেষ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের দোষ গুণ বিচার করিতে করিতে চারিটার সময় একটু আরাম উপভোগ করিবার জন্যে ঢালা বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ভবানীশঙ্কর কাজের ওজর দেখাইয়া বিদায় লইলেন। আমি কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া, চোখের ঘুমকে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী স্থানে অন্তর্ধান হইতে দেখিয়া বাগান-বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বাগান বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বড় বড় অশ্বত্থ কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা চওড়া রাস্তাটী প্রায়ই নীরব। শুধু মাঝে মাঝে এক একটা মোটর ধূলা উড়াইয়া মেদিনী কাঁপাইয়া চলিয়া যায়। দূর হইতে গাড়ীর ফুৎকার ও চলন্ত শব্দ আমার কাণে আসিয়া বাড়ী যাইবার স্বপ্নটীকে সুন্দর করিয়া তুলিল। আমি পশ্চিম ধারে দেওয়ালের পার্শ্বে একটা পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া অপরাহ্নের সূর্য্যালোককে আড়াল করিবার জন্য দেয়ালের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাগানবাড়ীতে চাহিয়া রহিলাম। রৌদ্রের তেজে চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছে, তাই দেওয়ালের কাছে ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলাম। কলিকাতার ইঁট পাথরের স্তূপে বাস করিয়া অনেকদিন এই শস্যশ্যামল সবুজ পত্রপল্লবের রূপ দেখি নাই, তাই মনের মধ্যে বাল্য জীবনের সুখ-স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিল। একে একে ফেলুদার কথা, করুনা দিদির কথা, বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের কথা কনকের সঙ্গে তাঁহার মায়ের দুঃখের ছায়ায় ঢাকা মুখখানি, সমস্তই আমার স্মৃতি-পটে ছায়াচিত্রের মত বেড়াইতে লাগিল। প্রবাসীর পক্ষে বাড়ীর মত আনন্দময় নন্দনকানন আর কিছু হইতে পারে না বলিয়া ধারণা হইল। অকস্মাৎ অলক্ষিতে কয়েক বিন্দু অশ্রুজল আসিয়া মায়ের পদ-যুগল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। এই বিশাল জনপূর্ণ ধরণীর৹ একটী কোণে, আম্র নারিকেল গাছে ঘেরা একটী নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া যিনি আমার মুখখানাকে আদর করিয়া বুকে লইয়া স্নেহ সিঞ্চন করিতেছেন তিনি আমার জননী। বেদনার বাষ্পে বক্ষপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আমি আসন ছাড়িয়া পশ্চাতে দুই হাত যুক্ত করিয়া অন্যমনস্কভাবে

পায়চারী করিতে লাগিলাম। হঠাৎ রমণী-কণ্ঠের চীৎকার শুনিয়া দেয়ালের উপর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, একটী যুবতী ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আকুল আর্ত্তনাদ করিতেছে। গায়ের সমস্ত শক্তিতে বল্গা টানিয়াও ঘোড়ার গতি রোধ করিতে পারিতেছে না। সে পুনঃপুনঃ বলিতেছে, "কে আছেন আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"

মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনের সমস্ত অনুভূতি শীতল পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া উন্মাদ রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। একলাফে দেওয়াল টপ্‌কাইয়া পাকা রাস্তা ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম। বহুদূরে ঘোড়াটী লক্ষ্য হইল, কিন্তু অল্পক্ষণেই তাহাও পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল, ক্ষুরের আওয়াজ আর কানে আসিল না। পা দুটী এমন হাল্‌কা ভাবে ছুটিল যেন আমার সম্মুখে পার্শ্বে কোন বস্তু দেখা যায় না, আমি শূন্যের উপর ছুটিতেছি বলিয়া মনে হইল। সর্ব্বাঙ্গে দরদর ধারে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ আরোহীশূন্য ঘোড়াটা আমার পাশ দিয়া পশ্চিম মুখে তীরের মত ফিরিয়া গেল। ভয় হইল, বোধ হয় যুবতীকে ফেলিয়া ঘোড়াটী গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। অর্দ্ধ মাইল দৌড়িয়া একটা আম্রকাননের পার্শ্বে আসিয়া ভূলুণ্ঠিতা, মূর্চ্ছিতা রমনীর গোঁ গোঁ শব্দ কানে পশিতেই আমি তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তখনও নিশ্বাস বহিতেছে। নিকটবর্ত্তী পুষ্করিনীতে কাপড়ের কোঁচাটা ভিজাইয়া জল আনিয়া তাহার চোখে মুখে মাথায় দিয়া রুমাল দিয়া বাতাস

করিলাম। অল্পক্ষণেই তাহার চক্ষের পাতা খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহার মাথাটী জানুতে স্থাপন করিয়া বাতাস দিতে দিতে কহিলাম, "কনক, কোন ভয় নাই, আমি তোমার মনুদাদা", কনক শুধু একবার আমার দিকে করুণ বিহ্বল নেত্রে চাহিল। তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠযুগল অবরুদ্ধ আবেগে কাঁপিয়া গেল মাত্র। আমি বজ্রাহত পথিকের মত নিস্পলক চক্ষে তাহার মুদিত কমলসদৃশ চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিলাম,—মনোমধ্যে বাতাহত অম্বুর তুমুল আলোড়ন।

কিছুক্ষণ পরে কনক চক্ষু মেলিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "মনুদাদা, একটু জল,—বড় তৃষ্ণা।" আমি তাহাকে সাহায্য করিতেই সে আমার কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া পুকুরে গিয়া আঁচল ভরিয়া জলপান করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাচ্ছিলে ?"

কনক আস্তে আস্তে একটা লিচু গাছের তলায় বসিয়া বাম হাতের উপর মাথাটী ন্যস্ত করিয়া কাৎ হইয়া কহিল, "আমি একটা ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করি। তাঁদেরই ঘোড়া, ঘোড়াটা বোধহয় ষ্টুডিওতে ফিরে গেছে, ওঃ কোমরটাতে এখনও কি বেদনা ; এমন তো কোন দিন হয় নাই। আজই আমার খেয়াল গেল, পাকা পথে ঘোড়াটাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমি তো ওকে নিয়ে অনেক বইয়ে অভিনয় করেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ কেন যে ক্ষেপে উঠ্‌লো, তা বুঝ্‌লাম না—পাগলের মত পাঁই পাঁই ছুট্‌লো—অনেক মারধোর কর্‌লাম কিন্তু এমন লাফানি আরম্ভ কর্‌লে যে, ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটা পড়ে গেল। তারপরে

দুই হাতে লাগাম টেনেও রাখ্‌তে পার্‌লাম না। বোধহয় চার মাইল পথ চলে এসেছি। কিন্তু যা হবার ভালর জন্যেই হল। তোমাকে যে আবার পাব,—এ আশা কোনদিন ছিল না—আকাশে একটা ধ্রুবতারা জ্বলে, কিন্তু আমার হৃদয়ের মধ্যে দুটো চক্ষু এতদিন দুটো ধ্রুব তারার মত জ্বল্‌ছে মনুদাদা, আমি বড় একা! তুমি কি এতদিন পরে এলে?”

বসিয়া বসিয়া আমার মনে হইল, বোধহয় তাহার মাথা এখনও গরম, তাই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, “তুমি কি আমার কাঁধ ধরে যেতে পার্‌বে; না আরও কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে? আমি রেবার বাগানে নেমন্তন্নে এসেছিলাম—তোমার চীৎকার শুনেই এসেছি।”

পুরবী সুরের মত করুণ চক্ষু দুটি অনুপম আলোকে উজ্জ্বল করিয়া কনক বলিল, “রেবাদিদির সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে উনি বলেছিলেন বটে; কিন্তু আমি আর সময় করে উঠ্‌তে পারিনি যে, তোমাকে ডাকিয়ে আনি। যা’ হোক্, হৃদয়ের আকুলতা বোধ হয় কোন দিন ব্যর্থ হয় না,—তাই ভগবান আজ আমার ধ্রুব জ্যোতির সাম্‌নে থেকে মেঘের আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন। রেবাদিদির বাগানটা আমি চিনি, জন্মদিনের উৎসবের জন্য আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিল, কিন্তু পরের চাকরী, তাই সময় পাইনি। কিন্তু ঘোড়া যখন ওঁদের বাগানের সাম্‌নে এল, তখন ওঁর অথবা ভবানীবাবুর কাণে তোল্‌বার জন্যেই আমি সেখানে চেঁচিয়েছিলাম।”

বলিয়াই কনক উঠিয়া আমার কাঁধে ভর করিয়া রাস্তায় আসিয়া

চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার ম্লানিমা সমস্ত পথখানি আবৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পথের আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ফিরিয়া আসিবামাত্র রেবা কনককে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "শৈবলিনীকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন দেখ্‌ছি। কাপড় চোপড় ভিজিয়ে এসেছেন যে, চলুন কাপড় ছেড়ে চা খেয়ে নিন্‌, পরে সব কথা শুন্‌ছি।"

আমি বলিলাম, "উপকার ক'রে তা প্রচার কর্‌লে পাথর হয়ে যাব, বরং আপনাদের অশ্বচালনায় পটু বীর-নারী লোপামুদ্রার মুখেই সব শুন্‌তে পাবেন।"

কনক এতক্ষণে তাহার মানসিক চাঞ্চল্য শান্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "দিদি তোমার জন্মদিনের পর্ব্ব আছে, তাই আমাকেও আস্‌তে হল। আমাকে একখানা শুক্‌নো কাপড় দাও তার পরে সব বল্‌ছি।"

কাপড় ছাড়িয়া কনক চা খাইল। আমি একবাটী গরম দুধ খাইলাম। অতিথিবর্গ কিছুক্ষণ আগেই চলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে আমরা জগুকে দিয়া গাড়ী ডাকাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। কনককে ষ্টুডিওতে পৌঁছাইয়া রেবা আমাকে মাসিমার বাড়ীর সুমুখে নামাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অর্দ্ধসুপ্তি, তন্দ্রার মধ্য দিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া প্রাতের অরুণরাগে যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন পৃথিবীর সকল ছন্দ যেন এক বেতালা তবলার সঙ্গতে ওলট পালট হইয়া যাইতে লাগিল। লোপামুদ্রার সতীত্বের গৌরবে উৎফুল্ল-আননী রেবা যখন বলিয়াছিলেন যে, কোন এক অদৃশ্য আদর্শ পুরুষের জন্য সে তাহার জীবনটাকে পাঁকাল মাছের মত পবিত্র রাখিয়া যাইতেছে, তখন আমার মানসপটে এই দৃঢ়চিত্ত যুবতীর প্রতি যে শ্রদ্ধার আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার সহিত বিগত দিনের লোপামুদ্রার ধ্রুব জ্যোতির বর্ণনাটি যেন কেমন এক সমস্যার জাল বুনিয়া যাইতে লাগিল,—তাহারই এলোমেলো সূত্রগুলি ভাঁজ করিতে আমার মন ক্লান্ত হইয়া উঠিল। লোপামুদ্রা কাহাকেও ভালবাসে না—পারে না, কারণ কোথাও তাহার প্রাণখানি নিবেদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাল কেন সে বলিল, যে দুইটী চক্ষু এতদিন তাহার হৃদাকাশে দুইটী ধ্রুবতারার ন্যায় জ্বলিতেছিল, তাহাদের আবরণ এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হইয়া গেল! আমার প্রতি লোপামুদ্রার হয় তো কোন কারণে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, কিন্তু এমন কি সত্যের আভাস আমার চতুর্দ্দিকে পরিস্ফুট দেখিয়াছে যাহাতে সে প্রথম দর্শনেই এরূপ আবেগ প্রকাশ করিতে পারে? হয় তো সমস্তটাই ভুল। হয় তো বেরার অনুভূতিটাও কল্পনার উপর আগাছার মত শিকড় মেলিয়াছে—তাহা উপড়াইয়া ফেলিলে কোন হানি নাই—

অথবা লোপামুদ্রার গত কল্যকার কথাগুলি তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কুটিলতার পরিচয়ে ভরপুর। কিন্তু কোন মীমাংসার প্রবৃত্তি আসিবার কালে লোপামুদ্রার অনল-সদৃশ চক্ষুর জ্যোতিঃ এমন পবিত্রতার তেজে বিচ্ছুরিত হইতে চাহে যাহাতে আমার মনখানি প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে বাঁশের খুঁটির মত কাঁপিতে থাকে ; কাজেই সম্মুখের সমস্ত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক এক অন্তহীন সমস্যার অন্ধকারে পরিবৃত হইয়া উঠিল।

এই প্রকার চেতনাহীন মন লইয়া সকাল বেলাটার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোনও প্রকারে শেষ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল স্মৃতির আগল ভাঙ্গিয়া একটা মর্ম্মঘাতী দুঃখ আসিয়া লোপামুদ্রার বর্ত্তমান পরিণতির অসম্মানকর আঘাত আমার গায়ে শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। সমস্ত মানসিক দৃঢ়তা, জ্ঞানের প্রতিভা, হৃদয়ের একনিষ্ঠতা বাদ দিয়াও লোপামুদ্রা আজ কলঙ্ক-সাগরের অকূল পাথারে নিমজ্জিত হইবার অপেক্ষায় হাবুডুবু খাইতেছে। সে যদি এই পথে না আসিয়া কোন প্রকারে সতীত্ব বজায় রাখিয়া দরিদ্রের মত তিলে তিলে সংসারের চাপ সহ্য করিয়া দেহপাত করিত, তবুও সে আমার মনের কাছে নির্দ্দোষ রহিয়া যাইত। এখনও তাহার সম্মানের পথে ফিরিয়া যাওয়া সংসারের পক্ষে শুভঙ্কর। এই ভাবে লোপামুদ্রার প্রতি সদুপদেশ দিয়া তাহার জীবনটাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার আশায় আমার চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার সুখ সুবিধার যত আয়োজনই থাক না কেন, তবুও এই পথ ভাল নয়, সুতরাং ত্যাগ করা উচিত। এই প্রকার মনের আবেগে, তাহার সহিত

দেখা করিয়া উপদেশ দিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম, তাই আমার বেনারস যাওয়ার পূর্ব্বে একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়াটাও যেন আবশ্যক মনে করিলাম, এবং তৎমুহূর্ত্তেই আমার শিথিল পা দুটাকে জোর করিয়া লোপামুদ্রার বাড়ীর দিকে চালাইলাম। আকাশে চাঁদের চারিদিকে হাল্‌কা মেঘ জমা হইয়া বন্দুকের শব্দে ভীত কপোতের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। প্রকাণ্ড দোতলা, তেতলা বাড়ীর আবছায়ায় ঢাকা সরু গলিটা পার হইয়া আসিয়া লোপামুদ্রার বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সিঁড়ির রেলিঙয়ের পার্শ্বে রেবার ঘরখানিতে তালা বন্ধ দেখিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। লোপামুদ্রা ঘরের কার্পেটের উপর কতকগুলি ছবি খুলিয়া, একটী একটী করিয়া খরিদ্দারের চক্ষে দেখিয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া সারি দিয়া রাখিতেছে। কোণের তাকের উপর একটা রেডিওতে গান হইতেছে। আমি প্রবেশ করিতেই লোপামুদ্রা উঠিয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "এস, বস এসে মনুদাদা!"

পার্শ্বের একটা কৌচ দেখাইয়া ইঙ্গিত করাতে আমি বসিয়া বলিলাম, "তোমার শরীরের ব্যথা কমেছে কিনা জান্‌তে এলাম, মেয়েছেলে হয়ে ঘোড়ায় চড়াটা বোধ্ হয় সঙ্গত নয়, তাই পড়ে গিয়েছিলে।" লোপামুদ্রা ছবিগুলি গুছাইয়া বুক্‌কেশে বন্ধ করিয়া কহিল, "মেয়েছেলের পক্ষে অনেক কিছুই কর্‌তে নেই, কিন্তু যা'দের এই নিয়মের প্রয়োজন হয় না, তা'দের পক্ষে সবই সমান। যাহোক্, বাড়ী থেকে কতদিন হল এসেছ!"

ইহার পর বাড়ীর কথা লইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর

আমি বলিলাম, "তোমাদের বায়োস্কোপে নাম্‌তে হলে কি বাপ মায়ের দেওয়া নামটাকেও বদলে ফেল্‌তে হয় ?"

"এক রকম তাই। জানতো সন্ন্যাসী হ'তে হ'লে পূর্ব্ব পরিচয়ের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেল্‌তে হয় ? আমরা অবশ্য সন্ন্যাস নিইনি, কিন্তু যাদের আদি নেই অন্ত নেই, মা নেই, বাপ নেই, যারা মাও নয়, স্ত্রী ও নয় তাদের পূর্ব্ব নামটা রেখে কিছু গৌরব নেই। আমাকে কনক বলে ডাক্‌লে এখন আমার লজ্জা হয়। যাঁরা আমার নাম রেখেছিলেন তাঁদের সমাজে ঈশ্বরের পূজা কর্‌তেও আইন মান্‌তে হয়। আমি বাবার কথাই বলছি ; বাবা তো তোমাদেরই জ্ঞাতি। কিন্তু তোমরা কি আমার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে দেবতাকে পূজা কর্‌বার অধিকার দাও। আমি বছর দুই আগে একটা ফিল্মে বুদ্ধদেবের ভক্ত অশোক বইয়ে নেমেছিলুম। তাঁদের তথাগত বলেন, ঈশ্বরের পূজায় কোন আইন কানুন নেই। সকলেরই তাঁকে, স্বেচ্ছামত আরাধনার অধিকার আছে। আর শুনেছি, নট বিলাসিনী শ্রীমতী—, তাঁর নাচগান দিয়ে পূজো করে মুক্তি পেয়েছিলেন। সেই থেকে আমার এই বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর নামটা নেবার দিকে ঝোঁক পড়্‌ল। তাই নিয়ে এখন বেশ মনের জোর পাচ্ছি। এখন আর ঠাকুরঘরের ক্ষুদ্র পরিসরেই দেবতার স্থান দেখ্‌তে পাই না,—সমস্ত পৃথিবীতে যেমন তিনি আছেন আমার এই হৃদয়ের মধ্যেও তেমনি ভাবে বিরাজ করেন। তুমি পান খাও মনুদাদা ?"

"তা খাই। কিন্তু তোমার এখানে বাস করাটা আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না।"

পানের বাটা সম্মুখে লইয়া লোপামুদ্রা কহিল, “সন্দেহ করছ না? তা করবেই তো! তোমরা আমাদের যে এত ছোট ভাব, তার কারণ তোমরা চিরকালই মেয়েদের দুর্ব্বলতার দিক্‌টাই দেখে এসেছ। কিন্তু একথাও জেন মনুদাদা, শুধু সন্দেহ না করে একবার সোজা চক্ষে চেয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা কোরো। আর আমার মা মারা গেছেন আজ চার বছর আগে। মা আমার বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি; আমি মাকে হারিয়ে সংসারে আর আপনার কাউকে পেলুম না। মা কালীঘাটে যে গয়লানীর বাড়ীতে থাক্‌তেন সে আমাকে এক শত টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল,—বেহালার এক জমিদার বাবুর কাছে, এ অপমানটা আমার গায়ে লেখা নেই সত্য কিন্তু আমার মনের মধ্যে এমন একটা কাল দাগ রেখে দিয়েছে যা আমার শত আনন্দ দিয়েও মুছে ফেল্‌তে পার্‌ছি না। আমি কি পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রয়ের জিনিষ? শুধু বাবা আমার মাকে ঘরে তোলেন নাই বলেই আজ আমার এই অবস্থা, কিন্তু আমার এই ক্ষতটাকে মনের জোরে মুছে ফেল্‌তে পারে এমন একটীও মানুষ পাইনা মনুদাদা। শুধু একটীবার যদি কেউ বলে আমার এই অনিচ্ছাকৃত কালীর দাগটা মুছে ফেলা যায় তবেই আমি মুক্তি পাই। সংসারে মেয়ে মানুষের পক্ষে সতীত্বের বড় কিছুই নাই স্বীকার করি, কিন্তু সতীত্বের সংস্কারটা কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে পারিনে। আমাদের কি সম্ভ্রম নেই, আমাদের কি হৃদয়ের পবিত্রতা নেই? আমরা অবশ্য সতীত্বের পথে ফির্‌তে পার্‌ব না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে কি আমাদের ভালবাসাটাকে পবিত্র রাখবারও অধিকার নেই?”

লোপামুদ্রার আবেগলিপ্ত চক্ষের দুই তারকা যেন অন্ধকারে নিশীথিনীর বুকে আলেয়ার মত জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিন্তিত মুখে সুমুখের খোলা জানালাটার দিকে চাহিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের মধ্যে তাহার দুইটী চক্ষুর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া কহিলাম, "সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না কনক, কিন্তু মানুষের মধ্যে মানুষকে বাস কর্‌তে হবেই, আর তার বাসস্থানের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।"

"তা রাখ্‌তে হ'লে কি সূর্য্যের তুলনায় একটী নক্ষত্রকে হেয় মনে কর্‌তে হবে? বাতাসের মধ্যে মশালের কাজ দেওয়াটা হয় তো মোমবাতির পক্ষে কঠিন হবে কিন্তু বাতিটা কাঁপ্‌লেও কি মানুষের কোনই কাজে আসে না?"

"আস্‌তে পারে, কিন্তু মানুষের গতিটাকে বাধা না দিয়ে নয়। সাধারণতঃ মানুষ পাকা পথে চল্‌তেই ভালবাসে, ইচ্ছে করে কেউ কাঁটা পথে যেতে চায় না।"

"এই ইচ্ছাটা যেমন মানুষের সহজাত তেমনি যারা কাঁটা পথে আস্‌ছে তাদের শক্তিটাকে সহৃদয়তা দ্বারা গ্রহণ করাও মানুষের মানবত্বের পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের দেশেই মানুষের, চোক কাণ বুজে জগন্নাথের রথের দড়ির টানে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল,—অন্যান্য দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই গতির মধ্যে শক্তির পরিচয়টী প্রশংসা পায়। গড্ডলিকার মত চলে যাওয়াটার মধ্যে ভুল না থাক্‌লেও কাপুরুষতা বলেই পরিত্যক্ত হয়। এই নাও পান, বংশী!"

বংশীলাল তাহার ভৃত্য। তাহার ডাকে বংশীলাল আসিয়া

দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। লোপা তাহার হাতে পয়সা দিয়া কহিল, "কিছু খাবার আর চুরুট নিয়ে এস"। বংশী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম, "এসব উৎপাত বাড়িও না কনক! আমি এখন উঠি।"

"আমি তো আর কনক নই, কাজেই তোমার কথা না শুন্‌লেও চল্‌বে—যাও বংশী চট্‌ করে নিয়ে এস। আমার এখানে এসে খালি মুখে চলে যাবে আর বাসায় গিয়ে মাসিমার কাছে দুর্নাম করবে তো? মাসিমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয়, নিয়ে যাবে একদিন? দাঁড়াও রেবাদিদিকে নিয়ে আসি," বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "রেবাদিদির এক মাসিমাকে বাঁদরে ছাত থেকে ফেলে দিয়েছে তাই তিনি শ্যামবাজারে তাঁকে দেখ্‌তে গেছেন।"

"বাঁদরগুলো তো রসিক কম নয়। ছাত থেকে মেয়েছেলেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমোদ কর্‌তে চায়। কে এক সাহেব বলেছেন, তাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা নাকি বাঁদর ছিল।"

"শুধু তাঁদের দেশেই কি আর মানুষ বাঁদর ছিল? আমাদের দেশে এখনও পুরুষ-বাঁদরের দল কোন মেয়েছেলেকে একটু খোলা উঁচু জায়গায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা কর্‌তে দেখলে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমোদ পেতে চায়। এই পুরুষদের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে দিলেই তবে তাঁদেরও মুখ পুড়্‌তে পারে। তাঁদের সব সময়েই ধারণা, মেয়েরা মুক্তভাবে কোন দিন উঁচু জায়গায় বিচরণ কর্‌তে পারে না।"

লোপামুদ্রা কথাটা শেষ করিয়া বংশীর হাত হইতে খাবার লইয়া আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিয়া দিল। আমি বলিলাম, "আমিও তো ঐ বাঁদরের দলেরই একজন, আমাকে এত আদর দেখাচ্ছ, কোনদিন আমিও তোমাকে ফেলে না দিলে হয়!"

"যে আমাদের সহস্র অপরাধ জেনেও আমার ভাইয়ের সৎকার করেছিল তাকে আমি এত ছোট ভাব্‌তে পারি না। তুমি কি বল্‌তে চাও যে এই বাঁদরের বংশধর এ দেশে নাই?"

"আমি তো একথা স্বীকার কর্‌তে পারি না।"

"তুমি স্বীকার না কর্‌লেও আমরা ভুলছিনে। আমাদের সঙ্গে একটী ভদ্রঘরের মেয়ে অভিনয় কর্‌ত। একজন বড় অভিনেতা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভালবাসার জালে আবদ্ধ করেছিলেন। ভদ্রঘরের মেয়ে তো, পুরুষের ভেতরের চক্ষুটাকে দেখ্‌তে পায় না! তাই সে সেই অভিনেতাকে ভালবেসে বিয়ে কর্‌বার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। অথচ ঘরে তাঁর স্ত্রী, আবার তাঁর যথেষ্ট উপপত্নীও রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার ভারী দুঃখ হ'ল ঐ সরলা, নির্ব্বোধ মেয়েটার জন্যে। আমরা ভালবাস্‌তে না জান্‌লেও ভালবাসার ভান কর্‌তে পারি ভদ্রঘরের যে কোন মেয়ের চেয়ে বেশী। তাই অল্প দিনেই সেই অভিনেতাটিকে হাত করলুম, অবশ্য সেই মেয়েটী আমার উপর চটে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন পুরুষটিকে আমার পেছনে ছায়ার ন্যায় ঘোরাতে লাগলুম তখনই মেয়েটিকে খোলাখুলি বললুম, যে পুরুষ তাঁর ভালবাসাটাকে অবহেলা কর্‌তে একটুও পশ্চাতের দিকে চাইলে না, সে কি তাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ কর্‌বে? সুতরাং তার উচিত এই বাঁদরের হাত থেকে

চিরতরে রেহাই পাওয়ার জন্য এই ফিল্মের সংশ্রব ত্যাগ করা। মেয়েটী আমার কথায় বায়োস্কোপে অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ে হবার পর তার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাসূচক এক পত্র পেয়েছিলুম। আচ্ছা বলতো, আমি মাঝখানে না পড়্লে সেই মেয়েটীর কি অবস্থা হ'ত? তাঁর ঘরে এক স্ত্রী আছেন, কাজেই তাকে বিয়ে করৃত না নিশ্চয়, কিন্তু এই উৎকট ভালবাসার ফলে মেয়েটাকে আমাদের পাড়ায় চলে আসতে হ'ত। অথচ লোকে দোষারোপ করৃত শুধু ঐ মেয়েটাকে, আর যে বাঁদরটা ওকে ধাক্কা মেরে সরে যেত, সে পাঁচজনের সঙ্গে হাততালি দিয়ে তামাসা দেখ্‌ত। এগুলো কি তোমরা কোন কালেই বিচারকের চোখে দেখ্‌বে না।"

জলখাবার শেষ করিয়া আমি বলিলাম, "আর তো এখানে বসে বাঁদরের গল্প শুন্‌তে পার্‌ছি না কনক! কালই আমি বেনারস যাচ্ছি," বলিয়া মাসীমা ও মেসোমশায়ের কথা সবিস্তারে জানাইলাম।

লোপামুদ্রা আমার সুমুখে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া কহিল, "মেয়েছেলে সবাই ভাল একথা আমি বল্‌ছিনে। এক হাতে কোন দিনই তালি বাজে না, কিন্তু যাঁদের ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, তাঁরা যে মেয়েদের এই কুটিলতা দেখ্‌তে পান না, তা নয়, যাঁরা মেয়েদের কাছে পৌরুষ রাখ্‌তে পারেন না, তাঁরা এ ছলনাটা ইচ্ছা করেই দেখেন না। তাঁদের এই উদাসীনতা কোন কালেই প্রশংসার যোগ্য নয় বরং তাঁদের মধ্যে যে, কোন বন্ধনই স্থায়ীভাবে নাই, এ তারই প্রমাণ।"

"তা'হলে মেয়েদের বেঁধে রাখ্‌বার অধিকার পুরুষের আছে, একথা তুমি অস্বীকার কর না।"

"জোর করে বেঁধে রাখাটাকে আমি স্বীকার করি না। কিন্তু যেখানে একটা জীবন আর একটা জীবনের মধ্যে লীন হতে চলেছে সেখানে বন্ধনটা স্বাবাভিক। মাতৃস্নেহের বন্ধনে যেমন জোর জবরদস্তি নেই, স্বামী স্ত্রীর সত্যিকার বাঁধনেও তেমনি কোন টানা হেঁচড়া নেই। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে ঘিরে চিরকাল চলাফেরা করে—কোন কালেই মুক্ত হতে পারে না তেমনি সত্যিকারের স্ত্রীও স্বামীকে ঘিরে আনাগোনা করে। জোর করে ছিট্‌কে পড়ার মধ্যে কা'রও বিশ্বাসের পরিচয় নাই,—আছে শুধু মানানসই একটা আপোষ। এ যেন দুই প্রতিবেশীর মত একই জমির উপরে ভাগাভাগী করে বাস করা। এই বাস করাতে ঝগড়া না থাক্‌তে পারে কিন্তু কোনদিন কেউ কারো স্বার্থের অংশীদার হবে না সুতরাং সুখ দুঃখের বিনিময় হবে না।"

"স্বামীর বন্ধনটাকে যারা সংস্কার বলে না মানে, তাদের পক্ষে এই বিশ্বাসের পথে মুক্তির দুয়ারটী খোলা রাখাটা তো দোষের কিছু নয় কনক?"

"বেরোবার পথটী খোলা রাখার ইচ্ছাটার মধ্যেই প্রবঞ্চনা রয়েছে। বীজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ছাড়া গাছের অন্য গতি নেই। একদিকে পুরুষের হিমাচলসম কঠোরতা, অপর দিকে অপার জলসিন্ধুর মত গভীর বিরাট ভালবাসা, এই দুইয়ের মধ্যেই স্রোতস্বিনীর মত নারীর জীবন-স্রোত প্রবাহিত। এখানে বন্ধনের তো কোন বালাই নাই। ভালবাসার সিন্ধু-পথে নারী যতদূর ইচ্ছে চলে

যেতে পারে এটুকু উদারতা পুরুষের প্রাণের মধ্যে রাখ্‌ছে। শুধু উৎসের মুখে যে কৃচ্ছতা দেখা যায় তাকে অস্বীকার কর্‌লে ক্ষতিটা নদীর পক্ষে মারাত্মক, পর্ব্বতের পক্ষে কিছু যায় আসে না। সুতরাং এই বন্ধন, যে রমণী মান্‌বে না তার উৎস অচল হবে, তার গতি স্তব্ধ হবে, অন্যথা মরে হেজে লোক সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে।”

আমি চুরুটে টান দিয়া ঘরখানি ধোঁয়ায় ভরিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহা হইতে সরাইবার জন্য একটা ফুঁ দিয়া কহিলাম, “এ কারণেই তো সতীর চেয়ে বড় কেউ নাই কনক!”

“তা তো নাইই! ভালবাসাটিকে কেন্দ্র করে যেখানে নারী একে অপরের কাছে আত্মদান কর্‌তে যাচ্ছে তারাই তো সতী। আবার শুধু বিয়ে হলেই যে সতী হয় এ ধারণাটাও নিতান্ত ভুল। অনুষ্ঠানটিকে মূলধন করে যেখানে সতী অসতীর বিচার হয় সেখানে গলদ আছে। আমি বলি, যে স্থানেই হোক্ না কেন, নারী যেখানে ভালবাসার মূলধন নিয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, সেইখানেই সতীত্বের সত্য মহিমা ফুটে উঠেছে। এই অনুভূতিটা মেয়েদের এখন অপরিত্যাজ্য হয়ে পড়েছে, অন্যথা জীবনের সহজ বিকাশ কোথাও পূর্ণতা লাভ কর্‌বে না।”

“তার মানেই সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাটাকে উল্‌টে দিতে হবে! যাক্‌গে, আজ আর সময় নাই কনক, আর একদিন যদি সময় হয় তবে এ নিয়ে কথা বলব, এখন উঠি।”

আমি উঠিয়া ঘরের বাহিরে সিঁড়ির দিকে চলিয়া আসিলাম।

লোপামুদ্রা আমার পশ্চাতে আসিয়া বলিল, "বেনারসে বেশী দিন থাক্‌তে হলে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখো মনুদাদা !"

"মনে থাক্‌লেই হয়। চিঠি লেখাটা আমার ধাতে সহ্য হয় না।"

"যদি সময় পাও লিখো।"

"আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

সেই রাত্রি তাহার কথার সহিত রেবার কথাগুলির কোন খানে কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা তাহা লইয়া কাটাইলাম। পরদিন মেসোমশায়ের আদেশ মত তাঁহার বন্ধু ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে বেনারস রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনে একটী লোক রাখিবার জন্য সাহেব টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

২৩

নৈরাশ্যভরা মন লইয়া কয়েকটা শুষ্কদিন বেনারসে অতিবাহিত করিবার পর, একদিন হঠাৎ আমার মাথা ভার হইয়া একটু জ্বর দেখা দিল। পূর্ব্বরাত্রে অধিকক্ষণ বারান্দায় পড়িয়া থাকাতে ঠাণ্ডায় শরীর রসস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখিয়া সেদিন উপবাস দিয়া ঘরের বাহির না হইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। ডাক্তারসাহেবও আজ কয়েকদিন হইল কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সকালবেলার ডাকে মাসিমার পত্র পাইলাম, তাঁহারা কিছুদিনের জন্য তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে বাহির হইয়াছেন। ডাক্তারবাবুর নিকট আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন। আমি পত্রখানা পড়িয়া বিছানার কোণে রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম।

দিন তিনেক একজ্বরী অবস্থায় থাকা সত্বেও যখন জ্বর ছাড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, উপরন্তু মাথা ও পাকস্থলীর যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন অন্য কোন সদুপায় না পাইয়া কলিকাতায় মেসো মহাশয়ের বন্ধু ডাক্তারসাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম।

শরীরে কম্পান্বিত জ্বর ও মাথায় দুশ্চিন্তা লইয়া যখন কলিকাতায় ফিরিলাম, ডাক্তারবাবু আমাকে একটা মেসবাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কেননা তাঁহার স্ত্রী ও চাকর তখন বেনারসেই ছিলেন।

হেমন্তের সূর্য্যাস্তের ফিকে রঙের আলোতে আমার সম্মুখের বাড়ীগুলি হরিদ্রা বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাত্রাশেষের বিদায় সম্ভাষণ লইয়া ঐ ম্লান সূর্য্যকিরণ আমার বিছানার উপর চঞ্চল ঢেউ তুলিয়া দরজা জানালার গায়ে খেলা করিতেছে। চক্ষু বুজিয়া এই আশীর্ব্বাদ উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হইল না। ললাটে একটু ম্লান আলোর স্পর্শ গ্রহণ করিয়া বাতায়নের দিকে চাহিয়া রহিলাম, একটু শীত শীত ভাব। র‍্যাপারটা গায়ে জড়াইয়া বিছানার পরে উঠিয়া বসিলাম। বেনারসের কয়েকটা দিনের চিন্তা যেন অসুস্থ দিনের মতই ভারী পাথরের ন্যায় বুকের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহার গুরুত্ব লাঘব করিবার জন্য কয়েকবার কাসিয়া বৃথা শরীরটা অবসন্ন করিলাম। বালিশ কয়টা কোলের উপর তুলিয়া কনুইয়ে ভর দিয়া দুই কাণে হাত দিয়া বসিলাম। ডাক্তারবাবু আমার বুক পরীক্ষা করিয়া ঔষধ খাইবার কথা বলিয়া গেলেন। পথ্যের ব্যবস্থার জন্য মেসের চাকরের কাছে কয়েকটা উপদেশ দিয়া

গেলেন। চাকর আসিয়া আমার ঘরের লণ্ঠনটি পরিষ্কার করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া গেল। মেসবাড়ীর সিঁড়ির মধ্যে কত লোকের পদশব্দ,—কত বিভিন্ন প্রকার আওয়াজে নীচে নামিতেছে উপরে উঠিতেছে। কিন্তু সেগুলি আমার কাণের বাহিরে থাকিয়াই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যাঁহার রুক্ষ কাশি শোনা গেল তিনি ভবানীশঙ্কর। চৌকির পার্শ্বে বসিয়া তিনি কহিলেন, "পশ্চিমে যায় স্বাস্থের জন্য; আর তুমি অসুখ নিয়ে এলে। ডাক্তারবাবু দেখ্ছেন বোধ হয়। এখন তো তিনি অমলেন্দু বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। আমি প্রায়ই এসে ব্যারিষ্টার সাহেব ও ডাক্তারবাবুর কাছে তোমার খোঁজ নিয়েছি। আজও এসেছিলুম কিন্তু তোমার অসুখ দেখে ভাল লাগ্ছে না। শীগ্গীর সেরে ওঠ? তুমি অসুস্থ থাক্লে চল্বে কেন? তাড়াতাড়ি ভাল হও।"

আমি তাহাকে চা দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিলাম। বলিলাম, "অসুখটা তো আমার চাকর নয় যে, যখনই বল্বো চলে যাবে! অনেকদিন জ্বর জ্বালা হয়নি তাই বোধ হয় এবার সহজে ছাড়বে না। ডাক্তারবাবু তো কিছু বলেন না কিন্তু আমার বড় সন্দেহ হয়, বোধ হয় লক্ষণ ভাল নয়।"

"কিছু না, কিছু না। অনেক দিনের পর জ্বর হয়েছে ব'লেই! তা দশ বার দিনের জ্বরেই ভালমন্দের বিচার কর্তে যাচ্ছ কেন। জ্বর কি আর কারো হয় না?"

"যাক্গে, রেবাদিদি কেমন আছেন?"

"ভালই আছে। তোমার সঙ্গে দেখা কর্তে আজই আস্বে।

যে বেয়াড়া স্ত্রীলোক, তার জন্যে কোন কাজ করার যো নেই। এর মধ্যে আমার ডেরাতে পুলিসের শুভাগমন হয়েছিল, সেই থেকে ও কেবল বাধা দিচ্ছে। আমার কি এখন মেয়েদের স্নেহের পায়ে আত্মদান করার অবসর আছে? গরীব দুঃখীদের মধ্যে একটুও জীবনের সাড়া তুলে দিই, তারপর ছুটি। তা'হলে তুমি বসো আমি এলুম বলে।"

ভবানীশঙ্কর উঠিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি এস্রাজের তারের মত লম্বা হইয়া আপাদ মস্তক লেপ চাপা দিলাম। এই মানুষটাকে লোকে কতপ্রকারে খারাপ ভাবে। অবণী পর্য্যন্ত তাঁহার দুর্নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুত্রগুলি আমার সম্মুখে ছিঁরিয়া দেখাইয়া অশ্রুপাত করিয়াছে। কিন্তু এই পিতৃমাতৃস্নেহ বঞ্চিত, ভদ্রসমাজ পরিত্যক্ত, দরিদ্র সন্তানের রুক্ষ বুকের তলে যে বিরাট ত্যাগের সৌন্দর্য্য অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় গভীর, তাহা কি কেহ লক্ষ্য করিবে না! জগতের মধ্যে অপমানিত, উপদ্রুত, লাঞ্ছিত গরীবের প্রাণের তারে তার মিলাইয়া যে সদাশয় যুবকের মন, আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছে তাহার মহত্বের পরিমাপ করা কি শুধু একটা সংস্কারের মাপকাটিতে সম্ভব? রূপবতী রেবার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষিণীর ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়ে বাস করিয়াও তিনি দরিদ্রের দুঃখের গ্লানি ভুলিতে পারেন না, তাই রেবার স্নেহের দুর্ব্বলতা তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। ভবানী-শঙ্করের হৃদয়ের দয়া ত্যাগ সহানুভূতি ঔদার্য্য সমস্ত আমার রুগ্ন দেহটাকে কিয়ৎকালের জন্য স্তব্ধ নির্ব্বিকার সৌম্য শান্ত করিয়া রাখিল। কতক্ষণ এইভাবে ইহলোকের চেতনা হইতে

মুক্ত ছিলাম বুঝি নাই কিন্তু ললাটে কোমল ফুলের স্পর্শে চক্ষু মেলিলাম। আমার মাথার চুলগুলি ছিঁরিয়া রেবা বলিলেন, "আপনি কি ঘুমিয়েছিলেন ?"

"না ঘুমাই নি, কতক্ষণ এসেছেন ?"

রেবা আমার দিকে চাহিয়া পার্শ্বে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এতদিন অসুখ হয়েছে আর একটা খবর দিলেও কি মান সম্ভ্রমের হানি হতো ?"

"মান সম্ভ্রমের কথা মনে আসে নাই। কনকও এসেছে দেখ্‌ছি। মেসবাড়ী, তাই ভাব্‌ছি মান সম্ভ্রমের দোহাই এখন পাড়্‌তে হবে না কি ?"

রেবা আমার কথাটার মধ্যে ফাঁক না রাখিয়া বলিলেন, "আমরা এখানে থাকৃতে আসি নাই। অসুখ শরীরেও ঝাল্‌টি ঠিক আছে! এই নিন আপনার সাগু এসেছে।" বলিয়া ভৃত্যের হাত হইতে সাগুর বাটি লইয়া পুনরায় বলিলেন, "তবুও একটীবার পত্র লিখ্‌তে হয়। আমরা তো পর, সংসারে সকলের কাছেই পর, কারও এমন মাথা ব্যথা নাই যে আমাদের মত লোকের কথা শোনে।"

ভবানীশঙ্করের প্রতি একটা সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া রেবা চুপ করিলেন। লোপামুদ্রা আমার মুখের কাছে সাগুর বাটিটা ধরিয়া বলিল, "মাথা থাকৃলে তবে তো ব্যথা হবে—নাও আমিই খাইয়ে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে জ্বরের ঘোরে আমার বাকশক্তি লোপ পাইল। শরীরের সমস্ত অংশে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া সংজ্ঞাহীনের

মত বিছানায় মিশিয়া রহিলাম। ভবানীশঙ্কর ও রেবা কখন গেলেন তাহা টের পাইলাম না। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। ঘরের মধ্যে ম্লান লণ্ঠনের আলোটা অস্পষ্টতা বৃদ্ধি করিতেছে—দেয়ালের গায়ে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে যাওয়ার উদ্যম প্রচার করিতেছে। পায়ের উপর করস্পর্শ অনুভব করিয়া চাহিয়া আমি জ্বরের যাতনা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইলাম। আমি অকস্মাৎ নিদ্রোত্থিতের মত চাহিয়া লোপামুদ্রাকে উপবিষ্টা দেখিয়া আশ্চর্য্য হতভম্বের মত বলিলাম, "তুমি এখানে এত রাত্তিরে?"

লোপামুদ্রা আমার কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "তোমার কি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি একটু বাতাস করি, ঘুমোও।"

বলিয়া সে তালপাখাটা তুলিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। আমি তাহার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে মূঢ়ের মত পড়িয়া থাকিয়া কহিলাম, "মেসবাড়ীতে তুমি কোন্ সাহসে রয়েছ? ডাক্তারবাবু ও ব্যারিষ্টার সাহেব শুন্‌লে কি বল্‌বেন?"

লোপা আমার গালের উপর বিস্রস্ত চুলগুলি উল্টাইয়া দিয়া কহিল, "মেস ব'লে কি অসুখ কর্‌লেও আত্মীয় স্বজনের থাক্‌তে মানা আছে? ডাক্তারবাবুরা শুন্‌লেও তোমার দোষের কিছু নেই, তোমার সেবা করার যে একজন লোকের দরকার তা আমিই তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

"তুমি তা বল্‌তে পার্‌বে। কিন্তু আমি তো সমাজের আইন ও শৃঙ্খলা মানি, আমার পক্ষে তোমার এই সাহসটাও অতিরিক্ত।

এখন আর উপায় নাই, ভোরেই তুমি চলে যেও। সকাল বেলা ডাক্তারবাবুরা আস্‌বেন।”

“আচ্ছা সে যাব’খন; তুমি ঘুমোও, এভাবে আর জেগে থেকো না।” লোপা আমার মাথার উপর পাখাটা ঘোরাইয়া যাইতে লাগিল। আস্তে আস্তে আমার অবসন্ন চক্ষুর উপর ঘুমের প্রলেপ পড়িল। ভয়ের স্বপ্ন দেখিয়া মানুষ যেভাবে উঠিয়া বসে, প্রভাতে আমি তেমনি ত্রস্তভাবে বিছানার উপর বসিয়াই, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত বরফের ন্যায় জমিয়া যাইতেছে, টের পাইলাম। মেঝের উপরে আঁচল বিছাইয়া একটী পরিত্যক্ত ফুলমালার মত লোপামুদ্রা শিথিল দেহে মুদ্রিত চক্ষে পড়িয়া আছে। তাহার স্তব্ধগতি-চরণের মধ্যে একটী সসঙ্কোচ সাবধানতা, হৃদয়ের করুণা-সুন্দর হস্তদুটির সবিনয় শিথিলতা, ভ্রমর-চঞ্চল চক্ষুদুটির প্রগাঢ় বিভোরতা, যেন সমস্ত দেহখানি হইতে স্ফুরিত একটী পবিত্র স্নেহের মাধুর্য্যে নির্ব্বিকার লালিত্যে অধরোষ্ঠ দুটিকে কমলের মত লীলায়িত করিয়া তুলিতেছে। রাত্রে তাহাকে প্রভাতের সঙ্গে বিদায় লইবার কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু সূর্য্যালোকে আমার মনের সে আবেগ যেন অঙ্কুশাহত ফণিনীর মত করুণার বিবরে প্রবেশ করিল,—তাহাকে জাগাইবার সাহস হইল না। ঘরের দুয়ার খুলিবামাত্র যে, সংসারের প্রতিদিনের স্বচ্ছন্দতা এক মুহূর্ত্তে কুৎসিৎ কজ্জলে লেপিয়া পুছিয়া একাকার হইয়া যাইবে, সে জ্ঞানটাকে যেন জোর করিয়া পানার মত সরাইয়া রাখিতে চাহিলাম। ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার, সংসারের সম্ভ্রম, সঙ্কোচ এই মুহূর্ত্তে যে কঠিন পীড়নে জর্জ্জরিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে পা ফেলিবার ঠাঁই মিলিবে না এ

আশঙ্কা যেন আমার নিরন্ধ্র মনের প্রাচীরের তলে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল। লোপামুদ্রাকে জাগাইবার সাহস হইল না—পুনরায় ঘুমাইবার ভাণ করিয়া র‍্যাপার চাপা দিলাম।

খানিকক্ষণ পরে কড়া নাড়ার শব্দে চাহিয়া দেখিলাম, লোপামুদ্রা দরোজার খিলটা খুলিয়া ডাক্তারবাবুকে পথ ছাড়িয়া এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আমার শরীরের জ্বর যেন তিন ডিগ্রী কমিয়া গেল। লজ্জায়, কুণ্ঠায় র‍্যাপারটা গুছাইয়া পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু আমার অবস্থা জানিবার জন্যে অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু আমার শুষ্ক জিহ্বা ভারী পাথরের মত আমার কণ্ঠরোধ করিয়া আনিল। শুনিলাম, লোপামুদ্রা রাত্রের সমস্ত অবস্থা জানাইয়া চুপ করিতেই ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আপনি এসেছেন ভালই হ'ল, রোগীর টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে সরিয়ে একটু ভাল শুশ্রূষার দরকার। এ রোগের শুশ্রূষাই ঔষধ।"

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন। লোপামুদ্রা আমার খাটের পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "আমি চাকরটাকে ঔষধ পথ্যের কথা বলে দিয়ে যাচ্ছি। বেদানার রসটা তুলে আমি চলে যাব। খানিকক্ষণ পরে এসে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

আমি পুনরায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, "তোমার বাড়ীতে আমার যাওয়ার অধিকার নাই কনক! তোমাদের হয় তো মানসম্ভ্রমের ভয় নাই, কিন্তু আমি এখনও ইহকালটাকে পরকালের মতই দেখি—তোমাকে আর আস্‌তে হবে না—এখানে মেসের লোকেই আমার শুশ্রূষা করবে।"

লোপামুদ্রার স্থির ঘন চক্ষুদুটি ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এখানে তোমাকে দেখ্‌বে কে?

ডাক্তারবাবু যে অসুখের কথা বল্‌লেন তাতে আমি এখানে কিছুতেই তোমাকে ফেলে যেতে পার্‌ব না। তা'হলে আমাকেও এখানে এসে থাক্‌তে হবে।"

"আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে কনক, আমায় ক্ষমা কোরো! তুমি অনর্থক চিন্তা করে ব্যথিত হয়ো না, আমি এইখানেই বেশ থাক্‌ব।"

"সংসারের সব জিনিষই কি তুমি বুঝ্‌তে পার?"

"না, তা পারি না যদিও।"

"তা'হলে এটাও তোমার না বুঝ্‌লে চল্‌বে। রোগীর ইচ্ছা ডাক্তারের ইচ্ছার কাছে তুচ্ছ। ডাক্তারবাবু এখান থেকে সরিয়ে নিতে বলেছেন, আমি আর একদিনও তোমাকে এখানে রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

বিস্ফারিত লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোপামুদ্রা আয়নাটা তুলিয়া অবিন্যস্ত কবরী গুছাইয়া লঘুচরণে চক্ষের পলকে বহির্গত হইল। আমি বিমূঢ় বিস্ময়ে তাহার পরিত্যক্ত কথাগুলির ঝঙ্কার, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সকল আস্‌বাবপত্রের উপরে প্রলেপের মত দেখিয়া প্রস্তর পুত্তলির মত বসিয়া রহিলাম। সংসারে স্ত্রীলোকের স্নেহ অনেকবার অনেক ঘটনায় আমার মনের উপর অরুণিমার সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়াছে, কিন্তু লোপামুদ্রার স্নেহের প্রবাহটি যেন একটা বিরাট শক্তি লইয়া আমাকে তাহার খরস্রোতে ভাসাইয়া লইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে। ইহাতে

ভাব আছে বিচার নাই, আঘাত আছে হিংসা নাই, বেদনা আছে অশ্রু নাই, যেন সহজ স্বচ্ছন্দ ঝরণাধারা শুধু নির্ম্মল বেগটিকে সম্বল করিয়া শুভ্র হাস্যে সমস্ত নির্জ্জনতা মুখরিত করিয়া তোলে।

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে লোপামুদ্রা আসিল না। কিন্তু আমার জ্বর বাড়িয়া মধ্যাহ্নে প্রলাপ বকিলাম। অপরাহ্নে লোপামুদ্রা, রেবা ও ভবানীশঙ্কর আসিলেন টের পাইলাম। আমাকে ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেলেন, কিন্তু এমন সহজ জ্ঞান তখন ছিল না যে একটিবার প্রতিবাদ করি, কারণ আমার মস্তিষ্কের ভিতর তখন যেন আগুণ লাগিয়া গিয়াছিল। ইহার পর কোথা দিয়া দিনের শেষে রাত্রি আসিল, রাত্রির পর প্রভাত রবি উদিত হইল তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে আমার সেবা করিবার সময় লোপামুদ্রার অশ্রুসিক্ত আয়ত চক্ষুদুটী যেন স্বপ্নের আবছায়ার মধ্য দিয়া মমতার আবর্ত্তে পরিপ্লুত দেখিতে পাইলাম। স্তব্ধ সুনিবিড় নিশীথ নিরবতার মধ্যে চকিত জাগরণে লোপামুদ্রা আমার মাথায় বরফের ব্যাগ চাপাইয়া বসিয়া আছে দেখিয়াও চিন্তা করিবার ক্ষমতা পাইলাম না।

২৬

পঁয়তাল্লিশ দিন পরে হাড় কখানা সম্বল করিয়া দুর্ব্বল দেহখানি যে পুনরায় ধরাধামে সুস্থ হইয়া বিচরণ করিবার জন্য মিটিমিটি করিতেছে তাহা বুঝিয়া একটু আনন্দ পাইলাম। দগ্ধ, ভস্মীভূত গৃহের কয়েকটা খুঁটি অবশিষ্ট দেখিলে গৃহস্থের প্রাণে যেমন সান্ত্বনা-

কণা প্রকাশ পায়, চলচ্ছক্তি রহিত দেহটাকে পাইয়া আমিও তেমনি সান্ত্বনা অনুভব করিলাম। তখনও উঠিয়া হাঁটিয়া চলিতে পারি না, দিন রাত্রি শয্যায় পড়িয়া থাকি। সেদিনও বাহিরের ধোঁয়ার প্রবেশ রোধ করিবার জন্য লোপামুদ্রা কক্ষের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া আলোটা জ্বালাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ঔষধ ও ফলের রস আনিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "ওষুধটা খেয়ে নাও, আজ অমাবস্তে, রাত্তিরে রুটি দেব না, এই রসটুকু খেয়ে নাও, একটু দুধ এনে দিচ্ছি।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার আদেশ পালন করিয়া পাশ ফিরিলাম। লোপামুদ্রা উঠিয়া গেল। আমি সম্মুখের দেওয়ালে ধ্যানাবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। অসুখের মধ্যে যেরূপ ভাবেই কাটিয়া থাকুক, আজ যেন আমার সকল সংস্কার বহুদিনের নিদ্রার পর চক্ষু মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। লোপামুদ্রা তাহার সকল ধর্ম্ম, সকল আচার বিসর্জ্জন দিয়া এক অন্ধকার পথে যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহার বাড়ীতে তাহার সেবার ফসলটি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ। আমার সকলেই আছে, তাহার কেহ নাই। আমার পক্ষে সমাজ ত্যাগ যত অনিষ্টকর তাহার ন্যায় স্ত্রীলোকের পক্ষে তত ক্ষতিকর নয়। এতদিন উহার এখানে তাহার পাপ পথে উপার্জ্জিত অর্থের সাহায্য পাওয়াতে যে প্রত্যক্ষভাবে পাপের অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। মুহূর্ত্তে লোপার সেবা, নিষ্ঠা, উদ্বেগ আকুলতা যে লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারের স্বার্থে কলঙ্কিত তাহা অনুভব করিয়া তাহার সকল স্নেহ, মমতা, আমার সর্ব্ব শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার

জন্য খাড়া হইয়া বসিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দুধের বাটি হাতে লোপামুদ্রা আসিয়া আমাকে দুধ খাওয়াইয়া গেল। সম্মুখে অনাবিল সরলতা লইয়া যখন সে ঘরে প্রবেশ করিল তখন আমার বিদ্রোহ আর মাথা তুলিতে পারিল না। সংসারে মানুষের অন্তরে যত অবিচারই পুঞ্জিকৃত হইয়া থাকুক তাহার নিঃস্বার্থ সেবা, নিষ্কলুষ স্নেহের দাবীটিকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তি যেন আমার আবর্ত্তিত চিত্তে খুঁজিয়া পাইলাম না।

পর দিবস হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবল বিরোধের ভাব লোপামুদ্রার নীরব কল্যাণ কামনার পায়ে শত শত বার ছিন্নমূল লতিকার মত লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। এক প্রকার বেদনাসিক্ত আনন্দ আমাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল। কিন্তু লোপামুদ্রার অক্লান্ত সেবাপ্রবাহের মধ্যে এমন একটী সহজ ধৈর্য্য বিরাজ করে যাহার জন্য তাহার অন্তরের রহস্যটী আমার বিশৃঙ্খল মনে ধরা পড়িল না। হয় তো লোপামুদ্রা আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া মায়ার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছে, হয়তো সে ভালবাসার রাখী-বন্ধনে তাহার মনের হস্তখানিতে মিলনের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার এই অপরিণামদর্শী কল্পনাটি আমার জীবনের পক্ষে কোন কালেই সুন্দরের প্রতীক হইবে না।

কয়েকদিন পরে সমস্ত আকাশ কুয়াশায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা আমি হেলান দিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। এখন শরীরে একটু শক্তি পাই, কাজেই এস্থান ত্যাগ করিয়া মাসিমার কাছে ফিরিয়া যাইব ভাবিতেছি। লোপামুদ্রা হয় তো আর আমাকে মুক্তি দিতে চাহিবে না। কিন্তু যেমন করিয়াই হো'ক্

আমাকে দুই একদিনের মধ্যে এই সুখনীড় ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। পার্শ্বে তাহার শয়ন কক্ষে সকাল বেলা কাহারা আসিয়াছে তাহার জন্যে সে আর এদিকে আসিতে পারে নাই। আমার জলখাবার তামাকের ব্যবস্থা করিয়া সে তাহার ঘরে গিয়া বসিয়াছে আর এখন বেলা দশটা বাজে তবু তার দেখা নাই। তাহার ঘরে মাঝে মাঝে কয়েকজন লোকের কলহাস্যের ধ্বনি শোনা যাইতেছে। আমার ভারাক্রান্ত চিত্তের সমস্ত ধৈর্য্য লোপামুদ্রার কলঙ্কের তাপে গলিয়া যাইতে লাগিল। আমাকে সে সত্যই ভালবাসিলে আমার এই রুগ্ন অবস্থার মধ্যে সে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আমোদ করিত না। তাহার মনের মধ্যে যদি আমিই বাসা বাঁধিয়াছি বলিয়া তাহার একমাত্র সান্ত্বনা হইত তবে আমার চক্ষের সম্মুখে তাহার এই দ্বিভাব সংঘটিত হইত না। এক নিমেষে তাহার নিষ্ঠা তাহার রাত্রি জাগরণ সমস্তই শূন্যে মিলাইয়া গেল, তাহার প্রতি কোন শ্রদ্ধা অবশিষ্ট রহিল না। কাঁচপোকা যেমন আরসুলাকে টানিয়া লইয়া যায় লোপামুদ্রা বোধ হয় আমাকে তেমনি ভাবে টানিয়া নিতে চায়, কিন্তু আর একদিনও আমি এই ছলনাময়ীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করিতে নারাজ। সম্মুখে ভরা নদী কুল কুলু বেগে প্রবাহিত হইবে আর আমার সমস্ত গ্রামখানি আগুণের জঠরে প্রবেশ লাভ করিবে—অথচ সামনের অপরিমেয় জলরাশি আমার কোন সাহায্যে আসিবে না,এ অবিচার সহ্য করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল। আমার বিদায়ের বিরুদ্ধে তাহার যত কঠিন প্রতিবন্ধক আসুক আমি আর তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতে চাই না, তাই বিদায় লইবার উত্তেজনায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে আরম্ভ করিলাম।

সমস্ত দিন তাহাকে আমার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিবার জন্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত আমার জিহ্বা এ বিষয়ে সাড়া তুলিল না। লেপ জড়াইয়া দশটার আগেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার সময় হইতে লোপামুদ্রা বাড়ীতে নেই, কোথায় তাহার বইয়ের অভিনয় হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য গিয়াছিল।

তখনও নিবিড়ভাবে চক্ষের পাতায় ঘুমের বন্ধন জড়িত হয় নাই। দরজার ছিটকিনি বন্ধের শব্দে চাহিয়া দেখিলাম লোপামুদ্রা ঘরের আলো জ্বালিয়া ব্যাঘ্রের ছবি আঁকা মাতুরটা পাতিয়া ঘরের মেঝেতে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আস্তে আস্তে পা টিপিয়া আমার কাছে আসিয়া লেপটার সকল ফাঁক বন্ধ করিবার জন্য ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া গেল। আমি মাঝে মাঝে চক্ষু মিলিয়া তাহার কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু জাগরণের লক্ষণ তাহার নিকট গোপন রাখিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সে পুনরায় উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। আমি তাহার অকস্মাৎ এই খেয়ালের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলাম না। আমার এখানে আসিবার পর হইতে সে কোনও দিনই আমার ঘরে রাত্রিবাস করে নাই কাজেই আজিকার পরিবর্ত্তনটী আমার মনে সন্দেহের ঢেউ তুলিল। কিন্তু বেশীক্ষণ ইহা লইয়া তোলাপাড়া করিবার সময় পাইলাম না,—ঘুমের আবেগে সমস্ত চেতনার উপর যবনিকাপাত হইল।

পরদিবস আচ্ছন্ন অন্তর লইয়া একটু বেলায় শয্যাত্যাগ করিলাম। লোপামুদ্রা আমার আগেই স্নান সমাপন করিয়া আমার

কাছে আসিয়া বসিল। ভৃত্য বংশীলাল আমায় চা তামাক দিয়া গেল। আমি চা খাইয়া সটকার নলটা মুখে দিয়া একমনে তামাক টানিয়া চলিয়াছি। লোপামুদ্রা বলিল, "কাল রাত্তিরে কি বিপদেই পড়েছিলাম,—বোম্বাই থেকে একটা বড় ফিল্ম কোম্পানীর ম্যানেজার কাল সকালে আমার এখানে এসেছিলেন রাত্তিরেও আমার এইখানেই ছিলেন। রাত্তিরে তাঁদের এখানকার আপিসে গেলুম। যা'হো'ক্ তাঁদের এখানে ডবল মাইনেতে কাজ ঠিক হল। কিন্তু কি বেয়াড়া, রাত্তিরে আমাকে খেতে দিলে না। আমি তো যেখানে সেখানে কোন দিনই খাই না তা আবার মাছ মাংস দিয়ে তারা খুব অনুরোধ আরম্ভ করলে। কাজেই আমায় বাধ্য হয়ে উপোষ থাকতে হল। আজ একটু সকাল সকাল রান্নাটা করে নিই তোমার জন্যেও ঝোল ভাতটা সকালেই হয়ে যাবে। কালও তো কিছু খাও নি, আজ শরীরটা একটু ভাল ঠেক্‌ছে না?"

আমি তামাকের ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিলাম, "আর কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না এখন সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।"

লোপামুদ্রা উঠিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কহিল, "তোমার পয় আছে তাই আমার ভাল চাকুরী হ'ল।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাই তার মূল্য দিলে নাকি?"

"বাঃ মূল্য দিতে যাব কেন? নমস্যদের প্রণাম কর্‌লে মনের মধ্যে জোর পাওয়া যায়। আমি গম্ভীর মুখে উচ্ছৃতপ্রায় হাসি দাঁতের তলে চাপিয়া কহিলাম, ব্রাহ্মণদের এই জিনিষটা প্রাপ্য। না দিলে বরং অসন্তুষ্ট হই।"

লোপামুদ্রা আমার দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া চক্ষু দুটি উৎফুল্ল করিয়া কহিল, "তোমার আবার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি আছে নাকি, কই এতদিন তো প্রণাম করি নাই,—কোন প্রকার ব্যতিক্রম তো তোমার মধ্যে দেখি নাই। যা হোক, আমি কাল বংশীকে মাসিমার বাড়ী পাঠিয়েছিলুম। দারোয়ান বলেছে তাঁরা দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌বেন। তাই আমার মনে হয় এর মধ্যে তোমার সেখানে চলে যাওয়া দরকার।"

অকস্মাৎ আমার মুখেব উপর দিয়া একটা কালবোশেখীর পূর্ব্বাভাষ বহিয়া গেল, কিন্তু আমি তাহা কৃত্রিম হাসির অন্তরালে ঢাকিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে একটা কথা বল্‌ব ভেবেছিলুম। এখানে থাকি জান্‌বার আগে মাসিমার কাছে যাওয়া দরকার, সে জন্যেই আমি তোমাকে জানাচ্ছি।"

"তবে আমার ইচ্ছা ছিল আরও কয়েকটী দিন রেখে একটু চাঙ্গ করে দিই। মাসিমাও অবশ্য তোমাকে যত্ন কর্‌বেন। তবু আমাদের মন এত স্বার্থপর যে সম্মুখে না থাক্‌লে আমরা কল্যাণ কামনার শক্তিটাকেও বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। এখান থেকে চলে গেলেও যে তুমি সুখে থাক্‌তে পার্‌বে এ বিশ্বাসটুকু আস্‌বার পক্ষে আমার মস্ত বড় সন্দেহ রাখ্‌ছে। এখনও আমার মন সত্য বস্তুটী ধর্‌তে পারে নাই না?"

আমি চুপ করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল না। সে পুনশ্চ বলিল, "তুমি বসো আমি রান্নাটা শেষ করে আবার আসব'খন।"

বৈকালে চা খাইয়া কাপড় জামা পরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

লোপামুদ্রা আমার ঘরে ধূপ জ্বালাইয়া বলিল, "তুমি কি কোথাও বেরুবে নাকি? একটুখানি বেড়িয়ে বাইরের হাওয়া লাগালে মন্দ হয় না। গড়ের মাঠের দিকে যাবে?"

আমি তাহার সকাল বেলার কথার সঙ্গে এখনকার কথার কোন সামঞ্জস্য না দেখিয়া গম্ভীর অকাট্য ছন্দে বলিলাম, "না এখনি মাসিমার বাড়ী যাব। যদি তারা না এসে থাকেন তবে মেসে গিয়ে দুই তিন দিন থাক্‌ব। তাই তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। একেবারে না বলে যাওয়াটা তো ভাল নয়, না হ'লে আরও আগেই বেরিয়ে যেতাম।"

লোপামুদ্রার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইতেছিল, তাহার গতিরোধ করিয়া চক্ষুর মধ্যে একটা সংযমের বেদনা ফুটিয়া বলিল, "তা বেশতো, আজই গেলে মন্দ হয় না, মাসিমা কখন এসে পড়্‌বেন. তার তো কিছুই ঠিক নাই, বংশীকে তোমার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি ট্যাক্সিতে করে দিয়ে আস্‌বে।"

আমি ঘরের এ কোণ হইতে ও কোণ পায়চারি করিয়া আনত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "না আমি রাস্তা ঘাট সবই চিনি, হেঁটেই চলে যাব, অনর্থক জেনে শুনে আর তোমার পয়সার সদগতি কর্‌ব না।"

অকস্মাৎ লোপামুদ্রার চক্ষু দুইটী আগুনের মত রঙীন হইয়া উঠিল, "বলিল, তা'হলে না জেনেই বুঝি আমার কাছে থাক্‌তে পেরেছিলে, এত ঘৃণা কর আমাকে! তা কর্‌বেই তো—তোমার উপর তো কোন দাবী নাই—তবে একথাও জেন, আমার অর্থ কোন অন্যায় পথে আসে নাই। পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করি তার জন্তে তোমাদের সঙ্কোচের কিছু নাই।"

"সঙ্কোচের কথা হচ্ছে না কনক, আমার জ্ঞান থাক্‌লে এখানে আন্‌তে পার্‌তে কিনা সন্দেহ। যতই কাপড় চোপড় পরিয়ে বার কর কাল রূপ কোনদিন চাপা থাক্‌বে না। আমার মত তোমার যদি পরকালের ভয় থাক্‌ত তবে আমাকে আন্‌তে যেতে না। যাক্, যা হবার হয়েছে, তোমার পরিশ্রমের জন্ম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন এপথ তুমি শীঘ্রই ত্যাগ কর্‌তে পার।"

লোপামুদ্রার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সে তাহা সম্বরণ করিয়া ধীরে মৃদুস্বরে বলিল, "পরকাল আমি সত্যি মানিনে। পরকাল তুমিও যেরূপ দেখ্‌তে পাচ্ছ না আমিও তেমনি দেখি না, কাজেই একটা কল্পনার ফানুসে চড়ে বেড়াবার সখও আমার কম। তা'হলে তুমি আর আমার এখানে আস্‌বে বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যেখানেই থাক, আমার অনুরোধ, আশীর্ব্বাদটি যেন আমার প্রতি সমান ভাবেই থাকে।"

বলিয়া সে একটা উদ্গতপ্রায় অশ্রুজল চাপিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিলাম। সম্মুখে সমস্ত পথ, লোকজন, যেন এক ভূমিকম্পের আলোড়নে কাঁপিতে লাগিল।

দাবার চাল ভুল করিয়া রাজা মারা দিলে যেরূপ আপশোষ হয় লোপামুদ্রার নিকট হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আমার মনের মধ্যে তেমনি বিক্ষোভ। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার গোপন আয়োজন ব্যর্থ হইয়া আক্রান্ত হইলে যেরূপ অপ্রস্তুত হইতে হয় আমিও তেমনি ভাবে অপদস্থ হইয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া অসিয়াছি। ব্যর্থতার অগ্নিদাহে আমার মনখানি পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে লোপামুদ্রার রহস্যজাল আরও জটিল হইয়া দেখা দিল। লোপামুদ্রা আমাকে ধরিয়া রাখিবে, আসিতে দিবে না ইত্যাদি কল্পনা যে শুধু আমার মনের দুর্ব্বলতার প্রকাশ তাহা প্রমাণিত করিয়া লোপামুদ্রা নিজেই আমাকে বিদায় দিয়া আমার ক্ষোভের তরঙ্গ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। তাহার বিদায় দেওয়াতে আমি যতদূর দুঃখিত না হইয়াছি তাহার বিরাট ঔদাসীন্য ভেদিয়া যে আশীর্ব্বাদের আগ্রহ পরিহসিত হইয়াছে তাহার বেদনা যক্ষ্মারোগীর শ্লেষ্মার মত আমার বুকের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ খচ্ খচ্ করিয়া বাজিতে লাগিল। ইহার অস্তিত্ব যেন আকাশের মত শূন্যগর্ভ আকারহীন অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে গেলে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হইয়া আমার চিত্তে খেলা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। যে আমাকে উদাসীন কণ্ঠে বিদায় দিতে পারিল তাহার এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন আমার কাছে নিরর্থক, কিন্তু সংসারে কি সব জিনিষই আমার প্রয়োজন

মত গড়িয়া উঠে? ইহা তাহার বিলাস। বাতাসের আনন্দ বহিয়া যাওয়া, ফুলের আনন্দ গন্ধ বিতরণ, কিন্তু তাদের কেহ কি আমার প্রয়োজন মত বিচরণ করে? তাই লোপামুদ্রাও তাহার আনন্দ, তাহার সহজ প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে যেরূপ সাগ্রহে বাড়ীতে স্থান দিয়া সেবা করিয়াছে, সান্ত্বনা আহরণ করিয়াছে তেমনি নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য দিয়া আমার ছায়াটিকে দূর করিয়া দিয়াছে ইহাতে আমার দুঃখের অবকাশ নাই, বিচারের যুক্তি নাই সবটা যেন এক অক্ষত স্বতঃসিদ্ধ শক্তির শাশ্বত লীলা।

কিন্তু আমি তাহাকে উড়াইয়া দিতে পারি না কেন? তাহাকে পাওয়ার বেদনা আমাকে যতদূর কঠিন আঘাতে জর্জ্জরিত করিল তাহার সহিত বিচ্ছেদের ব্যথা যেন ততোধিক কঠোর নির্ম্মমতায় আমাকে শরের মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য মানুষ যত কৌশলই অবলম্বন করুক, দুঃখ যেন জলের মধ্যে কীট পতঙ্গের সৃজনের মত আপনা আপনি গজাইয়া উঠে। দিনের পর দিন নদীর স্রোতের মত বহিয়া চলিল এবং সেই সঙ্গে লোপামুদ্রাও যেন আমার চিত্তনীড়ে ডিম্বের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া ডানা মেলিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। ভাবিলাম এই বুদ্বুদের মত জ্ঞানটাকে উড়াইয়া দিই, কিন্তু প্রকৃতির অসীম প্রকাশের মত ইহারও যেন শেষ নাই, ইহার প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্যে যেন নবীন সৃষ্টির দ্যোতনা নড়াচড়া করিতেছে।

এমনিভাবে আনন্দ বিষাদে, হাসিতে অশ্রুতে আমার দিনগুলি পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুর উপর দিয়া স্বপ্নের মহত্ত্ব বিকশিত করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আজ যেন আর আমাকে গোপন

করিবার কোন আবরণ নাই, যে আলোক প্রাচ্য গগনে সাতটী অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া নব নব সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া অফুরন্ত প্রাণের গরিমায় বিশ্বচরাচর পরিপ্লাবিত করিবার জন্য উদ্যত,-তাহার যেন ক্ষয় নাই তাহাকে দমন করিবার মত নিরাশা নাই, চারিদিকে এই অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপের স্বচ্ছ বিকাশ,—সহজ আবর্ত্তন।

কিন্তু আমার অন্তরে এই নূতন জ্ঞানের গর্ভবেদনা, সমস্ত রস চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতে লাগিল, সর্ব্বক্ষণ লোপামুদ্রা আমার চিত্ত ভরিয়া আনাগোনা করিল। এইভাবে কি আছে কি নাই, কি লাভ কি ক্ষতি, কি ভাল কি মন্দ যাচাই করিবার ক্ষমতা ধাবমান অশ্বের মত আসিয়া নদীতটে, তুই পায়ের উপর ভর দিয়া খাড়া হইয়া সম্মুখে উত্থিত তুই খুরের নিক্ষেপ সম্বন্ধে বিচার করিয়া স্তম্ভিত ভয়ে দণ্ডায়মান রহিল। সম্মুখে খরস্রোতা স্রোতস্বিনী অকুলের পথে প্রবাহিতা। ইহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলে এক অন্তহীন গভীর অসীমের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিলেও জীবনের যাত্রাপথ উত্তীর্ণ হওয়া তুষ্কর। এইপ্রকার আলো আঁধারে ঘেরা এক নির্জ্জন. নির্ব্বান্ধব পথের পরে আমার মনখানি শুধু লোপামুদ্রার শান্ত আবেগহীন বড় বড় তুই চক্ষুর আলোক দেখিয়া আপনার অক্ষমতার নিষ্ফল আক্রোশে স্বদেহ ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া রক্তাক্ত অবসাদে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু আমার সকল দ্বন্দ্ব, আন্দোলন সত্ত্বেও আমার বিবেক উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল, এই পথ না, এই মরীচিকায় রূপ আছে—রস নাই, গতি আছে—ধ্বতি নাই, রঙ আছে—বস্তু নাই, ইহার সবখানি এক অনবদ্য অখণ্ড নিষ্ফলতার আগুনে ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে।

ইহার পর প্রায় তিন মাস গত হইয়াছে। মাসিমা ফিরিয়াছেন। সাহেবগৃহিণী স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সাহেবের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় বসবাস করিতেছেন। আমার প্রতিদিনের কাজ ঘড়ির কাঁটার অধীনে নিরলসভাবে চলিয়াছে। লোপামুদ্রার নিকট হইতে ফিরিবার কালে যে রেখাগুলি গভীরভাবে মনের গায়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাদের উপরে বিস্মৃতির ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু মানুষের সম্পদ শেষ হইলেও যেমন আপদের প্রাচুর্য্য বাড়িয়া যায় তেমনি লোপামুদ্রার সঙ্গে বোঝাপড়ার সমাধি দেখিলেও তাহার ধোঁয়াটা যেন আমার পশ্চাতে ছায়ার মত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে জনবহুল নগরীর কলকোলাহলের মধ্যেও নিজেকে একান্ত একাকী মনে হইল। অন্ধকারে লোকালয়ের বাহিরে থাকিয়া নবাগত পথিক যেমন পথ খুঁজিয়া ফিরে, আমিও তেমনিভাবে এই সহরের মধ্যে আমার আপন পথটির অনুসন্ধানে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে লোপামুদ্রার নিমন্ত্রণ বহন করিয়া বংশীলাল আসিয়াছে গিয়াছে, রেবার অনুরোধ উপরোধ লইয়া ভবানীশঙ্কর আমার কাছে প্রায়ই আসিয়াছেন, কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে যেমন ভয় করে, আমিও তেমনি তাঁহাকে বিদায় দিয়াছি ; পাছে তাঁহাদের সঙ্গে গেলে লোপামুদ্রার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়! অথচ কেন যে এই বৈরাগ্য আমার মনখানিকে সংযত করিয়া আনিতেছে তাহা বুঝি না। লোপামুদ্রার ব্যবহারে, প্রত্যেকটা কথায় এমন একটি নির্লিপ্ততা সর্ব্বসময়েই পরিলক্ষিত

হইয়াছে যাহার জন্যে তাহাকে ভয় করিবার কোন কথা আসিতে পারে না। কিন্তু তথাপি যেন একটা বিমুখতা আসিয়া আমাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

এমনিভাবে আরও কয়েকমাস যাইবার পরে বংশীলাল আসিয়া নিবেদন জানাইল। তাহাকে পরিস্কারভাবে বুঝাইয়া দিলাম যে, লোপামুদ্রা যেন আর আমার কাছে লোক না পাঠায়। বংশীলাল ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া গেল। কিন্তু আমার এই রূঢ়তার পরিচয়টা লোপামুদ্রার মুখখানিকে যে এক নিমিষেই পাণ্ডুর করিয়া তুলিবে তাহার ছায়াটা যেন আমার বুকের উপর একটা হাতুড়ির ঘা দিল। যা'হো'ক তবুও মনটাকে বশ করিতে পারিলাম না, লোপামুদ্রার সঙ্গে দেখা না করাই সিদ্ধান্ত করিলাম।

দুই সপ্তাহ পরে আমি সকাল বেলায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কাজে মগ্ন; ডাক্তারবাবু কোথায় বাহির হইয়াছেন। ধীরে ধীরে একটী গাড়ী আসিয়া বাড়ীর ফটকে প্রবেশ করিল। আমাকে বাহির হইবার অবসর না দিয়া জগু আসিয়া নমস্কার করিয়া রেবার আগমন সংবাদ জানাইল। আমি হাতের কাজটা গুছাইয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিতেই রেবা নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আসুন, আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কোথায় যেতে হবে?"

"আসুন না, পরে সব বল্‌ছি; আর দেরী কর্‌বেন না, বিশেষ জরুরী"। বলিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বে আসন দেখাইয়া চুপ করিলেন।

আমি তাঁহার চক্ষুর অপলক দৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইহাতে একটা দৃঢ় আকুলতা জমিয়া উঠিয়াছে,—অবিলম্বেই উপচিত হইতে পারে। বলিলাম, "একটু দাঁড়ান আমি আস্‌ছি।" ফিরিয়া ঔষধের আলমারীগুলি বন্ধ করিয়া চাবিটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিলাম। গাড়ী একটা ঝাঁকানি দিয়া ফটক পার হইয়া গেল। বড় রাস্তায় পড়িয়া রেবা বলিলেন, "ভবানীবাবুর নামে আজ মোকদ্দমা আছে। কুলিদের মধ্যে ধর্ম্মঘট করিয়েছিলেন আজ প্রায় মাসখানেক হ'ল। এতদিন জামিনে মুক্ত ছিলেন, আজ তাঁর বিচার।" আমি বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া রেবার আয়ত নেত্রের কোণে আতঙ্কের কোন লক্ষণ না দেখিয়া আশ্চর্য্যভাবে বলিলাম, "তিনি ত এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই?"

"তিনি কি বল্‌বার লোক? আমার কাছেই গোপন করেছিলেন, তবে আমার সৌভাগ্য যে তাঁর গতিবিধি সবই জানা। প্রথম যেদিন ধরা পড়েন—তিন দিন হাজতে কাটালেন কিন্তু একটা খবর পর্য্যন্ত দেবার প্রয়োজন মনে কর্‌লেন না। আমি সেই তিন দিন খুঁজে লালবাজার থেকে ওঁকে জামিনে ছাড়িয়ে এনেছি। কিন্তু আজকাল সৎকাজ করেও সুখ নাই তাই আমাকে তিনি ভৎ´সনা কর্‌লেন। বল্‌লেন, অনর্থক জামিন দেওয়া ভাল হয় নি। যার টাকা নাই সে যেমন নিজেকে বাঁচাতে পারে না, সেই গরীবদের মতই ওঁর শাস্তি হওয়া উচিত। উনি তো বলেই খালাস কিন্তু আমার মন কি মানে, আমি তো মেয়ে মানুষ? এই নিন, আমার এই হারটা বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আসুন। এই যে

বৌবাজার, ঐ যে ছোট দোকানটা, ওখানে গেলেই টাকা পাবেন।”

বলিয়া রেবা গলা হইতে হারটা খুলিয়া আমার কোলের উপরে ফেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। আমি হতভম্বের মত তাহার হারটার দিকে চাহিয়া চক্ষু ফিরাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “কাজের সময় যদি না লাগে তবে এই সব জিনিষ রেখে লাভ কি? নিন আর দেরী করবেন না, এই টাকা নিয়েই কোর্টে যেতে হবে।”

তাঁহার নির্ব্বিকার কথাগুলির কোন অংশে তিলমাত্র কম্পন দেখা গেল না, আশ্চর্য্য হওয়ার কথা! কেননা স্ত্রীলোকের পক্ষে গহনার এই প্রকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার মধ্যে যে কত বড় ত্যাগের সংযম বিরাজ করে তাহা রেবার কথায় মুদ্রিত না হইলেও আমার কাছে গোপন রহিল না। আমি দোকানে গিয়া হারের পরিবর্ত্তে এক শত টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। রেবার পার্শ্বে বসিতেই তিনি বলিলেন, “থাক্ আপনার নিকটেই রাখুন, কোর্টের মধ্যে যে খরচ লাগ্‌বে তা আপনি দেবেন—আমি মেয়ে মানুষ, আমি তো আর উকিলের সঙ্গে টাকার হিসাব কর্‌তে পার্‌ব না!”

চক্ষু ফিরাইয়া রেবা চুপ করিলেন। আমি টাকাগুলি পকেটে রাখিয়া তাঁহার নিস্তব্ধ পাথরের মত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিলাম, “ভবানীবাবুর জন্যে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এই দুঃখের বেদনায় সহানুভূতি দেখাতে পার্‌ছি না।”

রেবা অতুলসুন্দর গ্রীবা তুলিয়া আমার দিকে স্থির চক্ষে চাহিলেন,—কিন্তু চাহনির তলে যেন একটা আগ্নেয় গিরিপ্রবাহ

মুক্তির বেদনায় উন্মাদ। বলিলেন, "তিনি যে জেলে যাবেন তার জন্তে দুঃখ নয়; আমি যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য কর্‌তে পারি না এটাই সব চেয়ে দুঃখ। তবু আপনাদের সদিচ্ছা থাক্‌লে, তাঁর এই কাজটাতে তিনি শক্তি পাবেন। মানুষ কি সকলেই টাকা পয়সার সাহায্য কর্‌তে পারে—তার পরিবর্ত্তে মনের ইচ্ছাটার দাম ঢের বেশী। যা হোক্‌, একটা কথা আপনাকে বলি,—ভবানীশঙ্কর টাকা খরচ কর্‌তে রাজী হবেন কিনা সন্দেহ। আপনি যেভাবেই হোক্‌, এ কাজটা ক'রে দেবেন, যাতে আজই ওঁকে ছাড়িয়ে আন্‌তে পারি।"

রেবার কথাগুলি যেমন সহজ তেমনি দৃঢ়। ভবানীশঙ্করের প্রতি তাঁহার যে একটা ভক্তিমিশ্রিত ভালবাসা আছে তাহার প্রবাহটি কথার সর্ব্বাংশেই পরিস্ফুট। আমার মনের মধ্যে ইহাদের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কল্পনা আলোড়ন তুলিয়া সকল সুখ দুঃখ আশা নিরাশার অতীত এক ভাবসঙ্গমে মিলাইয়া দিল। ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া কোর্টের সাম্‌নে দাঁড়াইল, আমি নামিয়া গেলাম, রেবা গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। উপরে গিয়া কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ঠিক জায়গাটি বাহির করিলাম। ভবানীশঙ্করের হাতে হাতকড়া, দুইটী পুলিসের মধ্যে বসিয়া তাঁহার বিচারের অপেক্ষা করিতেছেন। আমি কাছে যাইতেই তিনি নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করিলেন। আমি তাঁহার সহিত আলাপের বন্দোবস্ত করিয়া রেবার কথা সমস্ত বলিলাম। তিনি প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তুমি ফিরে যাও মানবেন্দ্র; ওকে বলে দিও যে, আমি একা নই; সকলের

যে গতি আমারও তাই। হয় তো প্রত্যেকেরই জরিমানা হবে, কিন্তু কেউ টাকা দেবে না, কারণ, তাদের টাকা নাই। কাজেই তাদের সঙ্গে আমাকেও কয়েকমাস জেল খাটতে হবে। তুমি রেবাকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে বলে দাও, রেবা সবই বুঝতে পারবে, সে বুদ্ধিমতী।"

আমি বলিলাম, "তিনি কিছুতেই জেলে দিতে রাজী নন। যেমন করেই হোক্ আপনাকে ফিরিয়ে নিতে চান।"

ভবানীশঙ্কর সম্মুখের একটা পর্দ্দা সরাইবার মত দুই হাত নাড়িয়া কহিলেন, "আমাদের দেশের মেয়েদের স্নেহে সৌন্দর্য্য সুপ্রচুর কিন্তু তাতে শক্তি নাই মানবেন্দ্র, আমাদের মেয়েরা পুরুষকে যে পর্য্যন্ত হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ছেড়ে না দেবে ততক্ষণ কোন কল্যাণ নাই। কিন্তু এখনও সময় আছে—তাদের বোঝা উচিত যে জ্ঞানের বলি, সত্যের আত্মদান, এমনি করেই সফল হয়। আজ তুচ্ছ সুখ দুঃখের ভয়ে আমার মাথা নত করতে পারি কিন্তু ইহাদ্বারা আমার ভবিষ্যৎ গতি আরও বহুদূরে মিলিয়া যাবে। তুমি ওকে নিয়ে চলে যাও। ঐ যে আমাদের ডাক পড়েছে।"

তিনি পুলিশের সঙ্গে উঠিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "এখন বেশ দেখাচ্ছে না? পতি-ভক্তির কঠোর চিহ্ন নিয়ে আমার হাতের লোহার শাঁখা বেশ মানিয়েছে। দুঃখের কিছু নাই মানবেন্দ্র,—অতীতের একটা কাজের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র।" ভবানীশঙ্কর কাঠগড়ায় উঠিলেন, নির্দ্দোষ বলিয়া জবানবন্দী দিলেন। ছয় মাসের জেল স্বীকার করিয়া পুলিশের সঙ্গে নির্ব্বিকার মুখে আদালতের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি শিথিল পদে আসিয়া গাড়ীতে বসিয়া সমস্ত কথা

বিবৃত করিয়া আঙুল দিয়া বন্দী ভবানীশঙ্করকে দেখাইয়া দিলাম। রেবা তাঁহার দিকে চাহিয়া আঁচলটা চক্ষুর উপর বুলাইয়া পুনরায় চক্ষু ফিরাইলেন। ভবানীশঙ্করকে লইয়া পুলিশের গাড়ী চলিয়া গেল। আমরা তাঁহার পশ্চাতেই চলিয়া গেলাম। মিনিট দশেক রেবা কোন কথা কহে নাই। আমি একে একে ভবানীশঙ্করের কথাগুলি যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

তিনি একটী তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এতদিন এক সঙ্গে বাস করেও ওঁর মনের সবখানি বুঝ্‌তে পারলুম না। পরের জন্যে যাঁর এত আত্মনিগ্রহ তাঁর হৃদয়টা বোধ হয় বিধাতা বজ্র দিয়ে তৈরী করেছেন। এই ছয় মাসের মধ্যে আমাদের জেলের মধ্যে দেখা কর্‌তে দেবে তো? ওঁর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কি আমরা ক'রে দিতে পার্‌ব না? উনি তো বলেন আরও কয়েকবার জেল খেটেছেন, কিন্তু সেখানে বেশ সুখেই কাটিয়েছেন। তা বল্‌লে কি হয়? তা'রা কি সুখে রাখ্‌বার জন্যে মানুষকে জেলে নিয়ে যায়! "আচ্ছা মানবেন্দ্রবাবু, আমাকে দেখা কর্‌তে দেবে তো?"

"তা বোধ হয় দেবে," বলিয়া আমি বাহিরের দিকে এমন উদাস দৃষ্টিতে চাহিলাম যে, রেবা পোদ্দারের দোকানে না আসা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন। ভবানীশঙ্করের সমস্ত কুকার্য্য, জেল-ভোগ, অপমানের খবর জানিয়াও রেবা কোন্ শক্তি বলে তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা করেন, তাহার কোন নিদর্শন না পাইয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। ভবানীশঙ্কর চোর, জুয়াচোর, যত প্রকার কঠিন বিশেষণ তাঁহার ললাটে শোভিত হোক্, রেবার তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তাঁহার মনের মধ্যে ভবানীশঙ্কর এমন একটী অদাহ্য মূর্ত্তিতে

চিত্রিত আছে, যাহার গায়ে কোন মলিনতা পড়ে না,—রেবার স্নেহের কাঁটা একবারও ঐ নিষ্কলঙ্ক আদর্শ হইতে এক চুলও হেলিতে পারে না।

গাড়ী আসিয়া পোদ্দারের দোকানের সুমুখে দাঁড়াইল। আমি রেবার গহনাগুলি ফেরৎ আনিয়া পুনরায় গাড়ীতে বসিয়া, ধূসর প্রান্তর ঘেরিয়া সুনির্ম্মল জলস্রোতের মত ভবানীশঙ্করের কঠোর বিশাল বক্ষতলের প্রেমের প্রবাহটির অমলিন মাধুর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। রেবার কাছে ভবানীশঙ্করের যে মহিমাটি পৃথিবীর সকল দুর্ব্বলতা ছাপাইয়া শিখা মেলিয়াছে তাহার তাপে কিয়ৎক্ষণের জন্য আমার মানসলোকের সকল ক্লেদ গলিয়া বহিয়া গেল।

গাড়ী আসিয়া রেবার বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "আপনি যান, আমি এইখান থেকে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। মাসিমা বোধ হয় চিন্তা কর্‌ছেন।"

রেবা গাড়ী হইতে নামিয়া কহিলেন, "চলুন আমার সঙ্গে। লোপামুদ্রা আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে। সে কয়েক দিনের মধ্যে বোম্বে যাবে, আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চায়।"

আমি গাড়ীতে বসিয়াই বলিলাম, "আমার সঙ্গে তা'র প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। আর থাক্‌লেও এখন বাসায় না গিয়ে আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না।"

"আপনার ইচ্ছা না থাক্‌লে, সে জোর দেখাবে না নিশ্চয়। তবে থাক্, আপনার অনিচ্ছায় আমি আর অনুরোধ করে অপরাধী

হতে চাই না। তা'হ'লে মাঝে মাঝে আমার এই অসময়ে আস্‌বেন তো?" বলিয়া রেবা গাড়ীর মধ্যে মুখ আনিয়া কহিলেন, "লোপামুদ্রা বড় অভিমানিনী, ত'ার কাছে রাগ ক'রে কোন মহত্ব নেই মানবেন্দ্রবাবু!"

"রাগের কথা নয় দিদি। সময় পেলে আবার এসে আপনার দুঃখের ভার লাঘব করার চেষ্টা কর্‌ব। কোন একটা তুচ্ছ বিষয়কে এত গম্ভীর করে তুল্‌তে অন্ততঃ আমি রাজী নই।"

রেবা পূর্ব্ববৎ গাড়ীর মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিলেন, "তুচ্ছ বিষয় অনেক সময় এমন বিরাট হয়ে উঠ্‌তে পারে যে, তখন তার গতি রোধ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। লোপামুদ্রার মত কঠিন মেয়ে যখন সদা হাস্যভাব দূর ক'রে চিন্তার আশ্রয় নিয়েছে তখন আপনারা পুরুষ ব'লে তার অমর্য্যাদা কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু আমরা এই সত্যটাকে অবহেলা কর্‌লে আর দাঁড়াবার ঠাঁই পাব না। যা'হোক্, এখন আসি, মাঝে মাঝে এলে খুব সুখী হ'ব।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে।" বলিয়া আমি গাড়ী চালাইতে বলিলাম। রেবা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। রেবার কথায় বুঝিলাম যে লোপামুদ্রার উপর আমার যে উদাসীনতা, তাহার কাছে ইহার ঢেউটা এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। অভিমানিনী লোপামুদ্রা কোনকালেই চিন্তিত হয় নাই কিন্তু অধুনা সেও থাকিয়া থাকিয়া মুখ ভার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কোনখানে কোন সত্য আছে তাহা বিচার করিবার ব্যর্থ প্রয়াস লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

অনেক চিন্তার পর সেই দিবস স্থির হইল 'সমস্তই ভুল।' আমার আক্ষেপ, আমার বিচার, আমার উদাসীনতা সমস্তই এক বিশাল ভুলের পাথারে নিমজ্জিত। সুতরাং বৃথা মনস্তাপ বহিয়া নিজেকে দুর্ব্বল করিব না। কাজেই রেবার বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছাটাও জোয়ারের মুখে রুদ্ধ করিয়া দৈনন্দিন কাজে ব্যাপৃত হইলাম। ইহার পর তিন মাস কাটিয়া গেল। রবিবার সকাল বেলাটা অবনীর রাঙাদার কথা লইয়া কাটাইলাম। অপরাহ্ণে আকাশের স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্য ঘন মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়িল। অকস্মাৎ গুরু গর্জ্জনে আকাশের রোষ আকম্পিত হইল। খানিক পূর্ব্বে যে এই আকাশে সূর্য্যদেব বসিয়াছিলেন, আর কোন কালে যে আবার তাঁহার কিরণ-জালে দশ দিক আলোকিত হইবে, আকাশের বর্ত্তমান মূর্ত্তি দেখিলে তাহার জ্ঞান ও সম্ভাবনা বহুদূরে সরিয়া যায়। গায়ে কালিমা যত বৃদ্ধি পাইল ততই বৃদ্ধের কাছে বাল্যের স্মৃতির ন্যায় আকাশের সেই সহজ অবস্থার আশা গভীর বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আমি বৈঠকখানায় বসিয়া জনাকীর্ণ পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বংশীলাল আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। আমি পার্শ্বের একটা পিঠওয়ালা বেঞ্চি দেখাইয়া বলিলাম, "ব'স, তোমার মুনিব ভাল আছেন ?"

বংশীলাল একখানা পত্র আমার হাতে দিয়া কহিল, "হাঁ ভাল আছেন। এখুনি ঝড় উঠ্‌বে, আমি আবার বাজারে যাব। পত্রে সব লিখে দিয়েছেন।"

"আচ্ছা তুমি এস," বলিয়া আমি পত্রখানা খুলিয়া ফেলিলাম। বংশীলাল চলিয়া গেল।

লোপামুদ্রা লিখিয়াছে—"প্রয়োজনটা হয় তো তোমার কাছে একান্তই নিরর্থক, কিন্তু তবুও একটিবার এখানে তোমার আসা চাই। কাল মেলে আমারা বোম্বে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। তার পূর্ব্বে তোমার কাছে একটা কথা বলা দরকার।"

"অবহেলা ক'রে আমার এখান থেকে গিয়েছ, আমি তাতে ব্যথিত হই নাই। কারণ আমি এতদিন একা ছিলাম, এখনও একা, কিন্তু যদি ভবিষ্যতে এই অবস্থাটা আমার চারিদিকে আগুণের মত ঘিরে থাকে তবে তার কবলে বোধ হয় আত্মদান ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। আমাদের দেশের বিধবাদের মত তপস্যার কঙ্কাল নিয়ে বাস করাতে আমি কোন সার্থকতা দেখি না, অবশ্য সবই মনের কাছে। আমার মনের মধ্যে এতদিন যে তপস্বিনী অবিচল ধৈর্য্যে আমার বাহিরের সংগ্রাম জয় করেছিল, আজ যার কাছে তার মাথাটা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, তাকে পাওয়া না পাওয়ার হিসাব করার সময় এখনও হয়ে উঠেনি। কাউকে জোর করে বেঁধে রাখ্‌বার মত ছেলে খেলায় আমি সময় ক্ষেপ কর্‌তে চাই না, কারণ এই টানাটানিতে কোন্ কালেই সত্যিকারের তপস্যা ধরা পড়ে না। যাহা সহজ,—আকাশের মত স্পষ্ট, তাহাকে পাওয়ার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে, না পাওয়ার মধ্যেও ঠিক তেমনি একাগ্রতা রয়েছে। তবু মানুষ কোন কালেই অশরীরি আত্মা নয়,—তার যেমন সুখ দুঃখ অনুভবের শক্তি আছে, তেমনি তাহার সান্ত্বনার পথও খোলা। সুতরাং অসম্ভবকে সম্ভব করার মত ধৃষ্টতা প্রকাশে

আমার প্রবৃত্তি নাই,—এজন্যেই আমার এই আকুলতা। আমি শুধু বল্‌তে চাই, একটু নিরপেক্ষ বিচারে তোমরা সহজ হয়ে এস। আমি উপদেশ দিতে চাই না, শুধু আমার মত যা'রা তোমাদের অবিচারে পিষে যাচ্ছে তা'দের জন্য একটু উদারতা আসুক এই বাসনা। কাল্পনিক সম্ভাবনার পরেও যে একটা ঘটনার প্রয়োজন হয় তা সংসারে বাস ক'রে কেউ অস্বীকার করবে না কিন্তু তোমরা এদিকটা কোন দিনই দেখ না। আমার জীবনের সীমাটা তোমরা এমনি একটা ঘৃণার রেখায় নির্দ্দিষ্ট রেখেছ যার ফলে আমাদের কোন সৎকাজই তোমাদের কাছে সরলভাবে ধরা পড়ে না। আমার দুর্ব্বলতা নেই একথা বল্‌ছি না, তবু একটিবার ইহার মধ্যেও কোন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আমি আজ পৃথিবীর মধ্যে একা,—ইচ্ছে হয় আমারই মত আর একটা বুকের তলে এই দীর্ঘশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নিই। এই জন্যেই বল্‌ছি অনাদরে শুধু দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, তাকে শক্তি দেয় না। সংসারে যে কেউ ছোট নয়, একথাটা জানাবার জন্যেই তোমাকে আমার চাই। সবই লিখলুম,—এখন আসা না আসা তোমার ইচ্ছে,—রাত্রে এখানে তোমার খাওয়ার আয়োজন করেছি।"

পত্রখানা আদ্যোপান্ত কয়েকবারই পড়িলাম। আমার সমস্ত চিন্তারেখা যেন খাদ পরিবর্ত্তন করিয়া একটা প্রখর স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিল। সংসারের সমস্ত বাহ্যিক লীলা যেন এক অখণ্ড আত্মদানের লালসায় ছুটিতেছে টের পাইলাম। প্রবল বাতাস তুলিয়া আকাশের বারিধারা আসিয়া আমার মনের সমস্ত কঠোরতা

সিক্ত করিয়া গেল। এখানে যে ভবিষ্যতে আর কোন সংযম স্তব্ধ অকুণ্ঠায় ধ্যানাবিষ্ট হইবে সে আশা নির্ম্মল হইয়া গেল। লোপামুদ্রার আত্মত্যাগের আত্মাটা আসিয়া আমার হৃদয়মন্দিরের কড়া নাড়াইয়া ঘুমন্ত ক্ষুধাটাকে জাগাইয়া তুলিল। সম্মুখের সমস্ত পদার্থ কোন বিশাল ব্যথাসমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া, অকপটে দাঁড়াইয়া রহিল শুধু 'লোপামুদ্রার অনুপম ভিখারীবেশী হৃদয়।' তাহার বেগ তাহার স্থৈর্য্য একসঙ্গে আমার চক্ষুর সম্মুখে একটা স্বর্গীয় মহিমায় চির-উজ্জ্বল চির-সুন্দর বেশে কাঁপিতে লাগিল।

আস্তে আস্তে উঠিয়া পদচারণ করিলাম। বৃষ্টি থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল। আমি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইলাম। যদি আমার মধ্যে কোন দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে তবে ইহাই যেন মানুষের চির সাধনার মূর্ত্তিময়ী শক্তি,—এই ব্যতিক্রম আমার কাছে পৃথিবীর সকল প্রয়োজনের উপর অপরিসীম মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ হৃদয়ের সত্য উপেক্ষা করিয়া যা'রা অহঙ্কারের আস্ফালন করে তা'দের পক্ষে এই দুর্ব্বলতাটুকু মহান সত্যের অঙ্কুর। যা'রা লাভের হিসাব করিয়া পদক্ষেপ করে তা'দের জানা নাই যে, প্রয়োজন ভাবটা অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধিতে বিনা প্রয়োজনেই আসিয়া দেখা দেয় এবং এই আসাটা কোন কালেই অতীত হয় না,—চির নূতন, যৌবনের মাদকতায় ভরপুর। সংসারে এমন কি জিনিষ আছে যাহা আদি যুগ হইতে মানবের সহজাত, যাহার আবর্ত্তনটাই শক্তির বেদনা—চিরকাল যাহার স্পর্শে মানুষের মনের রঙ বদলাইয়া যায়, পৃথিবীর সকল বস্তু সত্য সুন্দর, কল্যাণের গৌরবে ভরিয়া উঠে,—"ইহাই ভালবাসা।" কখন

আসে কেউ বলিতে পারে না, কিন্তু আসিয়া পড়িলে মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি বিশ্বাসের আগুন, সংসারের সকল শক্তিসাগরে বিরাট পথের রেখা উজ্জ্বল করিয়া তোলে,—কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, আমি তো কোন ছার। যা'হোক্, এই প্রলয়ের লীলায় আমার মন বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। আসিয়া লোপামুদ্রার বাড়ীতে যখন হাজির হইলাম তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাকে বসিতে বলিয়া লোপামুদ্রা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আহারের পর আমি বিদায় লইবার চিন্তা করিতেছি এমন সময় সে তাহার শয়ন ঘরের বিছানাটার চাদর বদলাইয়া বলিল, "এখানেই শোও, আজ আর পাশের ঘরে ঘুমোতে পার্‌বে না, সমস্ত জিনিষ পত্র বেঁধে ওঘরে রেখেছি ?"

আমি বলিলাম, "তোমার এখানে আজ কি থাক্‌বার বিশেষ প্রয়োজন আছে ?"

"তা জানিনে, অবহেলা করা সহজ, কিন্তু আর একজনকে ব্যথা দেওয়ার মধ্যে কোন বাহাদুরী নাই।"

আমি বিছানার উপর বসিয়া বলিলাম, "ইচ্ছা ক'রে ব্যথা ডেকে আন্‌লে কেউ তা আট্‌কাতে পারে না। তুমি কি চাও বল্‌তে পারো ?"

লোপামুদ্রা মশারিটা ফেলিয়া কহিল, "যা'দের কিছুই নেই তা'দের পক্ষে এই ব্যথাটাই সম্বল। আমি যা চাই তুমি তা দিতে পার্‌বে কিনা সে কথা এখনও পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। যাক্, এখন তো শোও।"

"তুমি কোথায় শোবে ?"

"আমি নীচে একটা বিছানা করে নেব।"

বলিয়াই লোপামুদ্রা মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে একটা অশ্রুজল চাপিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে ডাকিতে পারিলাম না, একটা সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা পাইলাম না, আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া পড়িয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল আমার বুকের উপর অনুভব করিয়া আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম লোপামুদ্রা আমার দিকে অশ্রুসিক্ত চক্ষে চাহিয়া আছে। আলোটা তখনও নিভানো হয় নাই, বোধ হয় লোপামুদ্রা ঘুমাইতে যায় নাই। "আমি আস্তে বলিলাম, তুমি শুতে যাওনি কনক?"

লোপামুদ্রা আমার চুলগুলি আঙুল দিয়া চিরিয়া কহিল, "তোমায় জাগিয়ে দিলুম কিন্তু কোন উপায় নাই। বলিতে বলিতে লোপামুদ্রার চক্ষু ফাটিয়া অজস্র জল পড়িয়া গেল। সে একমুহূর্ত্তে আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আমার একটা কথা রাখ্‌বে?"

আমি তাহার অদ্ভুত আচরণে আশ্চর্য্যচক্ষে চাহিয়া বলিলাম, "ক্ষমতা থাক্‌লে চেষ্টা কর্‌ব কনক, বল, কি বল্‌তে চাও!"

"আগে বল রাখ্‌বে?"

"না জেনেই প্রতিজ্ঞা কর্‌ব, শেষে না রাখ্‌তে পার্‌লে মিথ্যাবাদী হ'ব।"

"না আগে বল রাখ্‌বে। তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে এ বিশ্বাস আছে ব্‌লেই বল্‌ছি। বলিয়া লোপামুদ্রা আমার ডান হাতখানি তাহার যুক্ত করের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।"

"আমি চক্ষু নীমিলিত করিয়া তাহার আবেগের রহস্য অনুভব

করিবার চেষ্টা করিলাম। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, করিলেও সে রাজী না করাইয়া তাহার কথা বলিবে না। সুতরাং কয়েক মিনিট শক্ত কাঠের মত পড়িয়া থাকিয়া বলিলাম, আমি তোমার মত অভিনয়-পটু নই কনক, তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

লোপামুদ্রার, অনতিপূর্ব্বে করুণাপ্লাবিত চক্ষু দুইটি অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "অভিনয় কর্‌বারও একটা সীমা আছে। অভিনেত্রীর কি প্রাণ নেই?"

"তা থাক্‌তে পারে কিন্তু তোমার হেঁয়ালীটা স্পষ্ট করে ভেঙ্গে বল যদি কোন উত্তর দিতে পারি।" বলিয়া আমি হাতখানি টানিয়া লইলাম।

লোপামুদ্রার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নীরব নির্ব্বিকার স্থৈর্য্যে সমস্ত ঘরখানির মধ্যে এক অখণ্ড শীতলতা বিস্তৃত করিয়া আয়ত নয়নে বসিয়া রহিল। গৃহের সমস্ত আসবাবপত্র যেন তাহার এই মৌনী বেশ দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আমি বলিলাম, "লোপা, শুতে যাও, মিছামিছি নিজেকে শাস্তি দিও না।"

স্থির প্রশান্ত চক্ষু দুইটী মুহূর্ত্তের তরে আমার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই সে বিছানা হইতে নামিয়া গেল। কি একটা কথা যেন তাহার বুকের মধ্যে তুমুল আলোড়ন তুলিয়াছিল,—তাহারই গলিত প্রবাহটি চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া বাষ্পাকারে জমিয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইল তাহাকে ডাকি, কিন্তু সে তাহার অবসর না দিয়া মেঝেতে পাতা শয্যার উপর ঝুপ করিয়া

পড়িয়া আপাদমস্তক শাল মুড়িয়া রহিল। সে উঠিবার কালে আমার চক্ষে যেখানে যেখানে ঘুমের দাগ পড়িয়াছিল সেগুলিকে যেন অভিমানের আঁচলে মুছিয়া লইয়া গেল। প্রত্যক্ষভাবে টের পাইলাম ওই শালের মধ্যে হইতে লোপামুদ্রার জলভরা চক্ষুর নির্ম্মল ধারাটি আসিয়া যেন আমার শিথিল দেহটাকে তপ্ত আবেষ্টনে জড়াইয়া আমার সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

এমনি করিয়া ঘণ্টাখানেক চলিয়া গেল। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। ইহার চেয়ে লোপামুদ্রা যদি আমাকে দুই একটা কড়া কড়া কথা শুনাইত তবে আমার মাথার মধ্যে এমন ভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইত না, কিন্তু তাহার নীরবতা যেন আমার কাছে সহস্র করতালির শব্দে বাজিতে লাগিল। উঠিয়া বাহিরে ছাদে গিয়া খানিকক্ষণ পায়চারী করিলাম। আকাশের এক কোণে শুকতারাটি আমার দিকে চাহিয়া কি বলিল তা' বুঝিলাম না। শীতল জলে মুখ চোখ ধুইয়া পুনরায় আসিয়া বিছানায় পড়িলাম। লোপামুদ্রা বোধ হয় অকাতরে ঘুমাইতেছে, তাহার কোন সাড়া পাইলাম না। আমি ভাবিলাম এই ভাবে অপমান করার অধিকার লোপামুদ্রা কোথা হইতে পাইল। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবার প্রেরণা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। বলা বাহুল্য যে, পরদিবস সকাল বেলায় লোপামুদ্রা যে তাহার এই নীরবতার যথাযোগ্য উত্তর পাইবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া জোর করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম।

একটা হরিণ শিশু, চক্ষে অনাদিকালের অন্তহীন মূক বেদনা—প্রসারিত চাহনি,—বুকে মায়াতীরের মত ভেদ করে, মনে হয় তাহাকে জড়াইয়া ধরি—আদর করিয়া তাহার নিঃসহায় প্রাণ হইতে অনাত্মীয়তা দূর করি; কিন্তু সে তাহার মৌন চাহনির মায়াটিকে চির সৌন্দর্য্যে অনুপম করিয়া লীলায়িত দেহে ছুটিয়া যায়। এমনি দুটি চক্ষে মায়ামৃগের মায়া,—প্রভাতের লোপামুদ্রা বিগত রজনীর সমস্ত আঁখিজল অটল রাখিয়া নির্ব্বাক বেদনার দৃষ্টিতে আমাকে আঘাত করিল। সময়মত খাবার দিয়া গেল, একটা কথা বলিল না। ডাকিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু অবসর না দিয়া অশ্রুহীন উদাসী চক্ষে একটিবার দৃষ্টি ফেলিয়া ফিরিয়া গেল। আমার খাবার থাওয়া ঘুচিয়া গেল, বসিবার আসন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রান্নাঘরে উঁকি ঝুঁকি দিয়া দেখিলাম, এক কোণে আঁচল পাতিয়া লোপামুদ্রা জ্বলন্ত চুল্লীর দিকে নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে। পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস কাণে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে লোপামুদ্রা শুইয়া পড়িল। আমার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল, পা দুটি আড়ষ্ট হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত করিল। কিছুক্ষণ একভাবে থাকিয়া পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

লোপামুদ্রার স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, বিনাপ্রতিবাদে শাস্তিগ্রহণ কোনটাই আমার মনের সঙ্গে থাপ থায় না, ইহার চেয়ে যদি সে আমাকে বিদায় দিত তবেই ভাল হইত। দ্বিপ্রহরে সে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমস্ত কাজ করিল, কিন্তু তাহার বাক্যহীন মুখে কথা

নাই,—ইহাতে তাহার এই মৌন অভিযোগ যেমন আমার অশ্বস্তি বাড়াইল তেমনি তাহার প্রথম আলাপটার কঠোরতা আমার মনের মধ্যে ভয়ের কল্পনা মুদ্রিত করিল। আমি ঘরের মধ্যে বন্দী, লোপামুদ্রা মৌনতার অন্তরালে বন্দী,—যেন এপারে ওপারে দুটি বিহঙ্গম, মাঝে একটা বেদনাস্রোতের ব্যবধান। অথচ আজই বোম্বাই মেলে তাহার যাওয়ার কথা। আমি বসিয়া উঠিয়া হাঁটিয়া সময় কাটাইলাম। মেলের সময়ের আধ ঘণ্টা আগে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্যে একটি লোক আসিল। পাশের ঘরের তালা খুলিয়া লোপামুদ্রা তাহাকে বসাইল। কিছুক্ষণ পরেই তাহাদের তর্ক আসিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। মিনিট দশেক পরে লোপামুদ্রা আমার বিছানার তলা হইতে কতকগুলি নোট লইয়া গেল, পরক্ষণেই ভদ্রলোক চলিয়া গেল। লোপামুদ্রা আমার কাছে আসিয়া উষ্ণকণ্ঠে কহিল, "অগ্রিম টাকা যা নিয়েছিলুম তা ফেরত দিয়ে দিলুম। চাকরী করব ব'লে তো আর মাথা বেচ্‌তে পারব না! বাঁচা গেল, দেশ ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ছেড়ে বিদেশে যাওয়া ঝকমারি। কি বল, ভাল হয় নাই?"

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না,—মনে হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। সমস্ত দিন রাত্রেও যে রমণী আমার সহিত একটি কথা কহিতে মরমে মরিয়া যাইতেছিল, তাহার মুখে এই সহজ সরল অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্যে প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলাম।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে গৃহের মধ্যে একটা শান্ত নীরবতা খেলা করিল, আমি তাহা ভাঙ্গিয়া বলিলাম, "তুমি গেলে না কেন? কাল

পর্য্যন্ত যাওয়ার ঠিক ছিল, আর এখনি তোমার এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?"

লোপামুদ্রা আমার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তোমাকে এখানে ফেলে আমার যাওয়াটা শোভনও নয় কল্যাণকরও নয়।"

আমি এতক্ষণ শুইয়াছিলাম, উঠিয়া বলিলাম, "তা'হ'লে আমার জন্মেই তুমি যেতে পারো নাই। আমি তো এখানে বরাবর থাক্‌তে আসি নাই, বল্‌লে তোমাকে ষ্টেশনে দিয়ে আস্‌তে পারতাম।"

লোপামুদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন আর একথা ব'লে লাভ নাই।"

কথাটা ছোট কিন্তু আমার দেহের মধ্যে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বহিয়া গেল। আমি এখানে আছি বলিয়াই তাহার যাওয়া হয় নাই। ইহার জন্য আমি যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহি একথা লইয়া তাহার সঙ্গে তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহার ভারাক্রান্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া নিজেকে সংযত করিয়া বলিলাম, "কাল তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা কর কনক, আমিও সঙ্গে যাব।"

লোপামুদ্রার বুকের মধ্যে যেখানে ব্যথার সমুদ্র উথলিয়া উঠিবার জন্য আলোড়িত হইতেছিল ঠিক সেখানেই আবর্ত্তন তুলিলাম। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উপুড় হইয়া বলিল, "অসহ্য জীবন নিয়ে আর কাটাতে পার্‌ছিনা, আমাদের আত্মহত্যাই শ্রেয়। দুঃখে সান্ত্বনা দেবার একজনও আত্মীয় যা'দের নাই, হ'বারও কোন আশা নাই, তা'দের পক্ষে সংসারের করুণা আহরণের চেষ্টা একটা আত্মনিগ্রহ মাত্র। কথার

সঙ্গে সঙ্গে লোপামুদ্রার সমস্ত আড়ম্বর, স্বাচ্ছল্য, হৃদয়ের সংযম ছাপাইয়া একটী নিঃসঙ্গ স্নেহলোলুপ রমণীর নির্ব্বান্ধব মূর্ত্তি আমার চক্ষের সুমুখে সকরুণ সৌন্দর্য্যে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল যেন তাহার মত দুঃখী এই ত্রিসংসারে নাই। তাহাকে আঘাত করিয়া আমার কোন সার্থকতা দেখিনা। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম, "লোপা, তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কাঁদ্‌লে কেবল মনের খেদ বৃদ্ধি পাবে। তুমি সেই কোম্পানীর সঙ্গে যাবার বন্দোবস্ত কর, প্রয়োজন হ'লে আমিও সঙ্গে যাব।"

লোপামুদ্রা সিক্ত মুখ তুলিয়া অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে বলিল, "কোন প্রয়োজন হবে না। আমার এই সমস্যায় অপর কাউকেই জড়াতে চাই না। তুমি কাল সকালেই ফিরে যেও, আমি একা থাক্‌লেই ভাল থাকি। যে আগুন স্পর্শের অতীত তাতে হাত দিয়ে নিজেকে দগ্ধ ক'রে শেষে চোখের জল সার হবে।"

বলিয়াই সে বিছানা ছাড়িয়া নীচে গিয়া একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। আমার মনের সমস্ত সূত্র এমন ভাবে ওলট্ পালট্ হইয়া গেল যে ইহার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের আশা বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না,—লোপামুদ্রার সম্বন্ধে আর কোন ধারণা করিবার সাহস পাইলাম না। সে আমাকে যতদূর আপনার জন ভাবে মনে করি, তাহা সম্পূর্ণ আমার দয়ার একটা উপেক্ষা ভাবিয়া উপহাস করিতে কি তাহার একটুও সঙ্কোচ হইল না। আমি ডাকিয়া বলিলাম, "লোপা, সংসারে দয়াটাই পেয়ে এসেছ, হৃদয়ের কোন মূল্য দিতে শেখ নাই।" বলিয়া আমি উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু লোপামুদ্রার দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার উত্তর দিল।

কিছুক্ষণ তাহার কথাগুলি, মনের মধ্যে চিতেন উতোর গাহিল কিন্তু আমার মনের আক্রমণলিপ্সা কিছুমাত্র কমিল না।

পর দিবস লোপামুদ্রা চায়ের বাটিটা ত্রিপায়ার উপর রাখিবামাত্র বলিলাম, "অপমান করারও একটা অধিকার থাকা চাই কনক।"

বংশীলাল তামাকে ফুঁ দিতেছিল, সে কলিকাটি গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া চলিয়া গেল। লোপামুদ্রা ঈষৎ লজ্জিত দুই চক্ষু দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "অপমান কর্‌বারও পাত্র আলাদা। আমি শুধু বল্‌তে চাই যে, বিনা প্রয়োজনে দয়া প্রকাশ কর্‌লে মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করা হয়। উপকারের আশায় দয়া কর্‌লে তা কেউ অস্বীকার কর্‌বে না। আমার ইচ্ছে নেই চাক্‌রী কর্‌ব না, তা ব'লে তোমাকে আমার সঙ্গে বোম্বাই যেতে হবে একথা তো বলি নাই ?"

"কিন্তু আমার জন্যেই তোমার যাওয়া হয় নাই একথা বল্‌তে কি তোমার একটুও আট্‌কাল না ?"

"আমার ভুল হয়েছে। আমি মরীচিকাটাকে জল মনে করেছিলুম, সে ভুল ভেঙ্গেছে। তোমার সঙ্গে আর বৃথা তর্ক কর্‌তে চাইনে। সংসারে আমার একমাত্র কামনা, যেন কা'রও দয়ার পাত্রী হ'বার মত লাঞ্ছনা না পাই !"

লোপামুদ্রা চুপ করিল, কিন্তু তাহার কথাগুলি আমাকে বেষ্টন করিয়া যেন তপ্ত শেলে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ঘৃণায় সমস্ত শরীরের লোমকূপ খাড়া হইয়া উঠিল। আমি অর্দ্ধভুক্ত চায়ের বাটি ফেলিয়া কঠিন দৃষ্টিতে সম্মুখের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া

আসিলাম। লোপামুদ্রা স্তব্ধ পাষাণপ্রতিমার মত নির্ব্বিকার-ভাবে বসিয়া রহিল,—উভয়ের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় হইল না।

বাড়ী আসিয়া কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল না। সময়মত স্নানাহার শেষ করিয়া দরোজার ছিটকিনি বন্ধ করিলাম। ঘুম আসিল না তথাপি বিছানা ছাড়িলাম না। মনে হইল যেন লোপামুদ্রার আয়ত নেত্রদুটি বৈদ্যুতিক মশালের মত আমার অন্তরের আচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে কোন হারানো জিনিষের সন্ধান করিতেছে,—আমি তাহাদিগকে আবৃত করিবার মত কোন প্রচ্ছদ পাইলাম না। তাহাকে ব্যথা দিবার জন্য যতগুলি কঠোর বাক্য সেই কালে নিশ্চিত ভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলাম তাহাদের প্রত্যেকটী অক্ষর যেন এক একটি শক্তি-শেলের মত আসিয়া আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে হলাহল ছড়াইয়া দিল। এই দুই মাসের মধ্যে তাহার সেবা, তাহার বিনতি, তাহার অমায়িক স্নেহের যে অনাবিল পরিচয় পাইয়াছি, সেগুলি আমার চক্ষের সুমুখে অতুলনীয় গৌরবে ভাসিয়া উঠিল। অশ্রুসিক্ত কপোলের পরে চূর্ণ অলোকের খেলা, সরল হাসিতে উজ্জ্বল অধরের সবিনয় কথা, সেবানিরত মূর্ত্তির সুপবিত্র হস্তদুটী,—যাহার সমস্ত শরীরের কোনখানে কোন ত্রুটির লেখা পড়ে নাই, তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া যে আমার অন্ধসংস্কারের অভিমানকেই প্রশ্রয় দিয়াছি, ইহার গ্লানি যেন আমাকে খোঁচাইতে লাগিল।

সমস্ত দিন এই ভাবে লোপামুদ্রার দোষগুণ বিচার করিয়া কাটাইলাম। অপরাহ্নে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়া বিষণ্ণ বদনে

কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আসিলাম। পরদিবস সকালে বাড়ীর পত্র পাইলাম,—মায়ের অসুখ, পত্রপাঠ বাড়ী যাওয়া দরকার। মনটার ভাঙ্গা পা, যেন খানায় পড়িল; সেইদিন বাড়ী যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে কাটিয়া গেল। পরদিন সকাল বেলায় কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিবার কালে, ভারী দেহটাকে লোপামুদ্রার বাড়ীর দিকে ঠেলিতে লাগিলাম। আকাশে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, তাহার নীরসতৃষ্ণা আসিয়া আমার মনের সমস্ত রস শুষিয়া লইতেছে। সম্মুখে অফুরন্ত যান বাহন, অগণিত লোকজন কর্ম্মের নেশায় উন্মত্তের মত ছুটিয়াছে, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর নাই। মনে হইল আমিও যদি নিজে এইভাবে অক্লান্ত কর্ম্মসাগরে নিমজ্জিত থাকিতাম তবে বোধ হয় কোন বাহুল্য চিন্তার তরঙ্গ আমাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিত না।

কোথা দিয়া পথ শেষ হইল বুঝিলাম না। রেবার ঘরের সাম্‌নে যাইতে তিনি বলিলেন, "আসুন আমার ঘরে এসে বসুন। আজ বড় অসময়ে এসেছেন,—লোপামুদ্রা কাল রাত্রের মেলে বোম্বে গেছে, মাস ছয়েক সেইখানেই থাক্‌বে।"

এতক্ষণ আমি যে খুব জোরে হাঁটিয়াছি তাহা টের পাই নাই কিন্তু যখন রেবার কথায় পা দুটি কাঁপিতে লাগিল, তখন আর ক্লান্তির ভার সহ্য করিতে পারিলাম না। রেবার ঘরে বসিয়া বলিলাম, "তা'হ'লে লোপা শুধু আমার সঙ্গে চাতুরী করেছিল। আমাকে বল্‌লে বোম্বের চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েছে, অথচ আজ শুনি তার ঠিক উল্টো।"

রেবা পাখার সুইচ্‌টা টিপিয়া আমার পার্শ্বেই একটা কৌচে

বসিয়া বলিলেন, "সে সত্য কথাই বলেছিলো,—কাল্‌কে কোম্পানীর লোক এসে খুব পীড়াপীড়ি করাতে শেষে রাজী হয়েছিলো। কিন্তু আপনি বড় নিষ্ঠুর। লোপামুদ্রার মধ্যে কোন চাতুরী আমি কখনও দেখ্‌তে পাইনি এবং তার যাওয়ার সময়কার কথা শুনে কোনক্রমে আপনাকে প্রশংসা কর্‌তে পার্‌ব না।"

রেবা কথাগুলি বলিয়া একটু বিষণ্ণতার ছায়ায় মুখখানা বিমর্ষ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন, আমি তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া মনের উত্তেজনা শান্ত করিয়া কহিলাম, "বোধ হয় আমাকে অকৃতজ্ঞ বলেছে,—একথা সে বল্‌বে তা আমার বেশ জানা আছে!"

আমাকে অবশিষ্ট কথা বলিবার অবসর না দিয়া রেবা ত্রস্তকণ্ঠে বলিলেন, "আশ্চর্য্য মানুষ আপনি। দুই মাসেও তা'কে চিন্‌তে পার্‌লেন না। সে বলে গেছে, আমার হাত ধরে দিব্য দিয়ে অনুরোধ করে গেছে,—আপনি এখানে এলে যেন তার মতই অভ্যর্থনা করি। সে ঠিকানা পাঠালে আপনাকে পত্র লিখ্‌তে বলেছে, আর বলেছে এই ভাবে না ব'লে ক'য়ে চ'লে যাওয়াতে যেন অসন্তুষ্ট না হন। আপনারা মেয়েদের যত বাহির থেকে দেখেন মানবেন্দ্র বাবু, মেয়েরা আপনাদের বেলায় সে দৃষ্টি রাখ্‌তে পারে না,—এইখানেই মেয়েদের দুর্ব্বলতা।"

আমি অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। রেবা জগুকে তামাক দিতে বলিয়া দিলেন। জগু গুড়গুড়িটী আমার সম্মুখে রাখিতেই রেবা বলিলেন, "এই গুড়গুড়িটা আপনার জন্যেই রেখে গেছে।"

আমি সসঙ্কোচ লজ্জার সহিত তামাক টানিয়া বলিলাম, "লোপামুদ্রার ব্যবহার আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা দিদি। আমি সরলভাবেই বল্‌ছি আপনার উপদেশ না পেলে আমার আর চল্‌ছেনা। তাহার কাজ ও কথায় এত বড় বৈষম্য যে আমি কিছুতেই তা ভেদ কর্‌তে পার্‌ছিনা।"

কথাটা বলিয়াই আমার মুখ লজ্জায় ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। রেবা আমার দিকে স্তম্ভিত নেত্রে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দোষ আপনার নাই, কেবল বুঝ্‌বার ভুল মাত্র। লোপামুদ্রা আর পাঁচজন রমণীর মত নয়। যেখানে সত্যের সহজ বিকাশ নাই সেখানে সে নিজেকে হাল্‌কা কর্‌তে যায় না। তার কৃচ্ছ্রতার আড়ালে একটী সহজ স্রোতের মত প্রাণ আছে সেখানে এখনও পৃথিবীর কলুষ পৌঁছে নাই। তা'কে ধর্‌তে গেলে রবির কিরণের মত সরল হয়ে আস্‌তে হবে।"

"যাক্‌, এতক্ষণ তো আপনার কথা নিয়ে কাট্‌লো, এখন একটু স্বার্থপরতা প্রকাশ করি। এর মধ্যে একদিন চলুন শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

আমি কহিলাম, "কাল সকালের মেলে আমাকে বাড়ী যেতে হবে, মায়ের অসুখ। আলিপুরে যেতে হ'লে আজই চলুন।"

"চলুন, তা'হ'লে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

বলিয়া রেবা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, "না, বাসা থেকে খেয়ে আসিগে, আপনি ততক্ষণ তৈরী হয়ে থাকুন।"

রেবা প্রতিবাদ করিল কিন্তু আমি তাহা কাটাইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। লোপামুদ্রার উপর না বুঝিয়া যে অবিচার

করিয়াছি তাহার জন্য একটা ক্লান্তি আসিয়া আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল।

যথা সময়ে ভবানীশঙ্করের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন বাড়ী যাইবার জন্য সকালের গাড়ী ধরিলাম।

৩১

বাড়ী আসিয়া একটা কথা আমাকে ভুতের মত পাইয়া বসিল। যে বিতৃষ্ণা বীতরাগ লইয়া লোপামুদ্রার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম ঠিক সেই ভাবটি রক্ষা করিতে গেলে যেন বত্রিশ নাড়ীতে টান পড়ে। অথচ মায়ের উপরে রাগ করিয়া কলিকাতা যাওয়ার ইতিহাসটুকু মনে পড়িলে নিজের অব্যবস্থিত চিত্তের বৃথা বাগাড়ম্বরের লজ্জায় নিজের মাথা নিজেই চিবাইয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। মা বলিয়াছিলেন, অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে, ফেলুর মত না একটা রাজ্যছাড়া কাজ ক'রে বসি। সে সময়ে এই সন্দেহটা আমার অহঙ্কারের গায়ে তীরের মত বিঁধিত কিন্তু এখন তো আমার মধ্যে এমন কোন সামর্থ্য খুঁজিয়া পাইতেছি না যাহার বলে পুনরায় সেই অভিমানটিকে ফিরিয়া পাই। তাই আজ বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণশক্তি, সমস্ত দায়ীত্ববোধ দিয়া হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম কিন্তু শুধু একটী মূর্ত্তি ছাড়া দ্বিতীয় মূর্ত্তির আভাস তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। সেখানে স্বামীসোহাগিনী এয়োস্ত্রীর মত পূর্ণ-

যৌবনা একটী স্রোতস্বিনী তাহার স্বচ্ছসলিলের গায়ে বাতাসের আকম্পন মুদ্রিত করিয়া, যে একটী গভীর অন্তহীন সাধনা বহন করিয়া কোন এক অজানা সৌন্দর্য্যের সাগরে মিশিতে চলিয়াছে, সেই একান্ত সাধনার একমাত্র অধিকারিণীর আসনে বসিয়া লোপামুদ্রা যেন আমাকে এক অভিনব পথের সন্ধান দিতেছে,—যাহার সহিত কোন দিনই আমার পরিচয় ছিল না, এখনও যেন তাহাকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু না বুঝিলেও যে, তাহাকে এড়াইতে পারি না, ইহাই আমার মনে বিস্ময়ের চমক লাগাইল। সত্যই যেন আমার মধ্যে দুইটী অশরীরী আত্মা দুইটা হাত তুলিয়া দুই দিকের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে,—একটার দিকে চাহিলে কেন যে অবসাদ আসে, আর দ্বিতীয়টার দিকে চাহিলে চক্ষু দুইটা যেন আপনা-আপনি তাহার টানে বহুদূরে ছুটিয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু এই দৃষ্টির ঘোর চক্ষে লইয়া আমার এই কথাটাই প্রত্যক্ষ সত্যের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, মানুষের মনের খেলার মধ্যে সত্যের ভ্রম দেখাতে সত্যই জটিল ভ্রমে পড়িতে হয়। সংসারে যাহা দেখি যাহা ভাবি, প্রতিপদেই যে সমস্ত বিচার করি কিম্বা যে ভাবে আমাদের গতিটাকে এক একটা নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করি, তাহাই যে সবখানি নয়, তাহার চুল-চেরা সাবধানতার অন্তরালে যে একটা বিরাট জল্লোচ্ছ্বাস মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রতিপদেই অপ্রত্যক্ষভাবে লুক্কায়িত থাকে তাহা আর অবিশ্বাস করিবার মত ফাঁক, মনের এই নীরব প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোথাও সন্ধান করিয়া পাইলাম না। এখানে এই মনের সাম্‌নে আজ লোপামুদ্রা যে চিরন্তন সত্য লইয়া অভিসারিণীর মত আমার জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক্‌টাতে ধরা

দিয়াছে তাহাকে যেন একটা তুচ্ছ আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিতে পারিতেছি না। আর আমার এই ভাবান্তর, এমনি একান্ত আমার নিজস্ব যে, ইহার কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে মানুষের কাছে বাহবা পাওয়া তো দূরের কথা বরং যে সমস্ত যুক্তিজাল আমার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবে তাহার অভ্যগ্র ছবিতে আমার সমস্ত বাকশক্তি জমিয়া বরফ হইয়া যায়। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই যে, যুক্তিবাদটা শুধু একটা মিথ্যা কারাগার। ইহার বাহিরে যে বিস্তৃত আলোসমাকীর্ণ ধরণী মানবের হাসি খেলায় মুখরিত, পাখীর কাকলিতে চির ঝঙ্কৃত, ফলে পুষ্পে নন্দিত হইয়া যুগে যুগে মানুষের সমস্ত যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া বায়ুভরে সৌন্দর্য্যের লীলায় ভরপুর, তাহার রূপটী, তাহার মিলনের স্পৃহাটী যে, পৃথিবীর সকল বিচার বিবেচনা অতিক্রম করিয়া মেঘের আড়ালে চন্দ্রালোকের মত পরিব্যাপ্ত হয়,—এই সহজ, অত্যন্ত নিকটের ভাবটিকে, মানুষ চিরকালই দূরে ঠেলিয়া একটা অসম্ভব পরিকল্পনায় পদে পদে প্রবঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। সংসারে যুক্তিটাই যে সব নয় একথা বলিতে গেলে আজকাল আমার জন্যে কলম ছাড়িয়া বনবাসের ব্যবস্থা হইবে তা জানি কিন্তু আমার এই ভাঙ্গা ঢাক পিটাইয়া শুধু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'ওহে সাবধানী পথিক, হৃদয়ের আবেগটাই আবহমানকাল ধরিয়া সত্যের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছে, মহা-সমারোহ করা যুক্তির অনন্ত রত্নখচিত রাজসিংহাসন অপেক্ষা এই পবিত্র নিরাভরণ ধূলির আসন সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।'

কিন্তু লোপামুদ্রার প্রতি আমার মন যে ক্রমশঃ নুইয়া পড়িতেছে একথাটা যত প্রকারেই ফেনাইয়া বলি তাহার জন্য লোকের মুখ

কোন দিনই বন্ধ হইবে না, তাহারা বলিবে আমার এই ভালবাসা একটা অনুকরণমাত্র। কিন্তু ভগবান আমার চক্ষু দুইটাকে এমন রঙে ছোবাইয়া রাখিয়াছেন যে, সংসারে সব জিনিষই আমি চিরসত্যে রঞ্জিত দেখি। তাই বলি যে, সংসারে বোধ হয় মিথ্যা মাত্রেরই অনুকরণ সম্ভব কিন্তু ভালবাসার কোন দিনই অনুকরণ হয় নাই, বাহিরের খোলসটারই অনুকরণ চলে, কিন্তু অন্তরের কোণে যে আলোক সূর্য্যালোকের মত চিরন্তন সত্য, তাহার অনুকরণ কোন কালেই হয় না। একারণেই মানুষের অনুকরণশক্তি এখানে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া লজ্জিত মুখে ফিরিয়া যায়। ব্যবসাবুদ্ধি লইয়া মানুষ ভালবাসারও অনুকরণ করিতে যাইতে পারে, কিন্তু আগুনের তাপে তাহার স্পর্শের ইচ্ছা ভস্মীভূত তৃণের মত ঝরিয়া পড়িবে। কাজেই লোপামুদ্রার জন্য আমার এই অন্তরঙ্গ বেদনা আমার জীবনের একটা সহজ বিকাশ বলিয়াই আমি তাহার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া এমনভাবে আছাড় পিছাড় খাইতেছি। যা'হো'ক এই সমস্ত তর্কে কোন মীমাংসা আসিবে না তাই যাহা জানি এবং যে আঘাতে আমার এই জীবনটা জর্জ্জরিত হইয়াছে তাহার খানিকটা ছিন্ন অংশ এখানে মেলিয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য।

ন্যায়শাস্ত্র কি সত্যই কোনকালে জীবনের সত্য উদ্ঘাটিত করিতে পারে? তাহা হইলে আমার সম্মুখে ফেলুদা যে ত্যাগ, যে মহান কর্ত্তব্যের জন্য তাঁহার সকল সহজ শান্তি বিসর্জ্জন দিলেন, ভবানীশঙ্কর জীবনের সমস্ত অংশে মানবের ঘৃণা অঙ্কিত করিয়া যে মহানুভবতার জন্যে রেবার স্নেহবাস পরিত্যাগ করিলেন তাহাদের স্থান কোথায়? অথচ তাহাদেরই মত এই নিস্পৃহ জীবনের

অবদানেই যুগে যুগে মানুষের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যারা ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক তুলিয়া জীবনের যাত্রাপথ কণ্টকিত করিয়া তোলে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন কালে সন্ধি না হইলেও আমি ততটা ক্ষতির কারণ দেখি না। যা'হো'ক মাঝে মাঝে আমার হাড়মাংসে জড়িত সংস্কার যে আমাকে হাত করিবার চেষ্টা করিল তাহাও সত্য। তারপর লোপামুদ্রার পত্রখানি রেবার বাড়ী হইতে পুনঃ প্রেরিত হইয়া আমার মনটাকে আরও দুর্ব্বল করিয়া দিল। সেদিন একপসলা বৃষ্টি পড়িয়াই মেঘের সম্বল শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি আস্তে আস্তে গ্রামের পার্শ্বে লোকাল-বোর্ডের রাস্তার সরকারী বাঁধের উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম। এ জায়গাটায় সড়ক হইতে গ্রামে যাইবার জন্য একটা বাঁশের ঝোলা ছিল। লোহার পুলের গা ঘেসিয়া আর একটা রাস্তা ভিন্ন গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। আমি পুলের উপরে বসিয়া লোপামুদ্রার পত্রখানা খুলিয়া পড়িলাম, সে লিখিয়াছে :—

"সত্যিকার আত্মদান চিরকালই দুঃখের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়েছে একথা জানি,তবুও আমার মনটাকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। তোমাকে কয়েকদিন সেবা কর্‌তে পেরে যে আমি কতদূর আনন্দ পেয়েছি তা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। আর কোন দিন এই একান্ত সন্নিকটে তোমাকে পাবার মত পুণ্য করেছি কিনা জানি না। আমার একান্ত অনুরোধ যা'তে তোমার শরীর ভাল থাকে তার দিকে লক্ষ্য রেখো। আমি যে কেন যেচে তোমার খোঁজ নিচ্ছি তা বল্‌বার সময় এখনও আসেনি, এলেও বোধ হয় মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌ব না; কারণ যাহা অনুভূতিসাপেক্ষ তাহাকে

বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; যা'রা প্রকাশ করতে যায় তা'রা নিজের অসামর্থ্যতার লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়। অবশ্য চক্ষু বুজ্‌লে কোন লজ্জাই থাকে না। সংসারের সমস্ত লজ্জা নিজের চক্ষের কোণে জমা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমার যে চক্ষু টল্‌মল্‌ করে চেয়ে থাকে, জোর ক'রে লজ্জার খাতিরে তাকে বন্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই মুখ ফুটে কারণটা বলা হয়তো কোন কালেই হবে না তার জন্যে যত আঘাতই আসুক। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সমস্ত ঘটনাই স্পষ্টভাবে আমার চক্ষুর সুমুখে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঘটনাগুলো যেন একটা বিরাট ভাবের কাছে প্রতিহত হ'য়ে তলিয়ে যায়। তাই আমি কোনমতেই তোমাকে মন থেকে দূর করতে পারছি না। যা'হো'ক, রেবাদিদিকে আমার ভালবাসা জানিও।"

ইহার পর লোপামুদ্রা তাহার ঠিকানা দিয়া উত্তরের জন্য অনুরোধ করিয়াছে। আমি পত্রখানা পকেটে পুরিয়া দূরান্তের মাঠের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে যেন একটা ঝড় উঠিয়া সমস্ত ধুলাবালি উড়াইয়া লইয়া গেল,—তাহারই মধ্য দিয়া অনাবৃত অবগুণ্ঠনে লোপামুদ্রা যেন আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ধূসর মাঠের উপর দিয়া বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সবুজ ক্ষেতের আনন্দ-চিক্কণ শিখায় দুলিয়া উঠিয়াছে। অস্তমিত সূর্য্যের রাঙা কিরণে গাছের ডালপাতা রঙীন হইয়া যেন আমার মনের সমস্ত কালিমার উপর রঙের ছাপ ফেলিয়া দিল। আমি ধীরে ধীরে বাঁশের ঝোলা পার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া লোপামুদ্রার পত্রের উত্তর লিখিলাম।

তারপর কয়েক দিবস এই ভাবে ঝড় ঝঞ্ঝায় কাটিয়া যাওয়ার পরে হঠাৎ একদিন কলিকাতা হইতে রেবার একখানা জরুরী পত্র পাইলাম। রেবা লিখিয়াছে, আজ প্রায় মাসখানেক যাবৎ ভবানীশঙ্কর জেলের খাদ্য-সংস্কারের জন্য প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভবানীশঙ্করের পক্ষে এই দুঃখ বরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু রেবার জন্যে আমার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। এই নিরাশ্রয়া মাধবীলতা যে সহকার তরু অবলম্বন করিয়া অহোরাত্র তাহাকে একটা যে কোন ঝড়ে ভূলুণ্ঠিত দেখিবার ভয়ে চিন্তার মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছে তাহার সহিত ঐ তরুর সম্বন্ধ কতটুকু! যাহার সুখ দুঃখের সংবাদ লইতে কোন দিন কেহ আসিবে না, তাহার অন্তরখানি ভবানীশঙ্করের মধ্যে যে স্নেহের আশ্রয় পাইয়াছে তাহার সংবাদ বোধ হয় ভবানীশঙ্কর নিজেও পায় নাই। অথবা পাইয়া থাকিলেও ভবানীশঙ্করের জীবনের তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত রেবা বোধ হয় তাল মিলাইতে পারিতেছে না। এই কারণেই একজনের স্রোতের আবর্ত্তে অন্যজন ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। কিন্তু আমার তরফ হইতে এসব চিন্তারও কোন মূল্য তাহারা দিবে না। ফেনার সহিত সমুদ্রের এমনি বিশ্বাসের সম্বন্ধ যে, এই ভাঙ্গাচোরার মধ্যেই তাহারা পূর্ণ। এই কঠোর লীলানর্ত্তনেই তাহাদের পরস্পরের মিলন। ভবানীশঙ্কর রেবাকে আপনার কাছে আপনার মত পাইয়াছে, তাই তাহাকে আঘাত করিতে একটুও বাধে না। সত্যিকার ভালবাসার শক্তি এমনি নির্ভরতায় মাখা। অসম্পূর্ণ ভালবাসা সর্ব্বদা মন যোগানোর পালা, লুকোচুরির অভিনয়, কৈফিয়তের বাতায়নে পরিপূর্ণ!

ভালবাসা ঈশ্বরের দান। ইহাকে প্রত্যাখান করিয়া যাহারা মিথ্যা আচারের অচলায়তনে নিজেকে বন্দী করিয়া পদে পদে ভগবানকে অস্বীকার করিতেছে তাহাদের কাছে রেবার এই ভালবাসার কোন আদর নাই। কিন্তু বিধাতার বিশাল সাম্রাজ্যে শুধু উদ্যানলতাই সব নয়,—যে লতিকা গভীর বনপ্রদেশে পুষ্প পল্লবে মঞ্জুল হইয়া নীরবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার জীবনের মূল্য, যে কোনও উদ্যানলতার সমান। রেবার একাগ্র সাধনা, সংযম, তিতিক্ষার সৌরভ আজ শুধু ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর গায়ে সৌন্দর্য্যের কুসুম সৃজন করে না,—তাহার স্নিগ্ধ সুরভি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সত্যের বার্ত্তা বহন করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছে। আজ রাজপথে দাঁড়াইয়া তাহার মহিম্নস্তোত্র গাহিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, যতদিন এইরূপ রমণীর আদর করিতে না শিখিবে ততদিন জাতির মঙ্গল নাই। ততদিন শুধু শুক্তি দিয়াই সিন্ধুক বোঝাই করিতে হইবে,—মুক্তার সন্ধান মিলিবে না।

রেবার পত্রখানির শেষে লেখা আছে, "শঙ্করের জন্যে যে, কেন আমার এত আকুলতা তাহা আমি বুঝি না। আমার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে মানুষের জন্য ব্যথিত হওয়ার কোন কারণ নাই, তথাপি আমি মন বাঁধ্‌তে পারি না। মনে হয় যেন আমার একটা অঙ্গ অবশ হতে চলেছে, আর বোধ হয় তার কর্ম্মক্ষমতা ফিরে পাব না। অনেক ক'রে মনকে বুঝাই মানবেন্দ্রবাবু, কিন্তু ইহা যেন ভস্মে ঘি ঢালার কাজ করে। আমি তাঁকে প্রায়োপবেশন বন্ধ করতে অনেক অনুরোধ করেছি, উনি শুধু উত্তর দেন যে, একটা সঙ্কল্পের তুলনায় একটা জীবনের মূল্য অতি তুচ্ছ। যে লোক

জীবনটাকে ; শুধু একটা শুষ্ক তৃণের মত মনে করে তা'র কাছে আমার মত স্ত্রীলোকের আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। যা'হো'ক, এখন আমি সার ভেবেছি ও সর্ব্বপ্রকার ফলাফলের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছি,—যারা আমার ন্যায় হতভাগিনী তা'দের অগ্নিপরীক্ষা বোধ হয় এমনি কঠোর ভাবেই শেষ হয়। না হ'লে আমরা খাঁটি হব কেন? সোণার মতই আমাদের পুড়্‌তে হবে। সুতরাং এখন আর ভাবি না। তবে আপনাকে তাঁর দরকার। তিনি যে কয়জন বন্ধু পেয়েছেন তাঁদের চেয়ে আপনার প্রতি তাঁর বিশ্বাস বেশী বলেই এসব কথা আপনাকে লিখ্‌ছি।"

"শঙ্কর আজ আটাশ দিন উপোষে আছেন, দেহ দুর্ব্বল হ'লেও তাঁর চোখের মধ্যে এমন একটা জ্যোতিঃ আছে যার দিকে চাইতে গেলে চোখ ফিরে আসে। যাক্ এখন ভগবানের হাতে তাঁকে সঁপে দিলুম, আর তাঁকে অনুরোধ করে অন্তর্য্যামীর উপর দিয়ে হাত বাড়াতে যাব না।"

৩৩

সংযমের মূর্ত্ত প্রতীক রেবার পত্রখানি সংযমের ছন্দে সুসংস্কৃত। তিনি আমাকে যাওয়ার কথা লেখেন নাই, কিন্তু আমার পক্ষে না যাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিল। কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ী হইতে বিদায় লইলাম।

কলিকাতায় পৌছিবার পর দিবস রেবার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কাঁধের দুইদিকে মুক্ত কুন্তল মেলিয়া রেবা ঘরের মেঝেতে

ঝুঁকিয়া একটা বই পড়িতেছিলেন। আমাকে বসিবার কথা বলিয়া জগুকে তামাকের কথা বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিরাভরণ দেহের মধ্যে একটা স্থির তড়িৎ রেখার মত ব্যথার সৌন্দর্য্য অবিচল দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম। তাহার এমন রূপ কোথায় লুকাইয়াছিল! তেলহীন চুলের রুক্ষতা, নিরলঙ্কার দেহের কৃচ্ছ্রতা, উদাসীন আনমনা চক্ষুর চাহনি এবং তাহার নিবীড় গাম্ভীর্য্য হইতে এমনি একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য উছলিয়া উঠিতেছে যাহা দেখিয়া আমার রূপের লালসা লাঞ্ছিত লজ্জিত বেশে মাথা হেঁট করিল। নারীর রূপের এই দিকটা যে কত উজ্জ্বল, তাহার স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের মধ্যে যে অপরিসীম রূপের কান্তি প্রস্ফুটিত হয়, তাহার কাছে বোধ হয় ত্রিসংসারের সকল রূপের কল্পনা আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া আসে। রেবার হাঁসের মত গ্রীবা, পদ্মের মত আয়ত নেত্র, বিশাল সীমন্তিনী, তাঁহার কটিতট যে ক্ষীণতায় পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে বড় এ সমস্ত মামুলি রূপের কল্পনা যেন তাঁহার এই উদাসীন নেত্র, করুণ আড়ম্বরহীন দেহের শুভ্রতার কাছে অসম্পূর্ণ।

জগু তামাক দিয়া গেল। রেবা বলিলেন, "আপনার শরীর ভাল ছিল তো?" উত্তর দিলাম,—"হাঁ, আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?"

"ও কিছু না। লোপামুদ্রার পত্রখানা আপনার নিকট পাঠিয়েছিলুম পেয়েছেন বোধ হয়। তার আর কোন চিঠি পেয়েছেন?" বলিয়া রেবা পুনরায় শান্ত গাম্ভীর্য্যে মুখখানি ভারি করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "না আর চিঠি পাই নাই।" উত্তর দিয়া

ভাবিলাম রেবা ভবানীশঙ্করের কথা তুলিবেন। কিন্তু ইহার অপেক্ষায় দশ মিনিট নীরবে বসিয়া থাকিলেও কোন কথা রেবার মুখে ফুটিল না। অবশেষে আমি নিজেই বলিলাম, "ভবানীবাবুর কোন খবর নিয়েছেন?"

রেবার চক্ষু দুটি একনিমেষে করুণ হইয়া উঠিল। মুখের উপর পাণ্ডুর ছায়া ফেলিয়া বলিলেন, "না গত তারিখে আর যাইনি।" যে লোক মর্‌তে বসেছে তার কাছে যেতে আমার দারুণ কষ্ট হয়।" রেবার কথাটা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তবে কি রেবার সম্বন্ধে আমার সমস্ত কল্পনাই মিথ্যা? তিনি কি ভবানীশঙ্করকে ভালবাসেন না? অন্যথা তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেও অনিচ্ছুক কেন? আমি কয়েক মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিলাম, আর কবে তারিখ আছে চলুন দেখা ক'রে আসিগে।"

রেবা পলকের জন্য আমার দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া কহিলেন, "আর ছয়দিন পরে তারিখ। আপনি দেখা করে আসুন, আমি যাব না।"

তাঁহার চক্ষুদুটি দেখিলাম না, কিন্তু আমার মনটা বৃশ্চিক দংশনে জ্বলিয়া উঠিল। এতদিনে যেন রেবার সত্য চরিত্রটা আমার সম্মুখে ঘৃণার ফেনায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। ভবানীশঙ্কর যখন মরিতে বসিয়াছেন তখন রেবা তাঁহাকে ত্যাগ করিবার পথ খুঁজিতেছেন। তাহা অস্বাভাবিক কিছু নয়,—একজন বেশ্যার পক্ষে এই কাজ অতি সহজ! এক নিমিষে রেবার গাম্ভীর্য্য, সরলতা, কৃচ্ছ্রতা যেন এক গভীর তমসাবৃত অন্ধকারে পড়িয়া স্বার্থের ময়লা ছিটাইতে

লাগিল। বাড়ীখানির সমস্ত নীরবতা, গৃহের মৌন আকুলতা যেন একটা কুৎসিত ভোগের আয়োজন পূর্ণ করিবার জন্ম ভূতাবিষ্ট বেশে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমি পুনরায় রেবার দিকে চাহিলাম, যেন একটা আগুনের হল্‌কা আসিয়া আমার দুই চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া গেল। বলিলাম, "কেন যাবেন না?" রেবা মুখ তুলিলেন না। তেমনি আড়ষ্ট পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া কহিলেন, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে না, আপনি গিয়ে দেখে আসুন।"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠিল। আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "এ জন্মেই আপনারা সংসারে ছোট। মৌখিক ভালবাসা দেখিয়ে পুরুষকে মুগ্ধ করতে জানেন কিন্তু ত্যাগের পথে যেতে পারেন না। এখন আর ভবানীবাবুকে দেখ্‌তে যাবেন কেন? তিনি যদি এসে কিছু টাকা দিতে পার্‌তেন তবেই আদর থাক্‌ত। পুরুষের সঙ্গে শুধু স্বার্থের সম্বন্ধ।"

রেবার আঁখিপল্লব সিক্ত, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আমাকে গালাগালি দেন, যা ইচ্ছা তাই বলুন; এখন আর এসব কথার জবাব দিতে পার্‌ব না। তবে," আমি তাঁহাকে অবশিষ্ট কথা বলিতে না দিয়া চৌকাঠের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। রেবা আমার পশ্চাতে আসিয়া কহিলেন, "আপনি একটিবার যেতে ভুল্‌বেন না, আর আমার অনুরোধ মানবেন্দ্রবাবু, আমার মাথার দিব্য দিয়ে বল্‌বেন, যেন উপবাস বন্ধ করেন। মানবেন্দ্রবাবু,—" বলিতে বলিতে রেবার অদম্য অশ্রুজল তাঁহার মসৃণ গণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে ঝরিয়া পড়িল। তিনি আমার ডান হাতটা মুঠার মধ্যে লইয়া বলিলেন, "সংসারে আমার

আর কোন কামনা নাই মানবেন্দ্রবাবু, যাতে শঙ্করকে বাঁচাতে পারেন সে চেষ্টা করবেন। আপনার কাছে আমি অতি ছোট, অতি ইতর হ'লেও আমার এই অশ্রুজল সাক্ষী ক'রে বলছি, শঙ্কর না বাঁচলে আমার বেঁচে থাকাই দায় হবে, আমার মনে একটা ভয় এসেছে বোধ হয় শঙ্কর এ যাত্রা বাঁচবে না। এই ভয়েই তাঁর কাছে যেতে সাহস পাই না, ওঁর কঙ্কালটি দেখে আমার মনের মধ্যে অনেক অমঙ্গলে চিন্তা আসে, এই কারণেই যেতে চাইনা। কিন্তু আমার এই কথা কেউ বোঝে না মানবেন্দ্রবাবু। আপনিও আমাকে সন্দেহ করেছেন। তা যাক্, তবু আপনাকে বলছি, একটিবার তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন, তাঁর প্রায়োপবেশন বন্ধ করাবেন।"

বলিয়াই রেবা আমার হাতখানি ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি হতবুদ্ধি দিশাহারা হইয়া কুণ্ঠিত হৃদয়ে নামিয়া আসিলাম। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ভবানীশঙ্করের সঙ্গে মোকাবিলা করিলাম। তিনি আমার অনুরোধ, রেবার মাথার দিব্য ঠেলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "যে দেশে কয়েদীদের মানুষ করার আয়োজন নেই, খাদ্যাদি স্বাস্থ্যের সাহায্য করে না, সে দেশের চোখ ফোটাতে আমার মত একটা জীবন কেন, শত শত জীবন বলি দিতে হবে। যারা এই পাষাণপুরীতে আসে তারাও মানুষ, তাদের প্রতি মানুষের মতই আচরণ করতে হবে। বাহিরের লোকে খাওয়ার সম্বন্ধে যে সব সুবিধা পায়, আমাদেরও সেই সুবিধা দিতে হবে। আমি জীবন পণ করেছি মানবেন্দ্রবাবু, আজ চল্লিশ দিন হ'ল। আর দুই একদিন পর থেকে বোধ হয় আর কথা বলতে পারব না, হয় তো বা জীবনের লীলা একেবারেই শেষ হবে, তা হোক্

তবু একটা সান্ত্বনা যে, আমারই মত হতভাগ্যদের নালিশটাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়ে যাব।”

ভবানীশঙ্করের রক্তশূন্য দেহের মধ্যে উত্তেজনার স্রোত বহিয়া গেল, চক্ষুদুটি আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের বল, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, মৃত্যুপণের একনিষ্ঠতা, নির্ব্বিকার উদাসীনতা আমার সমস্ত বাকশক্তিটাকে কণ্ঠের নিম্নে চাপিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ অদূরে কয়েদীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ বেশ দেখিয়া পুনরায় ভবানীশঙ্করের কথায় দৃষ্টি ফিরাইলাম। তিনি বলিলেন, “হয় তো আর আপনাদের কাছে ফিরে যাব না। রেবাকে আস্‌তে নিষেধ করে দেবেন। পৃথিবীর মধ্যে আমার জন্যে যার সব চেয়ে বেশী কষ্ট হবে, সে রেবা। কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেবার মত সামর্থ্য আমার নাই। তাকে শুধু বল্‌বেন, সংসারে কেউ কারুকে ধরে রাখ্‌তে পারে না, কারণ সব কাজ মানুষের দ্বারা হয় না, অলক্ষ্যে কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের চালনা করে,—সেই বাক্যের অতীত, মনের অতীত যে বিরাট শক্তির খেলায় আমরা ভাসি ডুবি, তাঁর পায়ে সকল দুঃখের বোঝা ঢেলে দিলেই শান্তি। আমার যদিই এই শেষ আলাপ হয়, তবে যেন রেবা তার নিজের ইচ্ছামত পথ বেছে নেয়; আমি কোন উপদেশ দিতে পারি এমন ক্ষমতা নেই। রেবা আমার চেয়ে সব বিষয়েই বেশী বোঝে।”

কথাগুলি বলিয়া ভবানীশঙ্কর নিস্তব্ধ নিশ্চল দেহে শুইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্লান্ত চক্ষু দুটি লোহার গরাদের মধ্য দিয়া আকাশের দিকে নিবদ্ধ। আমি কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর জেলের ওয়ার্ডার আমার সময়ের কথা স্মরণ করাইয়া ইংরাজী

কায়দায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আমি ভবানীশঙ্করের কাছে বিদায় লইয়া বলিলাম, "রেবাদিদিকে আগামী তারিখে নিয়ে আস্‌ব।"

তিনি যে দৃষ্টি দিয়া বিশাল মুক্তিময় আকাশের একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্য হইতে একটু শান্তি আহরণ করিতেছিলেন, তাহা অকুণ্ঠ রাখিয়া শুইয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। আমি পুনরায় ওয়ার্ডারের ইঙ্গিতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। মনে মনে জগদীশ্বরের কাছে ভবানীশঙ্করের কল্যাণ কামনা করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু সংসারে মানুষের কল্পনাগুলি যে নিছক শিশু তাহা প্রমাণ করাইতে ভবানীশঙ্করের আরও একুশদিন সময় লাগিল। তাহার দৃঢ় উক্তি শুনিয়াও আমার ধারণা ছিল যে তিনি শীঘ্রই প্রায়োপ-বেশন ত্যাগ না করিয়া পারিবেন না। একারণে রেবাকে লইয়া আর একদিন গেলাম, কিন্তু কিছুতেই ফল পাইলাম না। একষট্টি দিনের উপবাসী ভবানীশঙ্কর তাঁহার জীবনীশক্তিটাকে পরদিনের প্রভাতের দুয়ারে টানিয়া আনিতে পারিলেন না,—কারাশৃঙ্খল অটুট রাখিয়া ইহসংসার হইতে বিদায় লইলেন। পরিচ্ছন্ন নীল নভোতল ভেদিয়া বজ্রাগ্নি উৎক্ষিপ্ত হইলেও বোধ হয় আমি এতদূর আশ্চর্য্য হইতাম না। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে রেবার বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

ঘরে আসিয়া রেবার মূর্চ্ছিত দেহখানি বিছানায় শোয়াইয়া জগুকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া তাঁহার

মূর্চ্ছা দূর করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি শোকাহতা রেবার উদাসীন দৃষ্টির সম্মুখে ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু জামার হাতায় মুছিয়া কিছুক্ষণ রেবার নীরবতার সহিত মিশিয়া রহিলাম, কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। তাহাকে বলিবার মত আছেই বা কি? তাহার সমস্ত শোক যেন জমাট বরফের মত অধরোষ্ঠ ফ্যাকাসে করিয়া তুলিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মানবেন্দ্রবাবু, এতদিন ধারণা ছিল, ঈশ্বর বলে কেউ নেই, কিন্তু আজ যেন আর একথা উচ্চারণ কর্‌তে সাহস পাচ্ছিনা। যা হ'বার হ'ল, এখন শঙ্করের শেষ কাজের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে তো? এত মুষ্‌ড়ে পড়্‌বেন না, এখন আপনিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা।"

আমি তাঁহাকে বসিতে বলিলাম। তিনি মেঝেটাতে শুইয়া পড়িলেন। আমি মাথার উপর তালপাখাটা ঘুরাইয়া বলিলাম, "চিন্তা কর্‌বেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটু সুস্থ হয়ে চলুন আলিপুরে যাই।" রেবা লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "চলুন চলুন তাঁকে নিয়ে আসিগে। আমার এখানে আর আন্‌ব না, কেওড়াতলাতেই তাঁর শোবার স্থান করে দিই। আর দেরী নয়—জগু?"

জগু আসিয়া দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল। রেবা বলিলেন, "একখানা গাড়ী নিয়ে এস ত বাবা।"

জগু গাড়ী লইয়া আসিল। আমরা আলিপুরে চলিয়া আসিলাম। জেলের দ্বারে বহুলোক সমাগত। ভবানীশঙ্কর যে, দেশের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, এই লোকজন তাহার

সাক্ষ্য দিতেছে। ভিড়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম, অশ্রুসিক্ত চক্ষে ভবানীশঙ্করের পিতা অবনীর হাত ধরিয়া পুষ্পাচ্ছাদিত শবের এক কোণ স্পর্শ করিয়া আছেন। সমাগত নরনারীর চক্ষে শোকের শীতলতা মৃত্যুর মত স্তব্ধ।

একটা স্বল্পাবয়ব ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া অংশুমালী রেবার ঘর্ম্মাক্ত ললাটে গ্লানি মুছাইবার জন্য যেন কিরণরেখা বাড়াইয়াছেন। শ্লথগতি শোভাযাত্রা কেওড়াতলার শ্মশানে উপনীত হইল। ভবানীশঙ্করের চিতাগ্নি মধ্যাহ্ন আকাশের বক্ষভেদ করিয়া অতীতের দিকে চলিয়া গেল। রেবা অদূরে বসিয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত নশ্বর দেহের ক্রম বিলীয়মান ধূমের দিকে চাহিয়া আছেন। হাজার হাজার নরনারী এই অবসান দৃশ্যের প্রতি কাতর চক্ষে চাহিয়া আছেন। কিন্তু ভবানীশঙ্করের প্রতি অপরের যত ভালবাসাই থাকুক, রেবার প্রাণের মধ্যে যে অবদান চিতাগ্নির মত তাঁহার জীবনটাকে পুড়াইয়া খাক্ করিয়া দিয়া গেল তাহার খবর কেহই পাইল না। ভালবাসে, কিন্তু ভবানীশঙ্করের মৃতদেহটি স্পর্শ করিবার অধিকার না পাইয়া রেবা যে নিজের বুকটাকে এখন পর্য্যন্ত চাপড়াইয়া ভাঙ্গিল না ইহার অক্ষমতা যেন আমাকে পিষিয়া ফেলিতে চাহিল। রেবার মনের মধ্যে যে তরঙ্গ উঠিবার জন্য মুহূর্ত্তের তরে হৃদয়খানি নিস্পন্দ হইয়া আছে তাহার জন্যে একবিন্দু সহানুভূতি কুড়াইবার সাহসও তাঁহার নাই। কারণ লোকচক্ষুতে ভবানীশঙ্কর যে আসনের অধিকারী, রেবার ক্ষণিকস্পর্শে তাহা যেন ধূলায় লুটাইবে, এই ভয়েই রেবা একান্ত নিবিড় বেদনার আঘাতগুলি গোপনে রুদ্ধ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে।

ঘণ্টাচারেক পরে ভবানীশঙ্করের অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ মাটির কলসী আর পোড়া কাঠগুলি ফেলিয়া গেল। মহাযাত্রার ঘনিষ্ঠতার মত সন্ধ্যার কালিমা শ্মশানের জনশূন্য শান্তির কাল অঞ্চল ভরিয়া নামিয়া আসিল। আস্তে আস্তে রেবা ভবানীশঙ্করের চিতাভস্মের একমুঠা আঁচলে বাঁধিয়া বলিলেন, "চলুন,"

আমি তাঁহার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলাম। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া আসিয়া কালীঘাটে প্রণাম করিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া রেবার চেতনা বিলুপ্ত হইল। এতক্ষণ যে অস্ফুট কথাটিকে মনের সমস্ত ধৈর্য্য দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ ইহার মুক্তির বেগ ধারণ করা রেবার পক্ষে কঠিন হইল। উপেক্ষিতা নিগৃহীতা রমণীর হৃদয়ে যে অনন্ত মমতার শিখা অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহার উজ্জ্বল তাপে যেন রেবার চক্ষুদুটী বড় হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে বাতাস দিলাম। বাড়ীতে আনিয়া যখন বিছানায় শোয়াইলাম তখনও তাঁহার অচৈতন্য দেহ, একটা পবিত্র জুঁই ফুলের মালার মত দেবতার পায়ে উৎসর্গীকৃত।

৩৪

রেবাকে সুস্থ করিয়া হঠাৎ আমার মনে হইল, যাঁহাকে সে এতদূর হৃদয় দিয়া ভাল বাসিয়াছিল তাঁহার মৃত দেহটার পরে তাঁহার কি কোনই মমতা ছিল না? তিনি তো ইচ্ছা করিলেই ভবানীশঙ্করের দেহটা কোলে লইয়া ইহাকে অবিরাম অশ্রুজলে

অভিষিক্ত করিয়া একটু সান্ত্বনা পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া একটা নির্ব্বিকার ধৈর্য্যে তাঁহার সকল আগ্রহ সকল সন্তাপ নীরবে হজম করিবার হেতু কি? ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অথচ রেবার এই মূর্চ্ছা দেখিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস না করিয়া পারিতেছি না। বোধ হয় সম্বন্ধ যেখানে বাহিরের প্রলোভন ছাড়াইয়া অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় সেখানে পঞ্চভূতের ক্ষণিক মায়ার স্থান নাই। ভালবাসা যেখানে পৃথিবীর কোলাহলের বাহিরে গহন গভীরতার মধ্যে আশ্রয় পায়, সেখানে খোলসটার প্রয়োজন আপনা আপনি ঘুচিয়া যায়। বস্তুতঃ সত্যের জন্য কোন বিরাট আয়োজনের আবশ্যকতা থাকে না,—সংসারে যাহা যত মহৎ, যত বিরাট তাহার আয়োজনটা চিরকালই অতি ক্ষুদ্র,—একটা ক্ষুদ্র দিয়াশলাই সমস্ত সৃষ্টির দাহের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে, একটা ক্ষীণ জলস্রোত বিরাট জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিতে পারে, একটা ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপে বহুদূর-প্রসারী ভূকম্পের শিহরণ সম্ভব করে, একটী ক্ষুদ্র বীজের দ্বারাই বিশাল মহীরুহ পত্রে পুষ্পে অনতিক্রমনীয় হইয়া উঠে, ঈশ্বরের সার্ব্বভৌম মহিমা মনের একাগ্রতার সাহায্যে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ এক হরিনামেই সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন; জগৎ পূজ্য মহাত্মারা এক ত্যাগের মন্ত্র দ্বারাই দুনিয়াকে বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জগতে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিসমূহ এক একটি ক্ষুদ্র ভিত্তির উপর অক্ষয় হইয়া আছে। ভবানীশঙ্করকে ভালবাসার মধ্যে রেবার কোন আয়োজন নাই আড়ম্বর নাই কিন্তু ইহার এই নীরব একাগ্রতার

মধ্যেই তাহার বিরাট প্রেমের সৌরভ লুক্কায়িত রহিয়াছে। মনে মনে তাঁহার প্রতি অটুট শ্রদ্ধা বহন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ছয়মাস পরে। সেদিন শরতের অপরাহ্ন ঈষদোজ্জ্বল আলোতে মনোরম। ঘরের মধ্যে বসিয়া কেবলি মনে হইতেছিল একবার বাহিরে বেড়াইয়া আসি। সূর্য্যকিরণের ম্লান ছায়ার মধ্যেও একটা নবীনতা মিলনসন্ধ্যার মত করুণ। ছেলেবেলায় দেখিতাম, এমনি সময়ে আমাদের বাগানের পার্শ্বে ঝিঙাফুল ফোটে. নধর দেহে চিক্কণ গাভীগুলি সানন্দে গৃহপানে ফিরিয়া আসে, তৃপ্ত বিহগকুল পরিত্যক্ত স্নেহনীড়ে ফিরিয়া আসিয়া কল-কাকলীতে সমস্ত গ্রামখানি মুখরিত করিয়া তোলে, এমনি সময়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া গ্রামের পুরনারীরা গলায় আঁচল তুলিয়া স্বামী পুত্রের কল্যাণ কামনা করে। সুমধুর উলুধ্বনির সঙ্গে আরতির মঙ্গলানুষ্ঠানে গ্রামখানি জীবন্ত পবিত্র হইয়া উঠে। মনের মধ্যে পুরাতন স্মৃতির ঢেউ উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অতীতের স্বপ্নে মগ্ন করিয়া রাখিল। ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ব্যারিষ্টার সাহেব খানিক পূর্ব্বে গিন্নীকে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

কয়েক মিনিট পরে ওয়েলার-বাহিত একটা খোলা ফিটন আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। উৎসুক নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিলাম। গাড়ীর পশ্চাৎ দিক হইতে বংশীলাল নামিয়া আসিল। আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শ্রীমতী লোপামুদ্রাই এই গাড়ীর আরোহী। নমস্কার করিয়া বংশীলাল এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। গাড়ীর সুমুখে আসিতেই লোপামুদ্রা নামিয়া

আসিয়া আমার পায়ের ধুলি লইয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "হাতের কাজ বোধ হয় শেষ হয়েছে, একটিবার আমার সঙ্গে এস। আমি কাল এসে অবধি তোমার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলুম কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকাতে আস্‌তে পারি নাই। এস, উঠে এস।"

লোপামুদ্রার সঙ্গে আমিও গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু তাহার সঙ্গে বসিতে আমার সঙ্কোচ আসিল। লোপামুদ্রা যে বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই মহারাণীর বেশ লইবে তাহা ভাবিতে পারি নাই। পরিধানে বহুমূল্য সিল্কের শাড়ী, গায়ে একটা সেই কাপড়ের জামা, কাণে হীরকের দুল, পায়ে ভেলভেটের পাতলা জুতা,—কোনটাই লোপামুদ্রার পূর্ব্বের পরিচয় প্রচার করে না। যে সাদাসিদে রমণীকে দেখিয়া আমি আগে তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলাম আজ তাহার এই মার্জ্জিত পারিপাট্য বেশ দেখিয়া সত্যই মনে মনে কুন্ঠিত হইয়া উঠিলাম। মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পথেই বলিলাম, "স্বর্গের উর্ব্বশী মেনকা বোধ হয় তোমাকে এখন দেখ্‌লে ঈর্ষা করবে লোপা!"

লোপামুদ্রা চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "যে দেশের যে নিয়ম, বোম্বেতে এ বেশ না ধর্‌লে কেউ মানে না। তোমার ভয় কর্‌তে হবে না—বাইরের এ জিনিষগুলোতে ভেতরের কোন ক্ষতি কর্‌তে পারে না বলেই আমি নিতে পেরেছি।"

আমি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুই চক্ষু যেন বিদায়ের দিনের মতই শান্ত। বলিলাম, "আমার ভয় করার তো কিছু

নাই লোপা, তবে এ জিনিষগুলো হয় তো তোমার মনটাকে পিষে দুর্ব্বল করতে পারে। সখ জিনিষটা খারাপ নয় কিন্তু সখের স্বভাবই মাত্রাকে অতিক্রম করা।"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ীখানি আসিয়া লোপামুদ্রার বাড়ীর দুয়ারে থামিল। নামিয়া উপরে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু দুটাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ঘরের সেই বৈরাগ্যবেশ যে এত শীঘ্র বিলাসের আড়ম্বরে মাতিয়া উঠিতে পারে তাহা কল্পনা করিতে পারিলাম না। দামী আসবাবপত্রে ঘরখানি যেন একটা প্রদর্শনীর মত দেখাইতেছিল। দেওয়ালের ছবি হইতে মেঝের মখমলের গালিচা পর্য্যন্ত ছায়াবাজীর পরিবর্ত্তনের মত দেখিয়া আমার চক্ষু ক্লান্ত হইয়া উঠিল। আমি মনটাকে হাল্‌কা করিবার জন্যে বলিলাম, "রেবাদিদিকে একটীবার ডাকাও, একটু আলাপ করে নিই।"

লোপামুদ্রা আমাকে বসিতে বলিয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিল। একখানি লাল টুকটুকে ডুরে সাড়ী পড়িয়া আমার সুমুখে মেঝেতে বসিয়া বলিল, "তুমি কি ভবানীবাবুর মৃত্যুর পর আর আসো নাই? রেবাদিদিকে আমি শুধু একদিনের জন্য পেয়েছিলুম। তার পরদিনই তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আস্‌বেন কিনা ঠিক নাই। তাই বাড়ী আর বাগানখানা আমার জিম্মায় রেখে গেছেন। আর ভবানীবাবুর কিছু টাকা তাঁর কাছে ছিল, ভবানীবাবুর ভাই অবনীবাবুকে দেবার জন্যে দিয়ে গেছেন। তুমি যাবার সময় টাকাগুলো নিয়ে যেও।"

আমার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। যাওয়ার সময় কি

একটিবার আমাকেও খবর দিতে নেই ? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, আমি তাহার যাওয়ার বিঘ্ন ঘটাইব ? বলিলাম, "তাঁর চাকর কোথায় ?"

"সঙ্গে নিয়ে গেছেন, গিয়েছেন ভালই করেছেন। এখানে একা থেকে এমন চেহারা হয়েছিল যে, দেখে আমার চোখে জল এসে পড়ছিল। এমন সোণার কান্তি শরীরটাকে একেবারে মাটী করে ফেলেছেন। বলেন, রেখে কি হবে ? এই শরীর দিয়ে যদি একটা মানুষকেও ধরে রাখা গেল না তবে এটার কোন প্রয়োজনই নেই। এমন স্ত্রীলোক আমি দেখিনি, যে নিজের সুখ সৌভাগ্যটাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ঠেলে ফেল্‌তে পারে।"

ইতিমধ্যে বংশীলাল আসিয়া তামাক দিয়া গেল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে বসিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে আমি বলিলাম, "রেবাদিদির মত স্ত্রীলোক দেখার সৌভাগ্য বোধ হয় আর হবে না লোপা।"

আমার কথাটা যেন লোপামুদ্রার ঈষৎ রক্তাভ কপোলের সমস্ত রঙ ধুইয়া পাণ্ডুর করিয়া তুলিল। সে প্রগাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমার এসব জিনিষ পত্র দেখে তুমি খোঁচা দেবে তা জানি, কিন্তু আমরা তো আর কারো তাবেদারীতে বাস করি না যে নিজের আকাঙ্ক্ষাটাকেও চেপে রাখ্‌ব। সংসারের কোন আনন্দই যা'দের কপালে লেখা নাই তা'রা কি বাইরের একটু চাকচিক্যেও মনটাকে মজিয়ে রাখ্‌বে না ?"

আমি তাহার দিকে চাহিয়া বেশ স্পষ্টভাবে একটি ব্যথার রেখা লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, "তোমাকে তো আমি বারণ কর্‌ছি না

লোপা, তুমি চিরকাল এই সব ঐশ্বর্য্য নিয়ে রাজরাণী হয়ে থাক, তাতে আমার বাধা দিয়ে কোন লাভ নাই। তবে মূর্ত্তি পূজা করতে গেলে অনেক সময় মূর্ত্তির বাহিরটাতেই মন পড়ে থাকে, তা'র পিছন দিয়ে আসল দেবতা যে কখন অন্তর্দ্ধান করেন তাহার হদিস পাওয়া যায় না।"

লোপামুদ্রা কয়েকমুহূর্ত্ত মর্ম্মর মূর্ত্তির মত বসিয়া থাকিয়া বলিল, "যারা শুধু বাহিরটাতেই ডুবে থাকে তাদের পক্ষেই এ ভয়, কিন্তু যারা এ বিষয়ে সাবধান থাকে তাদের ভয় নাই। আমার মনে হয় দেবতাকে পেতে হ'লে যেমন ভেতরটাকে উপলব্ধি করা আবশ্যক তেমনি বাইরের অনুষ্ঠানটাকে বাদ দিলেও চলে না।"

আমি তাহার কথাগুলি সরলভাবে বিশ্বাস করিবার মত ভাব দেখাইলাম। কারণ যে রমণী তাহার সকল কৃচ্ছ্রতা দূর করিয়া ভোগের মধ্য দিয়া যাত্রার সিঁড়ি নির্ম্মান করিতে বদ্ধপরিকর, তাহাকে ত্যাগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। মনে মনে বলিলাম, "লোপা, তুমি যেন এই সম্ভোগের মধ্য দিয়াই সত্যবস্তুর সন্ধান পাও।"

অল্পক্ষণ পরে বংশীলালকে ডাকিয়া লোপামুদ্রা রাত্রের খাবারের আয়োজনের ফরমাস দিয়া দিল। বংশী চলিয়া যাইতেছিল তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া লোপা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি নিরামিষ খাবে তো? আমার কিন্তু মাছমাংস ছুঁতে ইচ্ছা করে না। নিরামিষ না খাও তো রেঁধে দিতে হবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "তোমার এখানে খাব কি না সে কথা তো আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই। যা'হো'ক, আমি আজ এখানে খাব না। বাসায় যেতেই হবে।"

"খেয়েও তো যেতে পার্‌বে। তোমাকে আমি আট্‌কে রাখ্‌তে চাই না। অনেকদিন পরে এসেছ, তুটী খেয়ে গেলে সুখী হই।" বলিয়া লোপামুদ্রা জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিল।

আমি তাহার নির্ব্বিকার অনুরোধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। লোপামুদ্রা পূর্ব্বে আমাকে জোর করিয়া খাওয়াইতে চাহিত সে আজ আমাকে এত উদাসীনতা দেখাইতেছে কেমন করিয়া? আমি ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝিলাম, যে মনোবৃত্তি বিলাসের মাদকতায় আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তাহার গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত, ইহার ফলে সে আমাকে এত অবহেলার পাত্র মনে করিতে পারিয়াছে। আমার উপর যেন কে অকস্মাৎ সজোরে চাবুক মারিল। ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে এখানে বসিয়া আমার সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা দিল। আমি একবার পর্দ্দা সরাইয়া জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র্‌ দিয়া শূন্যে তারকার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আজ তোমার কথা রাখ্‌তে পার্‌ছিনা লোপা, অন্য একদিন দেখা যাবে।"

কথাটা বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এক পা বাড়াতেই লোপামুদ্রা আমার সুমুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "একান্তই যাও তো আমি আর ধরে রাখ্‌তে চাই না।"

আমি বাহিরে বারান্দায় দৃষ্টি ফেলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। একজন ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "লোপামুদ্রা আছেন? আপনার নামে একখানা পত্র আছে একটু আলাপও আছে, কোম্পানী থেকে আস্‌ছি।"

লোপামুদ্রার ভ্রূদুটি মুহূর্ত্তের মধ্যে কুঞ্চিত হইল; পরক্ষণেই সে ভদ্রলোকটিকে দাঁড়াইতে বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,

"আমায় বোধ হয় কয়েকদিনের মধ্যেই আবার বোম্বে যেতে হবে, ডাকলে একটিবার আসবে তো ?"

আমার মনের মধ্যে যেন কি প্রকার একটা জ্বালা হইতেছিল তাহা বুঝিলাম না। রূঢ়কণ্ঠে বলিলাম, "আমাকে ডাকবার মত ধৃষ্টতা না দেখালে সুখী হবো লোপা! মানুষের ধৈর্য্য আকাশের মত বিরাট নয়। তোমার দিকে চাইতে পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা হচ্ছে।"

বলিয়াই আমি কোন দিকে না চাহিয়া নীচে চলিয়া আসিলাম। এক নিমেষে ত্রিসংসার আমার পায়ের তলা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সংসারে যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়, বিশ্বাস করা যায় তাহাকে সন্দেহ করিবার মত অবস্থাও যদি আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই বোধ হয় মানুষ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, পুনরায় গিয়া লোপামুদ্রার ছল চাতুরী, তাহার নামের ছদ্মবেশ সমস্তটার উপর যে কালি পড়িয়া লেপিয়া পুছিয়া একাকার হইতে চলিয়াছে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি। কিন্তু পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইতে প্রবৃত্তি হইল না, হনহন করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৩৫

আসিবার কালে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এই টানা হেঁচড়ার মধ্যে নিজেকে আর জড়িত রাখিব না। যে রমণী আমার মনের মধ্যে অশ্রুজলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, উদাসীনতার শুষ্কতাপে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া আবার নূতন করিয়া জীবনযাত্রা সুরু করাই সঙ্গত। কয়েকদিন পরে বংশীলাল আসিয়া লোপামুদ্রার অনুরোধ জ্ঞাপন করিল তখন পা দুটি যেন আপনা আপনি তাহার বাড়ীর দিকে টানিয়া চলিল।

মানুষের জ্ঞানের অহঙ্কার, সাবধানতার আড়ম্বর, বিচার বিবেচনার অন্ত নাই, কিন্তু এই সব আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া কখন যে এক একটা ঘূর্ণাবাত্যা কোন তুচ্ছতম অজ্ঞাত পথ দিয়া আসিয়া পড়ে তাহা কেহ পুর্ব্বাহ্নে জানিতে পারে না। লোপামুদ্রার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিব না মনে করি কিন্তু সম্বন্ধ যেন আপনা আপনি আমাদিগের মধ্যে যোগসূত্র নির্ম্মান করিয়া আমার অহঙ্কারটিকে বিদ্রূপ করিয়া জাঁকিয়া বসে। এই আকস্মিক অভ্যুত্থান আবৃত করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল কেন তা জানি না। তাই পুনরায় লোপামুদ্রার বাড়ীতে আসিয়া লজ্জিত ভাবে দেখা দিলাম। তখন আকাশের পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তির গায়ে অসংখ্য তারকা ছাড়া একটিও মেঘের আবরণ নাই। প্রকৃতির এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের

মত মনখানিও যেন একটা অপরিজ্ঞাত তরঙ্গের মধ্যে ভাসিতেছিল। ইহার সমস্ত চঞ্চলতা যেন এক নিমেষে স্থির শান্তিতে ভরিয়া গিয়া অপরের আঘাতগুলি নতশিরে গ্রহণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর। লোপামুদ্রার তরফ হইতে এখন যে আদেশ আসিবে তাহার প্রতিবাদ করিবার যেন কোন হেতু নাই। আমার শরীরটা যেন আমার নয়, চক্ষু দুটা যেন লোপামুদ্রার বেশী কিছু দেখিতে চাহে না। তাই যখন তাহার ঘরে আসিয়া আরাম কেদারায় বসিলাম, তখন কিছুক্ষণ আমার মুখের কথা মনের আবেষ্টনেই ঘুরপাক খাইল, মুক্ত করিবার সামর্থ্য পাইলাম না।

লোপামুদ্রা সুমুখে বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল কিম্বা আমার এই গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। কোনটাই তাঁহার মুখের কথায় ধরা পড়িল না। সহজ এবং সুন্দর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কথা পাড়িল। বলিল, "এ কয়দিনের মধ্যে তুমি একবার আস্‌বে ভেবেছিলাম, কয়েকটা দিন আমার ভয়ানক খাটুনি গেছে। তুমি যাওয়ার দিন যে ভদ্রলোকটি পত্র নিয়ে এসেছিলেন তিনি আমাদের কোম্পানীতে এপ্রেন্টিস থেকে ছবির কাজ শিখ্‌তে চান। আমি তাঁকে সুপারিস দিয়ে দিয়েছি। তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে মা বলে সম্মান দেখিয়েছেন। তারপর থেকে আমাকে এমন ভাবে মা মা করে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন যে, আমি যেন সত্যিই তার মা। কিন্তু আমাকে এভাবে জড়াতে লোকের কেন এত উদ্বেগ তা তো বুঝি না। বেশ ছিলুম, সংসারে কেউ ছিল না। এখন এই লোকটির মুখে মা নামটি যেন আমার কাণে

অহরহ বাজ্‌ছে। ওগো বলনা এখন কি করি, আমার যে আর নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই! ছেলেটা আমাকে মহা সমস্যায় ফেলে দিয়েছে, ছেলে মানুষ। ঐ যাঃ আমি ভুলে গেছি; তুমি এখানে এখন খাবে তো ?"

পত্র পল্লবে সঞ্চিত শিশির বিন্দু যেমন প্রভাতের মৃদু বায়ু-হিল্লোলে টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়ে তেমনি লোপামুদ্রার আঁখি-পল্লবে যে স্নেহের কণাগুলি পড়ি পড়ি করিতেছিল তাহারা এক একটি করিয়া ঝরিয়া গেল। লোপামুদ্রার আহত মনের সম্মুখে যে, পৃথিবী বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে নবীন রূপে বাহির হইয়াছে আমি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্যচক্ষে লোপামুদ্রার অপরিসীম সৌন্দর্য্যভরা স্বর্গীয় মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার অন্তরে যে আলো সহস্র কিরণে পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে তাহাকে ঢাকিবার মত মেঘ কোথায়। যে জ্বালা হৃদয় মন্দিরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা শান্ত করিবার মত জল তো সমুদ্রেও নাই। তাহার এই চিরন্তণী আকাঙ্ক্ষা, মাতৃত্বের কৌতুহল, এই পরম এবং অনির্ব্বচনীয় নারীত্ব, যাহার আলোকে অগণিত গ্রহনক্ষত্র জ্যোতির্ম্ময়, যে মহিম্ন রূপের কামনায় ধরিত্রীর বেদনা সার্থক হয়,—তাহার অসীম যাতনা লইয়া যে মূর্ত্তি লোপামুদ্রার সমস্ত দেহ ভাঙ্গিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে চায় তাহার সকরুণ আবির্ভাবটি আমার সমস্ত চেতনাটিকে আলোড়িত করিয়া ফিরিতে লাগিল। আমি নির্ব্বাক প্রসারিত চক্ষে লোপামুদ্রার সিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জগুকে রান্নার আয়োজনের কথা বলিয়া সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু তাহার সমস্তখানিই যেন আমার কাছে ফেলিয়া গেল।

লোপামুদ্রাকে যেন আজ আমার বিশৃঙ্খল চিত্তের আড়ালে সত্যভাবেই চিনিতে পারিলাম। যে ক্ষুধা তাহাকে এতদিন অন্ধের মত আমার দিকে ঠেলিতেছিল তাহার অনাবৃত জঠরানল দেখিয়া আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

গভীর নিশীথে যখন সসঙ্কোচে আমার শয্যার পরে আসিয়া বসিল তখন তাহার একান্ত স্নিগ্ধ মুখখানির অমৃত আহরণের জন্ত কয়েকটা তারকা উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্যদিয়া যেন উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল। লোপামুদ্রা আমার মাথার চুলগুলি চিরিয়া লঘুস্বরে কহিল, "ওগো, ?"

আমি মুদ্রিত চক্ষে ছুটি চরণের নিভৃত ধ্বনির জন্ত এতক্ষণ উৎসুক হইয়াছিলাম,—তাই যখন সে আসিল তখন তাহার এই নীরব আগমন নিষ্কণ্টক করিবার জন্ত কোন সাড়া দিই নাই। তাহার কথায় চক্ষু মেলিলাম। লোপামুদ্রা আমার দিকে চাহিয়া একটু কাঁপিয়া উঠিল তাহা বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিলাম। বলিলাম, "তুমি এখনও শোও নাই লোপা!"

লোপামুদ্রার হাতের কাজ সমান ভাবেই চলিল। বলিল, "আর দিন চারেক পরেই তো আমাকে বোম্বে যেতে হবে, তখন তুমি কোথায় থাক্‌বে।"

আমি আশ্চার্য্য হইলাম না। সন্ধ্যার পরে যে নারীকে দেখিয়াছি সে লোপামুদ্রাকে ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে যে কোন সামঞ্জস্ত থাকিবে না তাহা অবধারিত। তাই তাহার কথার উত্তরে সহজ গলায় বলিলাম, "মাসিমার এখানে কোন অসুবিধে দেখি না।"

লোপামুদ্রা হঠাৎ কি একটা বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিল, পরক্ষণেই শান্ত সুসংযত কণ্ঠে বলিল, "পুরুষ মানুষ হয়ে সব সময় পরাধীন থাকা ভাল নয়। আমার ইচ্ছে, তুমি ব্যবসা কর, পরে নিজেই একটি বাসা ক'রে থাক।"

আমি ব্যঙ্গছলে বলিলাম, "ব্যবসা কর্‌তে গেলে টাকা লাগে। তোমার না হয় গুণ আছে, আমার এমন কোন গুণ নাই যা দেখে লোকে টাকা দেবে।"

লোপামুদ্রার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমার কোন গুণের দরকার হবে না। টাকার অভাব হয় তো আমার কাছ থেকে ধার নাও যখন শোধ কর্‌তে পার্‌বে তখন দিও।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "আর যদি শোধ কর্‌তে না পারি তা হ'লে জেলে দেবে তো?"

"অবশ্যই দেব। তবে সে জেল আমার এই বাড়ী। এখানে তোমাকে থাকৃতে হবে অথবা তোমার বাসা হ'লে আমাকে বসিয়ে খোরাক দিতে হবে।"

বলিয়া লোপামুদ্রা একটা কটাক্ষে আমার ব্যঙ্গোক্তিটাকে কঠিন সত্যের ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, "আমার এসব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে ফল নাই লোপা, তার চেয়ে বরং বাড়ী থেকে টাকা এনে সময় হলে ব্যবসা কর্‌ব।"

"সে কবে?"

"তার কিছু ঠিক নাই। হয়তো ব্যবসার দরকার না হতেও পারে।"

লোপামুদ্রা এতক্ষণ যে উৎসাহ অনুভব করিতেছিল তাহা যেন দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। সে গাঢ়স্বরে কহিল, "তুমি এমন হু হু ক'রে কতদিন বেড়াবে? ইচ্ছে হয় আমার এই চাক্‌রী-বাক্‌রী ছেড়ে দিন কতক তোমার ভাত খাই।"

"বল কি?" কথাটা বলিয়া আমি এমনি কঠিন দৃষ্টিতে চাহিলাম যে লোপামুদ্রা আমাকে যতটুকু কাছে পাইয়াছিল তাহার মায়া-মূর্ত্তিটী দেখিয়া সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে আর আমার দিকে চাহিতে পারিল না। আঁচলের এক কোন হাতে লইয়া তাহারই স্থতা পরীক্ষা করিবার মত ভাব দেখাইলাম। আমি পুনরায় বলিলাম, "তুমি কি এতদূর ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে লোপা? তোমার এই আসবাবপত্র, বাড়ী করার স্বপ্ন, তোমার ফিটন, তোমার মান, মর্য্যাদা, যশ, ভোগস্পৃহার সকল নাগপাশ কি তুমি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে লোপা?"

এতক্ষণ লোপামুদ্রার আয়ত চক্ষুর তলা দিয়া সে স্নিগ্ধ রজত রেখা ফুলিয়া উঠিতেছিল তাহা উথলিয়া উঠিল। মুখটি আমার বালিশের কিনারে গুজিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া যখন মাথা তুলিল তখন বিছানার চাদরটা ভিজিয়া তোষক ভেদ করিতেছে। আমি তাহার ডান হাতখানি মুঠার মধ্যে রাখিয়া বলিলাম, "লোপা আজ তোমাকে একটা কথা না ব'লে পার্‌ছিনে,—কোন বিষয়েই একাগ্রতা ব্যর্থ হয় না।"

লোপামুদ্রা আমার হাত দিয়াই দুইচক্ষু চাপিয়া ধরিল। বলিল, "আমি আর কিছুই চাই না। আমার আর কোন কিছুর দরকার নাই শুধু একটিবার অভয় দাও তাহা হলে সংসারে আমি

মাথা খাড়া ক'রে চল্‌তে পারি। নারীজন্মের দারুণ ব্যার্থতা আর কতকাল সহ্য কর্‌ব ?"

বলিতে বলিতে লোপামুদ্রা উপুড় হইয়া আমার বুকের উপর পড়িয়া গেল। আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম না। প্রায় দশ মিনিট একভাবে থাকার পর যখন বুঝিলাম লোপামুদ্রার আঁখি-পল্লবে ঘুমের আবরণ পড়িয়াছে তখন আস্তে আস্তে তাহাকে বালিশে শোয়াইয়া একপার্শ্বে কুণ্ঠিত জড়তা লইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে লোপামুদ্রা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া আমাকে প্রণিপাত করিয়া বসিল। আমি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলাম, "লোপা, এবার আর তোমায় একলা ছেড়ে যেতে পার্‌ব না, আমিও বোম্বে যাব।"

লোপামুদ্রা ঘন কালো চোখদুটী স্থিরভাবে আমার দিকে ফেলিয়া কহিল, "এ সৌভাগ্য কি আমার হবে যে তোমার সঙ্গে কোথাও যাব ? এবার তুমি একটী ব্যবসা আরম্ভ কর তা হ'লে আমার সুদিন আস্‌বে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি একটা ব্যবসা কর।"

আমি তাহার বাহু ধরিয়া আনত মস্তকটা তুলিয়া বলিলাম, "বোম্বে থেকে ফিরে এসে যা হয় একটা করা যাবে।"

লোপামুদ্রা উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে তুমি যাবে কেন ? ছি ! লোকে তোমার অখ্যাতি কর্‌বে তা আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। একান্তই যাও তো আমি চাক্‌রী ছেড়ে দিই। আমার কাছে টাকা আছে চল উভয়ে বেড়িয়ে আসিগে।"

কেন জানিনা আমার যেন জিদ চড়িয়া গেল। বলিলাম, "তোমার চাক্‌রী রেখেই আমি যাব।"

লোপার মুখখানা এমন অসহায় অবস্থার পরিচয় দিল যে বাধ্য হইয়া আমাকে মুখ ফিরাইতে হইল। সে গাঢ় স্বরে বলিল, "তুমি এমন ক'রে আমাকে অপদস্থ করতে চাও, মনে হয় তুমি কিছু বোঝনা। আমার সঙ্গে গেলে বংশীলালই বা কি মনে করবে আর রেবাদিদি জানতে পারলে যে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তোমার পায়ে ধরে বলছি তোমার নামে কোন কথা উঠলে তা আমি হজম করতে পারব না। তুমি তো এখন আর ছেলে মানুষ নও!"

লোপামুদ্রা যখন উঠিল তখন তাহার দুই চক্ষু ভারী হইয়া জলে ভরিয়া গিয়াছে। সে বলিল, "তুমি বসো তোমার জলখাবারের আয়োজন করে দিই।"

লোপামুদ্রা প্রস্থান করিল। কিন্তু আমার বুকের অভ্যন্তর প্রদেশটা মোচড় খাইয়া ওলট্ পালট্ হইতে লাগিল। আমার খ্যাতি অখ্যাতির জন্যে লোপামুদ্রা এত বিচার করিয়া চলিলেও তাহার সুখ দুঃখের বোঝাটা বহিবার মত কোন সুযোগ আমি পাইতেছিনা। অথচ এই অক্ষমতার জন্যে আমার অস্বস্তি বাড়িয়া চলিল। জোর করিলে লোপামুদ্রার সঙ্গে যাইতে পারি কিন্তু ইহাতে তাহাকে আরও ব্যথিত করিয়া তুলিতে আর ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাহার সহিত বিদায়ের ছবিটি মনে করিয়া প্রাণহীন বস্তুর মত বসিয়া রহিলাম।

খাবার খাইয়া তামাক টানিতেছি এমন সময় লোপামুদ্রা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "এ বেলা কি খাবে বল।"

আমি বলিলাম, "তোমার যা ইচ্ছে হয় রান্না কর।"

লোপামুদ্রা আমার উদাসীন কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিল, "আর এ

নির্য্যাতন সহ্য হয় না? কেন আমাকে চাক্‌রী কর্‌তে হবে? আমি আর যাব না।”

আমি বিস্ময়াভিভূতের মত চাহিয়া বলিলাম, “চাক্‌রী না কর্‌লে তোমার চল্‌বে কি ক’রে?”

লোপামুদ্রা প্রশান্ত স্নিগ্ধ চক্ষে চাহিয়া বলিল, “তুমিই তো, আছ, চলা না চলার চিন্তা আর আমি কর্‌বনা।”

আমার মনে দুশ্চিন্তা উদয় হইল। সত্যই হয় তো লোপামুদ্রা চাকুরী ছাড়িয়া দিবে। কারণ এই রহস্যময়ী রমণীর মনের গতি স্থির করা যে কত কঠিন তাহা এই কয়দিনে বিশেষ ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে যে আমার জন্য সংসারের সকল আনন্দ অক্লেশে বিসর্জ্জন দিতে পারে সে বিষয়ে আর সংশয়ের সাহস নাই। কিন্তু লোপামুদ্রার জন্যেই তাহাকে ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত। যে স্রোতস্বিনী স্ফটিক ধারা বাহিয়া আপনার কুলু কুলু তানে আপনি তন্ময়, যাহার সহজ আনন্দ তাহাকে আত্মদানের উন্মাদনায় উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে,—সেই জাহ্নবীধারাকে আমার রুক্ষ জটাজালে বাঁধিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র। তাই বলিলাম, “তা হয় না লোপা, তুমি এবার বোম্বে থেকে ফিরে এস, তারপরে যা হয় করা যাবে।”

লোপামুদ্রা নির্ব্বাক মুখে উঠিয়া গেল। মনে হইল যেন ইহা তাহার বুকের অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করিবার প্রয়াস।

দুই দিন পরে যখন লোপামুদ্রাকে লইয়া বোম্বে মেল ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন আমার অন্তরের সমস্ত চেতনা যেন ওই অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দুটী একটানে শুষিয়া নিঙড়াইয়া লইয়া গেল। ভাবিলাম সংসারে সত্যিকার প্রেম কি শুধু আগুনের মতই

প্রদাহের জ্বালা বৃদ্ধি করে, কোন কালে একবিন্দু শান্তিবারি বিতরণ করে না? কুসুম যতক্ষণ অনাঘ্রাত থাকে ততক্ষণই তাহার সত্য মর্য্যাদা রক্ষিত হয়,—তাহাকে টানিয়া সুরভির উৎস রোধ করার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। লোপামুদ্রা চলিয়া গেল, কিন্তু আমার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া যে লোপামুদ্রা অক্ষয় কমলের মত সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠিল তাহার ধ্যানে মগ্ন আত্মহারা হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। যেন এ আলো কোনদিন ম্লান হয় না, কোনকালে এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের শেষ নাই,—ইহা যেন শূন্যতার পূর্ণতায় পরিপূর্ণ।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের—

"অপরাধিনী"

সামাজিক উপন্যাস

(যন্ত্রস্থ)

সরল চিকিৎসা শিক্ষা

(যন্ত্রস্থ)